বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি

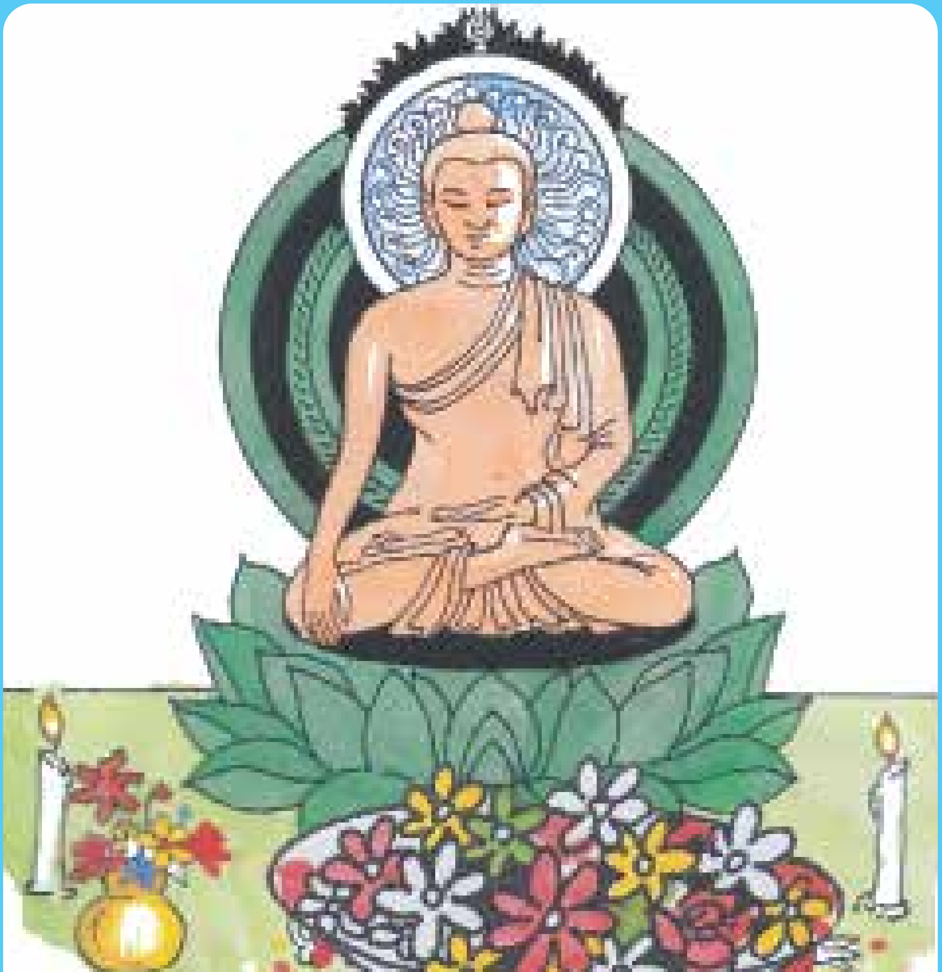

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ : বাংলাদেশের মালিকানাধীন প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থির (Geostationary) যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ। এর মধ্যে দিয়ে ৫৭ তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয় বাংলাদেশ। এটি ১১ই মে ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ছিল ফ্যালকন ৯ ব্লক-৫ রকেটের প্রথম পেলোড উৎক্ষেপণ।
এটি ফ্রান্সের থেলিস অ্যালেনিয়া স্পেস কর্তৃক নকশা ও তৈরি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, ১৬০০ মেগাহার্টজ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৪০টি কে-ইউ এবং সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার বহন করছে এবং এর আয়ু ১৫ বছর। এর নির্মাণ ব্যয় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে স্যাটেলাইটের ব্যান্ডউইথ ও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ইন্টারনেট বঞ্চিত অঞ্চল যেমন- পার্বত্য ও হাওড় এলাকায় ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট ও ব্যাংকিং সেবা, টেলিমেডিসিন ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রসারেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। টিভি চ্যানেলগুলো তাদের সম্প্রচার সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বিদেশি নির্ভরতা কমিয়ে এর উপর নির্ভর করছে। ফলে দেশের টাকা দেশেই থাকছে। বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়লে এর মাধ্যমে দুগর্ত এলাকায় যোগাযোগ চালু রাখা সম্ভব। শুধু তাই নয় শেখ হাসিনা সরকারের বর্তমান মেয়াদেই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ মহাকাশে উৎক্ষেপণেরও উদ্যোগ নেওয়া হবে । বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন, সেই স্বপ্ন মহীরূহে পরিণত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
স্যাটেলাইটের বাইরের অংশে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার রঙের নকশার উপর ইংরেজিতে লেখা রয়েছে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু-১, বাংলাদেশ সরকারের একটি মনোগ্রামও সেখানে রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা
ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া
গীতাঞ্জলি বড়ুয়া
ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
উত্তরা চৌধুরী

সম্পাদনা
অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২২

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভিশন ২০৪১ সামনে রেখে পাঠ্যপুস্তকটি সময়োপযোগী করে পরিমার্জন করা হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি শ্রেণি উপযোগী বিষয় ও তথ্যে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের দৃষ্টিকে প্রয়োগধর্মী করার লক্ষ্যে এখানে বিষয়বস্তুভিত্তিক চিত্র এবং অনুশীলনমূলক কাজ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি অধ্যয়নে শিক্ষার্থীরা ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে। পরিণতিতে তারা গৌতম বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, নৈতিক ও সৎ জীবনের উপায়, বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে তুলতে পারবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় নীতিবোধসম্পন্ন জীবন গড়তে যেমন সমর্থ হবে তেমনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং সর্বজনীন কল্যাণবোধ, দেশপ্রেম ও সহনশীলতার চেতনায় অনুপ্রাণিত হবে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের কাছে কেবল ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানের উৎস না হয়ে বাস্তবজীবনে সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উন্নীত হওয়ার উৎকৃষ্ট সিঁড়ি হবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা	১–২১
দ্বিতীয়	বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব	২২–৩৩
তৃতীয়	ত্রিপিটক	৩৪–৪৮
চতুর্থ	সূত্র ও নীতিগাথা	৪৯–৬১
পঞ্চম	বৌদ্ধ কর্মবাদ	৬২–৭৪
ষষ্ঠ	অট্ঠকথা	৭৫–৮৭
সপ্তম	নির্বাণ	৮৮–৯৬
অষ্টম	সঙ্গীতি	৯৭–১১০
নবম	জাতক	১১১–১২১
দশম	চরিতমালা	১২২–১৩৭
একাদশ	বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	১৩৮–১৫৮
দ্বাদশ	বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন	১৫৯–১৭১

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা

গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর জীবনদর্শনই বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি। জন্ম থেকে মহাপরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত সুদীর্ঘ আশি বছরব্যাপী জীবনে বুদ্ধ নৈতিকতা ও মানবতার বহু বিরল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। রাজকুমার হয়েও মানুষের দুঃখমুক্তির উপায় অনুসন্ধানের জন্য তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন। তারপর ছয় বছর কঠোর সাধনায় লাভ করেন বুদ্ধত্ব। আবিষ্কার করেন দুঃখমুক্তির পথ। সর্বজীবের কল্যাণের জন্য তিনি প্রচার করেন তাঁর নবলব্ধ ধর্ম এবং প্রদর্শন করেন দুঃখমুক্তির সেই পথ। তাঁর জীবন ছিল মৈত্রী-করুণার রসে সিক্ত। জীবপ্রেম, অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও করুণার বাণী প্রচার করে তিনি মহাকারুণিক বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। তাঁর মহাকরুণার বাণী পৃথিবীর বৃহত্তর থেকে অতি ক্ষুদ্র প্রাণীকেও রক্ষার প্রেরণা যোগায়। সমাজে যারা অস্পৃশ্য বলে উপেক্ষিত হয়েছে তিনি তাদের উপেক্ষা করেননি। তিনি তাদেরকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পথভ্রান্তকে পথ প্রদর্শন করে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন। পঙ্কিল জীবনযাপনকারীকে পঙ্কিলতামুক্ত করেছেন। শোক-দুঃখে জর্জরিত মানুষকে নির্বাণের পথে পরিচালিত করে শোক-দুঃখহীন করেছেন। মানুষকে নৈতিক ও মানবিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তাই সভ্যতার ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধ অনন্য স্থান দখল করে আছেন। এই অধ্যায়ে আমরা গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে–

- সিদ্ধার্থের জন্মকাহিনী বর্ণনা করতে পারব ;
- সিদ্ধার্থের বাল্যকালের বিশেষ ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সিদ্ধার্থের চারি নিমিত্ত দর্শনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভ ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারব ;
- বুদ্ধের নির্বাণ লাভের কাহিনী বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

সিদ্ধার্থের জন্ম

হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ রাজ্য ছিল। শাক্যরা সেখানে বাস করতেন। এ-রাজ্যের রাজার নাম শুদ্ধোদন, রানি মহামায়াদেবী। রাজ্যে সুখ শান্তির অভাব ছিল না। কিন্তু রাজা ও রানির মনে শান্তি নেই। কারণ, তাঁদের কোনো সন্তান নেই। একটি সন্তানের আশায় রাজা-রানি অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমার উৎসব শেষ করে রানি মায়াদেবী ঘুমিয়ে পড়লেন। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ছিল। চাঁদের আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত। রানি এক অপূর্ব সুন্দর স্বপ্ন দেখলেন। চারদিক থেকে চার দিকপাল দেবতা এসে রানিকে সোনার পালঙ্কে তুলে নিলেন তারপর তাঁকে নিয়ে গেলেন হিমালয় পর্বতের মানসসরোবরে। ওখানে দেবতাদের মহিষীরা মায়াদেবীকে স্নান করিয়ে সুবাসিত দিব্যবস্ত্রে ভূষিত করলেন। রানি আরও দেখলেন তিনি সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছেন। পাশের স্বর্ণপর্বত থেকে এক শ্বেতহস্তী নেমে এল, শুঁড়ে ছিল একটি শ্বেতপদ্ম। শ্বেতহস্তীটি রানির পালঙ্কের চারপাশে তিনবার প্রদক্ষিণ করল। এরপর রানির জঠরের দক্ষিণ দিকে শ্বেতপদ্মটি প্রবেশ করিয়ে দিলেন। রানি অলৌকিক আনন্দে শিহরিত হলেন। আকাশে ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ।

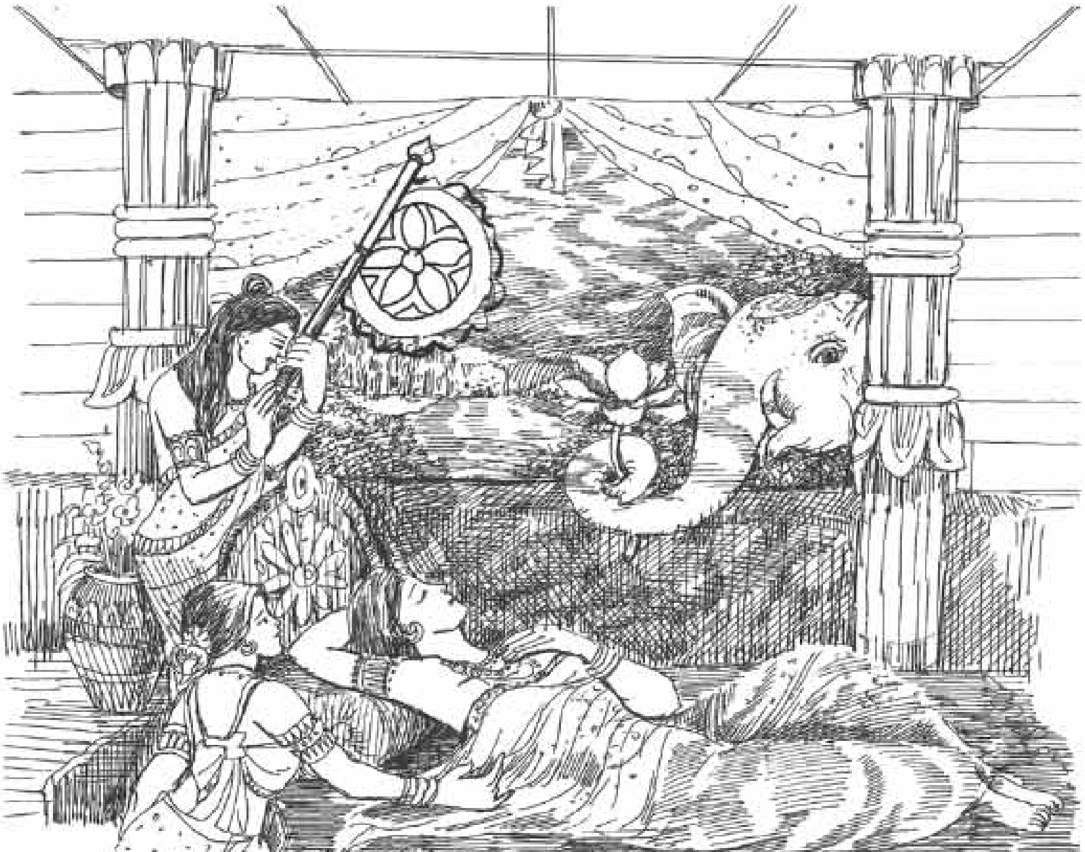

রানি মহামায়ার স্বপ্ন

পরদিন ঘুম থেকে জেগে রানি তাঁর স্বপ্নের কথা রাজা শুদ্ধোদনকে বললেন। রাজা সকল রাজ-জ্যোতিষীকে ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, "মহারাজ, সুসংবাদ আছে, আনন্দ করুন, রানি মায়াদেবীর পুত্রসন্তান হবে। শাক্যবংশে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে। কালে তিনি সর্বজীবের দুঃখহরণকারী মহাজ্ঞানী হবেন। আনন্দ করুন মহারাজ।"

এভাবে দিন চলে যায়, এল সেই শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। এ-সময় রানির পিতৃগৃহে যাওয়ার ইচ্ছা হলো। রাজা সম্মতি দিলেন এবং পিতৃগৃহে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। রানির যাত্রাপথ কপিলাবস্তু থেকে দেবদহ পর্যন্ত সজ্জিত ও সমতল করা হলো। সখীদের সঙ্গে নিয়ে রানি সোনার পালকিতে চড়ে পিত্রালয়ে চললেন। পথে দুই নগরের মাঝে লুম্বিনী কানন। শালবিথীকায় ঘেরা, চারিদিকে ফুল পাতার সমারোহ, পাখির কলকাকলিতে মুখর এই ছায়াশীতল কাননে রানির বিশ্রামের ইচ্ছা হলো। তাঁর নির্দেশে পালকি থামানো হলো। রানি কিছুদূর হেঁটে এক শাল তরুর নিচে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে একটি শাখা ধরলেন। তখনই তাঁর প্রসববেদনা শুরু হলো। সহচরীরা জায়গাটির চারিদিকে কাপড় দিয়ে ঘিরে দিলেন।

লুম্বিনী কাননের শালবৃক্ষের নিচে বৈশাখী পূর্ণিমার শুভক্ষণে জগতের আলো ভাবী বুদ্ধ সিদ্ধার্থ গৌতম ভূমিষ্ঠ হলেন। অনেক সাধনার পর সিদ্ধ হয়েছে রাজা-রানির মনোবাসনা, তাই পুত্রের নাম রাখা হলো সিদ্ধার্থ। কথিত আছে, সিদ্ধার্থ জন্মেই সাতটি পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছিলেন, প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পদ্মফুল ফুটেছিল। এ-সময় চারদিকে দেবতারা আনন্দধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন। জগতে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করলেন। কথিত আছে যে, একই দিনে গয়ার বোধিবৃক্ষ, রাহুলমাতা গোপাদেবী, চার নিধি কুম্ভ, চার মঙ্গল হস্তী, অশ্বরাজ কন্থক, সারথি ছন্দক ও অমাত্যপুত্র উদায়ীও জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থের জীবনের সাথে এঁদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

লুম্বিনী কাননে সিদ্ধার্থের জন্ম

শিশু কুমারকে নিয়ে মহাসমারোহে রানি কপিলাবস্তু ফিরে এলেন। রাজ্যে খুশির বন্যা বয়ে গেল। উৎসবে মেতে উঠল নগরবাসী। কিন্তু এই আনন্দে বিষাদের ছায়া নেমে এল। রানি মায়াদেবী সাত দিন পরে মারা গেলেন। শিশু সিদ্ধার্থের লালন পালনের ভার নিলেন বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তিনি মায়াদেবীর সহোদরা ছিলেন। গৌতমীর দ্বারা লালিত পালিত হন বলে সিদ্ধার্থ গৌতম নামে পরিচিত হলেন। বিশ্বে তিনি গৌতম বুদ্ধ নামেই পরিচিত।

অনুশীলনমুলক কাজ

সিদ্ধার্থের জন্ম-কাহিনীটি বর্ণনা কর

পাঠ : ২
বাল্যকাল

রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মের পরে তাঁকে দেখতে এলেন ঋষি অসিত। তিনি মহর্ষি কালদেবল নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি শিশু রাজকুমারকে দেখে অভিভূত হয়ে প্রথমে উল্লাস প্রকাশ করলেন। একটু পরেই তাঁর দু'চোখ অশ্রুতে ভিজে গেল। মহারাজ উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন তাঁর এই অকস্মাৎ আনন্দ ও বিষাদের কারণ। ঋষি অসিত বললেন,'মহারাজ, এই কুমার মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হবেন, জগৎকে দুঃখমুক্তির পথ প্রদর্শন করবেন। এজন্যে আমি উল্লসিত হয়েছি। কিন্তু আমি বয়োবৃদ্ধ। বুদ্ধের অমিয়বাণী শোনার সৌভাগ্য আমার হবে না, বহুপূর্বেই আমার মৃত্যু হবে। এজন্যে মন বিষণ্ণতায় ভরে উঠল।

বিমাতা গৌতমীর পরিচর্যায় সিদ্ধার্থ পরম যত্নে বড় হতে লাগলেন। পোষা শশক ও মৃগশাবক, মরাল ও ময়ূর ছিল তাঁর খেলার সাথি। প্রাসাদ ও উদ্যানের অনুপম পরিবেশে শৈশবের দিনগুলো তাঁর আনন্দেই কাটছিল। রাজা কুমারকে চোখের আড়াল করতে চাইতেন না। একবার নগরে হলকর্ষণ-উৎসব হচ্ছে। ঐদিন রাজা, অমাত্যবর্গ ও সম্ভ্রান্তরা নিজের হাতে হাল বা লাঙল চালনা করে সারা বছরের কৃষিকাজের শুভসূচনা করতেন। রাজা কুমারকে নিয়ে উৎসবে যোগ দিলেন। এখানেই কুমার প্রত্যক্ষ করলেন, হলকর্ষণে ভেজা মাটি থেকে বেরিয়ে পড়া পোকামাকড়গুলোকে পাখিরা খেয়ে যাচ্ছে, ব্যাঙ এসে খাচ্ছে। একটা সাপ এসে ব্যাঙটিকে গিলে ফেলল। আবার কোথা থেকে একটা চিল উড়ে এসে সাপটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। চোখের সামনে ঘটে-যাওয়া ঘটনাগুলো সিদ্ধার্থকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ ও প্রাণিকুলের এ নিষ্ঠুরতার কথা ভাবতে ভাবতে তিনি কোলাহল থেকে নির্জনে চলে গেলেন। এক বিশাল জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় বসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। এদিকে হলকর্ষণ-উৎসব শেষ, এবার সকলের বাড়ি ফেরার পালা। কিন্তু কুমার কোথায়! চারদিকে খোঁজার পরে তাঁকে পাওয়া গেল জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় ধ্যানমগ্ন। জ্যোতির্ময় আভায় উদ্ভাসিত কুমারের অবয়ব। রাজা ও অন্যেরা এ-দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। অভাবিত এ-ঘটনায় রাজাসহ সকলে বিহ্বল হয়ে পড়েন। রাজা শুদ্ধোদন পুনরায় স্মরণ করলেন ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী। ধ্যানভঙ্গ হলে রাজা পুত্রকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

বড় বড় পণ্ডিতের কাছে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হলো। ব্রাহ্মণপুত্র বিশ্বমিত্রের কাছে তাঁর প্রথম বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়। বর্ণ পরিচয়ের প্রারম্ভেই সিদ্ধার্থ তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা প্রদর্শন করেন। প্রতিটি বর্ণ উচ্চারণের সাথে সাথে সেই বর্ণসমন্বিত একটি করে নীতিবাক্য উচ্চারিত হলো তাঁর মুখ দিয়ে। ক্রমে তিনি নানাবিধ

ভাষা, শাস্ত্র ও চৌষট্টি প্রকার লিপিবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। বেদ, পুরান, ইতিহাস, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি শাস্ত্রও আয়ত্ত করলেন। একইসঙ্গে রাজনীতি, মৃগয়া, অশ্বচালনা, ধনুর্বিদ্যা, রথচালনা ইত্যাদি ক্ষত্রিয়োচিত দক্ষতাও আয়ত্ত করলেন সাফল্যের সঙ্গে। তবে তিনি কিছু ব্যতিক্রম আচরণ দেখালেন। যেমন অশ্বচালনায় জয়লাভ করার পূর্বক্ষণে ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্তকে বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দিলেন। একবার মৃগয়ায় গিয়ে হাতের কাছে পেয়েও শিকার ছেড়ে দিলেন। এতে সঙ্গীরা বিরক্ত হলেও অসহায় হরিণশিশুর প্রাণরক্ষা হওয়ায় তিনি আনন্দিত হলেন।

বাল্যকালেই সিদ্ধার্থের অনন্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধার্থ তাঁর মেধা দিয়ে কপিলাবস্তু ও দেবদহ রাজ্যের মধ্যে প্রবাহিত রোহিনী নদীর পানি নিয়ে সৃষ্ট সংকটের সমাধান করেন। রোহিনী নদীতে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ পড়ে বাঁধের সৃষ্টি করে। ফলে সকল পানি কপিলাবস্তুর দিকে প্রবাহিত হতে থাকে এবং দেবদহ নদীর পানি থেকে বঞ্চিত হয়। উভয় নগরের অধিবাসীরা অনেক চেষ্টা করেও বৃক্ষটি স্থানচ্যুত করতে পারছিলেন না। অনেক মানুষের কোলাহল শুনে নিকটেই ক্রীড়ারত সিদ্ধার্থ দলবলসহ ঐস্থানে উপস্থিত হলেন। শাক্য যুবকেরা অনেক চেষ্টা করেও বৃক্ষটি নাড়াতে সমর্থ হলো না। তখন সিদ্ধার্থ গাছটির অগ্রভাগ ধরে স্রোতের অনুকূলে জোরে টান দিলেন, এতে গাছটির যে-অংশ মাটিতে দেবে গিয়েছিল সে-অংশ মাটিসহ আড়াআড়ি অবস্থান থেকে লম্বালম্বি অবস্থানে সরে গিয়ে জলের প্রবাহ উন্মুক্ত হয়।

কুমার ক্রমে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে উপনীত হন। চপলতা ও উদ্দামতা এ-বয়সের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সিদ্ধার্থের আচরণে ভিন্নতা দেখা গেল। প্রশান্তচিত্তে তিনি প্রায়ই প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটাতেন। কখনো কখনো সাথিদের ছেড়ে দূরে একান্তে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

একদিন এভাবেই উদ্যানে বসে কুমার প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন। নীল আকাশে একদল সাদা হাঁস উড়ে যাচ্ছিল। সিদ্ধার্থ মুগ্ধ হয়ে ঐ সুন্দর দৃশ্য দেখছিলেন। হঠাৎ তীরবিদ্ধ হয়ে একটি সাদা হাঁস তাঁর কোলে এসে পড়ল, রক্তাক্ত হাঁসটি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তীরবিদ্ধ হাঁসের কষ্ট দেখে সিদ্ধার্থের অন্তর করুণায় প্লাবিত হলো। তিনি সযত্নে তীরটি ছাড়িয়ে নিলেন। সেবা শুশ্রূষা করে হাঁসটিকে বাঁচিয়ে তুললেন। এমন সময় আরেক রাজকুমার দেবদত্ত এসে হাঁসটি দাবি করল। বলল, কুমার, হাঁসটি আমার, আমি তীরবিদ্ধ করেছি। হাঁসটি আমাকে ফিরিয়ে দাও। সিদ্ধার্থ হাঁসটি ফিরিয়ে দিলেন না। তিনি বললেন, তুমি হাঁসটিকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিলে। আমি ওর জীবন বাঁচিয়েছি। কার অধিকার বেশি? যে জীবন হরণ করতে চায়, তার? নাকি জীবন যে দান করেছে তার? দেবদত্ত কুমারের যুক্তি মানলেন না। এই বিবাদ বিচারের জন্যে প্রবীণদের কাছে উত্থাপন করা হলো। প্রবীণরা সিদ্ধার্থ গৌতমের যুক্তিকে সমর্থন করলেন, বললেন, "কুমার যথার্থই বলেছে। যে জীবন দান করেছে হাঁসের ওপর তার অধিকারই বেশি।" সিদ্ধার্থ হাঁসটি সুস্থ করে তুলে উন্মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দিলেন।

সিদ্ধার্থ গৌতমের মধুর ব্যবহার, উদারতা, মৈত্রীপূর্ণ আচরণ, প্রজ্ঞাময় দূরদৃষ্টি রাজঅন্তঃপুরবাসী ও প্রজাসাধারণের অন্তর জয় করেছিল। তিনি হয়ে উঠলেন সকলের প্রিয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

সিদ্ধার্থের বাল্যকালের যে কোনো একটি ঘটনা বর্ণনা কর

পাঠ : ৩

সিদ্ধার্থ গৌতম ও গোপাদেবী

সিদ্ধার্থ গৌতম ক্রমে ষোল বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের উদাসীনতা ও বৈরাগ্যভাব অনুধাবন করে পুত্রকে সংসারী করার তাগিদ অনুভব করলেন। তিনি এক স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম রাজসভায় অশোকভাণ্ড পাশে নিয়ে বসলেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে সুন্দরী রাজকন্যা ও শ্রেষ্ঠীকন্যারা একের পর এক আসলেন। কুমার অশোকভাণ্ড হতে উপহার সামগ্রী তাঁদের হাতে তুলে দিলেন। এভাবে সারাদিন কেটে গেল। অশোকভাণ্ড নিঃশেষ, কুমার কোন রাজকন্যাকেই পছন্দ করতে পারলেন না। আসন ছেড়ে উঠে যাবেন, এমন সময় প্রবেশ করলেন প্রতিবেশী রাজ্য কোলীয় গণতন্ত্রের লাবণ্যময়ী রাজকন্যা সুস্মিতভাষিনী যশোধরা গোপা। অশোকভাণ্ড শেষ। কুমার ইতস্তত বোধ করলেন। তখন দণ্ডপাণি-কন্যা যশোধরা মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার জন্যে কি কোনো উপহার নেই? রাজপুত্র সিদ্ধার্থ মুহূর্তে নিজ অঙ্গুরীয়টি গোপাদেবীকে পরিয়ে দিলেন। এ-দৃশ্যে সভায় উপস্থিত সকলে আনন্দে মেতে উঠলেন।

রাজা শুদ্ধোদন গোপার পিতা দণ্ডপাণির নিকট পুত্রের বিবাহের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠান। প্রস্তাব পেয়ে দণ্ডপাণি আনন্দিত হলেন। কিন্তু তিনি জানালেন যে কুলপ্রথা অনুযায়ী তাঁদের কন্যার পাণিপ্রার্থীকে অশ্বচালনা, ধনুর্বাণ, অসিচালনা প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে। অতএব নির্ধারিত দিনে দেশ-বিদেশের ক্ষত্রিয় কুমারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ। অশ্বচালনা, ধনুর্বাণ, অসিচালনা একে একে সবকটিতেই তিনি জয়লাভ করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। সভামঞ্চে গোপা সিদ্ধার্থের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিলেন।

বোধিসত্ত্বের জন্ম-জন্মান্তরের সাথি যশোধরা গোপার সঙ্গেই সিদ্ধার্থ গৌতমের পরিণয় হয়ে গেল। মহা ধুমধামের সাথে মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের বিবাহ-উৎসব করলেন। গৌতম সংসারী হলেন, রাজাও চিন্তামুক্ত হলেন।

পাখির কলকাকলিতে মুখর, পুষ্পশোভিত উদ্যানে নির্মিত ভিন্ন ভিন্ন ঋতু উপযোগী সুরম্য প্রাসাদে আনন্দে কাটতে লাগল কুমার সিদ্ধার্থ ও রাজবধূ গোপাদেবীর দিনগুলি। কোথাও কোনো কষ্ট নেই, দুঃখ নেই। জগৎ যেন আনন্দময়।

অনুশীলনমূলক কাজ
রাজা কীভাবে চিন্তামুক্ত হলেন?

পাঠ : ৪

চারি নিমিত্ত দর্শন

সিদ্ধার্থ একদিন ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের ভ্রমণ যেন আনন্দময় হয় সে-ব্যবস্থা করলেন। সারথি ছন্দককে নিয়ে রাজকুমার নগরভ্রমণে বের হলেন। সঙ্গে প্রিয় অশ্ব কন্থক। অনেক দূর তাঁরা ভ্রমণ করলেন। নগরী সুসজ্জিত, নগরবাসী সুসজ্জিত ও সুখী। সকলেই কুমারকে আনন্দের সাথে অভ্যর্থনা জানাল। আরও কিছু দূর অগ্রসর হলেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন একজন বৃদ্ধ, দুর্বল ও পক্বকেশ, লাঠিহাতে শীর্ণ শরীরে বহু কষ্টে হেঁটে চলেছেন। সিদ্ধার্থ ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে ছন্দক ? সাদা চুল, স্থুল চর্ম, দুর্বল শরীর? ছন্দক জানালেন, "ইনি বয়সের কারণে বৃদ্ধ হয়েছেন, বয়স বাড়লে সবাই একদিন এমন বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে যায়।" সিদ্ধার্থ ভাবলেন, আমিও একদিন এমন বৃদ্ধ হব? প্রিয়তমা গোপাদেবীও বৃদ্ধ হবে? তিনি ছন্দককে বললেন, রথ ফিরাও। আজ আর ভ্রমণ করব না।

পরদিন আবার নগরভ্রমণে বের হলেন। নগরের বাইরে এসে দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি গাছের তলায় হাহাকার করছে, বেদনায় তার মুখ-চোখ কুঁকড়ে গেছে। সিদ্ধার্থ আবার ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, "এর কী হয়েছে?" ছন্দক জানালেন, ও ব্যাধিগ্রস্ত। মানুষমাত্রই কোনো না কোনো সময় রোগ ব্যাধি ভোগ করে থাকে। কুমার আবারও বিষণ্ন হলেন। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। সেদিনও প্রাসাদে ফিরে গেলেন। প্রাসাদে ফিরে কুমার ভাবতে লাগলেন, ঐ বৃদ্ধ আর ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের কথা। সবাই কি এমন বৃদ্ধ হবে? ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সকল মানুষকে কি এরূপ কষ্ট পেতে হয় ?

এভাবে তৃতীয় দিন চিন্তামগ্ন সিদ্ধার্থ পুনরায় সারথি ছন্দককে নিয়ে অশ্ব কন্থকের পিঠে চড়ে নগরভ্রমণে বের হলেন। নগরের বাইরে কিছু দূরে এসে তিনি দেখতে পেলেন কিছু লোক একটি শবদেহ কাঁধে নিয়ে বিলাপ করতে করতে যাচ্ছে। শোকাচ্ছন্ন এই দলটিকে দেখে সিদ্ধার্থ ছন্দকের কাছে জানতে চাইলেন, ওদের কী হয়েছে? ওরা কাঁদছে কেন?

ছন্দক বিমর্ষ চিত্তে জানালেন, ওরা একটি মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে । মৃত ব্যক্তি ওদের নিকটআত্মীয়। আপনজনের মৃত্যুতে তারা শোকে বিলাপ করছে। সিদ্ধার্থ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বিলাপ করলে কি মৃত ব্যক্তি জীবিত হবে? ছন্দক বললেন,"না কুমার, মৃত ব্যক্তিরা জীবিত হয় না।" তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করলেন, 'সবাইকে কি এরূপ মৃত্যুবরণ করতে হবে?" ছন্দক উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ কুমার, জীবিত সবাইকেই একদিন মারা যেতে হয়।" জীবের এই পরিণতি দেখে সিদ্ধার্থ অত্যন্ত কাতর হলেন। বিষণ্ন মনে ফিরে এলেন প্রাসাদে।

চতুর্থ দিনে নগরভ্রমণে বেরিয়ে তিনি নগরের বাইরে বেশ কিছু দূরে নির্জন জায়গায় বড় গাছের তলায় একজন সন্ন্যাসীকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন। স্থির, সৌম্য, ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীকে দেখে সিদ্ধার্থ আকৃষ্ট হলেন। ছন্দককে প্রশ্ন করলেন, ইনি কে? কী করছেন? ছন্দক উত্তর দিলেন, ইনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। সংসারের মায়া ত্যাগ করে তিনি সত্য জানার জন্য সাধনা করছেন। মুহূর্তে সিদ্ধার্থ গৌতমের সন্ন্যাস-চেতনা জাগ্রত হলো। সন্ন্যাসীর মধ্যে নিজেকে দেখতে পেলেন তিনি। জগতের দুঃখ, জরা, ব্যাধি থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। ছন্দককে রথ ফেরানোর আদেশ দিলেন।

নগরভ্রমণে বেরিয়ে সিদ্ধার্থ জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী দেখে মানব জীবনের পরিণতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। একেই সিদ্ধার্থের চারি নিমিত্ত দর্শন বলা হয়ে থাকে।

অনুশীলনমূলক কাজ
চারি নিমিত্তগুলো কী বর্ণনা কর

পাঠ : ৫

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ

সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণ

চার নিমিত্ত দর্শনের পরে সিদ্ধার্থ গৌতমের মনে শান্তি নেই। সব সময়ই তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। ঐ তরুণ সন্ন্যাসীর গভীর ধ্যানমগ্ন দৃশ্যটি গৌতমের মনে দাগ কেটেছে। তিনিও দুঃখমুক্তির সন্ধানে গৃহত্যাগ করবেন সিদ্ধান্ত নিলেন। গৃহত্যাগের আগে তিনি পিতার অনুমতি নেওয়ার কথা ভাবলেন। পিতার নিকট গিয়ে তিনি তাঁর সংকল্পের কথা জানালেন। পুত্রের কথা শুনে রাজা যেন বজ্রাহত হলেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে প্রাণাধিক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি শাক্যরাজ্যের রাজপুত্র, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, তোমার কিসের অভাব যার জন্যে তুমি সংসার ত্যাগ করতে চাও? সিদ্ধার্থ উত্তরে বললেন, চারটি বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারলে আমি সংসার ত্যাগ করব না :

১. আমি কোনোদিন জরাগ্রস্ত হব না, চিরযৌবনপ্রাপ্ত হব ;

২. আমি কোনোদিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হব না ;

৩. মৃত্যু কোনোদিন আমার জীবন কেড়ে নেবে না এবং

৪. অক্ষয় সম্পদ যেন আমি লাভ করি।

পুত্রের শর্ত শুনে রাজা অবাক হয়ে বললেন, এ অসম্ভব! জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকে রোধ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ-শর্ত প্রত্যাহার কর পুত্র। তখন সিদ্ধার্থ বললেন, মৃত্যুও যে-কোনো সময় আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। আমি গৃহত্যাগ করার সংকল্প করেছি। রাজা বুঝতে পারলেন মহৎ কর্তব্যসাধনে পুত্র সংকল্পবদ্ধ, তাঁকে আর বেঁধে রাখা যাবে না। তিনি সিক্ত কণ্ঠে বললেন, পুত্র ! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক। পিতাকে প্রণাম করে অশ্রুসজল নয়নে সিদ্ধার্থ পিতৃকক্ষ ত্যাগ করলেন।

এর মধ্যে গোপাদেবীর কোল আলো করে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিল। পুত্রের জন্মের খবর পেয়ে গৌতম নিজের অজান্তে বলে উঠলেন, "রাহু জন্মেছে, বন্ধন উৎপন্ন হয়েছে।" দূতমুখে এ কথা জানতে পেরে রাজা শুদ্ধোদন পৌত্রের নাম রাখলেন 'রাহুল'। এদিকে গৌতম সিদ্ধান্ত নিলেন, এ-বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। ওদিকে রাজা গৌতমকে আনন্দে রাখার জন্য নৃত্য-গীতের আয়োজন করলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ আমোদ-প্রমোদে মনসংযোগ করতে পারলেন না, ঘুমিয়ে পড়লেন। নর্তকীরাও কুমারকে নিদ্রিত দেখে ইতস্তত ভাবে এখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল। গৌতম জেগে উঠে এদের এলোমেলোভাবে ঘুমন্ত দেখে আরও বিরক্ত হলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, আজই গৃহত্যাগ করতে হবে। আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত, জ্যোৎস্নায় আলোকিত নগরী। কুমার শেষবারের মতো গোপাদেবীর ঘরে গেলেন। দেখলেন শিশুপুত্র রাহুল মায়ের সঙ্গে ঘুমাচ্ছে। পুত্রের নিষ্পাপ মুখখানা দেখে তিনি একটু মায়া অনুভব করলেন, ভাবলেন, একটু আদর করবেন। কিন্তু আদর করতে গেলে গোপা জেগে উঠতে পারেন। নিজেকে নিবৃত্ত করলেন। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সারথি ছন্দককে ডেকে তুললেন। নির্দেশ দিলেন ঘোড়াকে প্রস্তুত করতে। ছন্দক অশ্বরাজ কন্থককে সজ্জিত করে নিয়ে এলেন। সিদ্ধার্থ গৌতম কন্থকের পিঠে চড়ে নগর থেকে বেরিয়ে ছুটে চললেন। তারপর তিনি অনোমা নদীর তীরে পৌঁছালেন। এবার বিদায়ের পালা। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গৌতম তরবারি দিয়ে নিজের দীর্ঘ কেশ কর্তন করলেন। রাজপোশাক ও অলংকারগুলো খুলে ফেললেন। মুকুটটি ছন্দকের হাতে দিয়ে বললেন, "পিতাকে দিও।" রাজপোশাক ও অলংকার মায়ের হাতে দিতে বললেন। গোপাদেবীকে তাঁর পাদুকাদ্বয় আর পুত্র রাহুলকে সোনার তরবারি দিতে বললেন। আদেশ দিলেন, ছন্দক তুমি এবার ফিরে যাও। গৌতমের বিয়োগব্যথা সইতে না পেরে কন্থক তখনই প্রাণত্যাগ করল। শোকাচ্ছন্ন ছন্দক ফিরে গেলেন কপিলাবস্তুতে। রাজপুত্র রাজসুখ ত্যাগ করে হলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। গৌতম একাকী হেঁটে চললেন অনোমা নদীর তীর ধরে গভীর বনের দিকে।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে উনত্রিশ বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থের এই গৃহত্যাগ বৌদ্ধ সাহিত্যে 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' নামে অভিহিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

গৃহত্যাগের পূর্বে সিদ্ধার্থ পিতাকে কী শর্ত দিয়েছিলেন?

সিদ্ধার্থের পুত্রের নাম রাহুল কেন হলো?

পাঠ : ৬

বুদ্ধত্বলাভ

রাজগৃহ ছেড়ে নদী বন পাহাড়ে ঘেরা প্রকৃতির কোলে চলে এলেন গৌতম। ঋষিদের আশ্রমে কিছুকাল অবস্থান করে বৈশালী নগরে পৌঁছলেন। এখানে ঋষি আরাড় কালামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, শিক্ষালাভ করলেন তাঁর দর্শন। তাঁর সমাধির সাত স্তরও অনুশীলন করলেন। কিন্তু তাঁর নিকটও গৌতমের জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না। তিনি রাজগৃহে ফিরে গেলেন। এখানে রত্নগিরি পর্বতের গুহায় কিছুকাল অবস্থান করেন। এ গুহা ছিল বহু সাধকের আবাসস্থল। তিনি সেই সাধকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করলেন। একদা ভিক্ষা সংগ্রহের সময়ে রাজা বিম্বিসার এই তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখে আকৃষ্ট হলেন। ডেকে পাঠালেন রাজপুরীতে। অনুরোধ করলেন কঠোর সন্ন্যাস জীবন ত্যাগ করে রাজসভায় উচ্চ পদ গ্রহণ করতে। কিন্তু যিনি রাজসিংহাসন ছেড়ে এসেছেন, উচ্চ পদ কিংবা সম্পদ কি তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে? তিনি তো রাজ ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়েছেন।

সমসাময়িক প্রখ্যাত শিক্ষাগুরু রামপুত্র রুদ্রকের নিকট কিছুকাল ধর্মচর্চা করলেন। একসময় তিনি গুরুর সমকক্ষতা অর্জন করলেন। সেইসঙ্গে উপলব্ধি করলেন, গুরুর শিক্ষা ও সাধনপ্রণালি অনেক উচ্চমার্গের হলেও এ দ্বারা সত্যজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। তিনি গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজগৃহ ত্যাগ করলেন। আরাড় কালামের তিন শিষ্য–কৌণ্ডিন্য, বপ্প ও অশ্বজিৎ এবং গুরু রামপুত্র রুদ্রকের দুই শিষ্য– মহানাম ও ভদ্দিয় তাঁর সাথে যোগ দেন।

রাজগৃহ থেকে অনেক হেঁটে পৌঁছলেন উরুবেলায়। স্থানটি প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে ঘেরা। তিনি সেনানী নামে একটি গ্রামে এলেন। পাশেই গভীর বন। বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী নদী-নৈরঞ্জনা। এ-নদীর আরেক নাম ফল্গু। নির্জন প্রকৃতি গৌতমকে সব সময়ই আকৃষ্ট করত। ফলে জায়গাটি তাঁর খুব পছন্দ হলো। সিদ্ধান্ত নিলেন, দুঃখের শেষ জানার জন্য এখানেই তপস্যায় রত হবেন।

ধ্যানস্থ সিদ্ধার্থ গৌতম

কঠোর সাধনায় পেরিয়ে গেল ছয়টি বৎসর। জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেলো গৌতমের সুন্দর দেহসৌষ্ঠব। দুর্বল শরীরে হাঁটা-চলায় অক্ষম হয়ে গেলেন। তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে একদিন নদীতে স্নান করতে নেমে আর উঠতে পারছিলেন না। অনেক কষ্টে পাশের একটি বড় গাছের শাখা ধরে তিনি পারে উঠতে সক্ষম হলেন। তিনি অনুধাবন করলেন, এভাবে কঠোর সাধনা তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। দুঃখমুক্তির উপায় জানা সম্ভব হবে না। তিনি উপলব্ধি করলেন, অল্প অল্প আহার করে মধ্যপথ অবলম্বনই হবে সাধনার প্রকৃত পথ। কঠোর সাধনা বা বিলাসীজীবন, কোনোটিই দুঃখমুক্তির অনুকূল নয়। সুতরাং তিনি মধ্যম পথ অবলম্বন করলেন।

২০২৩

সুজাতা বুদ্ধকে পায়েস দান করছেন

শ্রমণ গৌতমকে আহার করতে দেখে অনুগামী পাঁচজন শিষ্য কোণ্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি একা হয়ে গেলেন। একদিন স্নান করে তিনি বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় উপবেশন করলেন। এসময় সুজাতা নামে সেনানী গ্রামের এক গৃহবধূ শ্রমণ গৌতমকে পায়েস দান করলেন। গৌতম সুজাতার পায়েস গ্রহণ করলেন। ঐদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। পায়সান্ন খেয়ে তিনি পুনরায় ধ্যানে বসলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, বুদ্ধত্ব লাভ না করে তিনি এই আসন থেকে উঠবেন না।

আকাশে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ। অশ্বত্থমূলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গৌতম গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। দুঃখ-মুক্তি অন্বেষায় তিনি সাধনারত। ধরণী প্রকম্পিত হলো। লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ভয়ভীতি প্রভৃতি অশুভ শক্তির প্রতীক মার তাঁর এই প্রতিজ্ঞায় ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করার জন্য দলবলসহ মার নানারকম চেষ্টা করতে থাকল। তুমুল যুদ্ধ হলো। রতি, আরতি ও তৃষ্ণা – মারের এই তিন কন্যা পুষ্পধনু ও পঞ্চশর নিয়ে ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করল। তাঁর তপোভঙ্গ করার জন্য নানারকম অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন ও ছলনা করতে থাকল। শুরু হলো মারের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, যদি পর্বত, মেরু

২০২৩

স্থানচ্যুত হয়, সমস্ত জগৎ শূন্যে মিশে যায়, সমস্ত নক্ষত্র, জ্যোতিষ্কও ইন্দ্রের সাথে ভূমিতে পতিত হয়, বিশ্বের সকল জীব একমত হয় এবং মহাসমুদ্র শুকিয়ে যায়, তথাপি আমাকে এই আসন থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারবে না।' যুদ্ধে মার শাক্য সিংহের নিকট পরাজিত হলো। বোধিজ্ঞান লাভ করে সিদ্ধার্থ গৌতম 'বুদ্ধ' হলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর।

ধ্যানে বসে তিনি রাতের প্রথম প্রহরে জাতিস্মর জ্ঞান বা পূর্বজন্মের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করলেন। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে দিব্যচক্ষুসম্পন্ন হলেন। তৃতীয় প্রহরে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর উৎপত্তির বিষয়ে অবগত হলেন। চার আর্যসত্য উপলব্ধি করলেন। দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আবিষ্কার করলেন।

বোধিজ্ঞান লাভের পর গৌতম বুদ্ধ

'বোধি' শব্দের অর্থ পরম জ্ঞান বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। 'বোধি' অর্জন করে তিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন। যে-অশ্বত্থ গাছের নিচে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করলেন তার নাম হলো 'বোধিবৃক্ষ' বা বোধিদ্রুম। তিনি জগতে গৌতমবুদ্ধ নামে পরিচিত হন। যে-স্থানে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন তা 'বুদ্ধ গয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে।

বুদ্ধত্বলাভের পরে তাঁর বোধিসত্ত্ব জীবনের সমাপ্তি হয়। তিনি নির্বাণ মার্গের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাই আমাদের সকল দুঃখের কারণ। অবিদ্যার ধ্বংসের দ্বারা দুঃখের বিনাশ সম্ভব।

বুদ্ধত্বলাভের পরে তিনি হলেন জ্যোতির্ময়, জগতে ধ্বনিত হলো আনন্দধ্বনি। তৃষ্ণার ক্ষয় করে তিনি দুঃখকে জয় করেছেন, জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করেছেন। পরবর্তী সাত দিন তিনি বোধিবৃক্ষের নিচে বজ্রাসনে বসে সুখলাভ করলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে ঈশান কোণে দাঁড়িয়ে বোধিবৃক্ষের দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলেন। তৃতীয় সপ্তাহে বোধিবৃক্ষের চারপাশে চংক্রমণ করলেন। চতুর্থ সপ্তাহে রতন ঘর চৈত্যে বসে বিমুক্তি সুখ অনুভব করলেন। পঞ্চম সপ্তাহে অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ তলে পদ্মাসনে বসে ধ্যানস্থ থাকলেন। ষষ্ঠ সপ্তাহে মুচলিন্দ বা মুচকুন্দ বৃক্ষের নিচে ধ্যানে অতিবাহিত করলেন। সপ্তম সপ্তাহ রাজায়তন বৃক্ষের নিচে ধ্যান করে অতিবাহিত করলেন। এখানে তিনি মার্গসুখ, ফলসুখ ও বিমুক্তিসুখ উপভোগ করলেন। সাত সপ্তাহ শেষে যখন বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গ হলো তখন সে-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তপস্সু ও ভল্লিক নামক দুই বণিক। রাজায়তন মূলে ধ্যানাবিষ্ট জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে দেখে তাঁরা মধু ও পিঠা দ্বারা তাঁকে পূজা করলেন। বুদ্ধ সানন্দে গ্রহণ করলেন বণিকদ্বয়ের শ্রদ্ধাদান। সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণের ঊনপঞ্চাশ দিন পরে এই তাঁর প্রথম আহার। বুদ্ধ শ্রদ্ধাদান অনুমোদনকালে তাঁর অভিনব দুঃখমুক্তির পথ সম্পর্কে দেশনা করলেন। কৃতার্থ বণিকদ্বয় বুদ্ধ ও ধর্মের শরণ নিলেন। বুদ্ধের প্রথম উপাসক হওয়ার গৌরব লাভ করে ধন্য হলেন তপস্সু ও ভল্লিক। তখনও সঙ্ঘ গঠিত না হওয়ায় তাঁরা 'দ্বি-বাচিক উপাসক' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের স্মৃতিবিজড়িত সাতটি স্থান, যথা : বোধি মূল (বোধি পালঙ্ক), অনিমেষ চৈত্য, চংক্রমণ চৈত্য, রতন ঘর চৈত্য, অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, মুচলিন্দ মূল ও রাজায়তন বৃক্ষ প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধশাস্ত্রে সপ্ত মহাস্থান নামে অভিহিত। বৌদ্ধরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে এ সপ্ত মহাস্থানের উদ্দেশে বন্দনা নিবেদন করে থাকে।

অনুশীলনমূলক কাজ

রাজা বিম্বিসার সিদ্ধার্থকে কী প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

'মধ্যম পথ' বলতে কী বোঝ?

কারা দ্বি-বাচিক উপাসক ছিলেন?

সপ্ত মহাস্থানের নাম লেখ

পাঠ : ৭
ধর্মপ্রচার

বুদ্ধত্বলাভের পরে বুদ্ধ তাঁর নবলব্ধ ধর্মপ্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্যে তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমাতিথিতে সারনাথের ঋষি পতন মৃগদাবে উপস্থিত হলেন। ঐখানে তখন অবস্থান করছিলেন তাঁর পূর্বের পাঁচ সঙ্গী : কোণ্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। এঁদের কাছেই তিনি প্রথম নবলব্ধ ধর্মপ্রচার করলেন। এঁরাই বুদ্ধের কাছে প্রথম দীক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষু। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এঁরা পঞ্চবর্গীয় শিষ্য নামে পরিচিত। তাঁদের দীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো 'ভিক্ষুসংঘ'। বুদ্ধের প্রথম ধর্ম-দেশনা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' নামে খ্যাত। বুদ্ধ দেশনা করলেন, নব আবিষ্কৃত চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব, অনিত্য ও অনাত্মবাদ ইত্যাদি। পঞ্চশিষ্যগণ বিমুগ্ধ চিত্তে সারারাত ধরে নবধর্মের অমৃতময় বাণী শ্রবণ করলেন। বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিয়ে ঐ তপোবনেই প্রথম বর্ষাবাস শুরু করলেন। এ-সময়ে শ্রেষ্ঠিপুত্র যশ ও তাঁর চার বন্ধু সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এঁদের অনুসারী আরও

পঞ্চাশজন যুবকও ভিক্ষু হলেন। বুদ্ধ এই ভিক্ষুসঙ্ঘকে বর্ষাবাস শেষে দিকে দিকে অনন্য এই ধর্মপ্রচারে প্রেরণ করলেন। তিনি বললেন 'মুত্তাহং ভিক্খবে সব্বপাসেহি, যে দিব্বা যে চ মানুসা, তুম্হে পি ভিক্খবে মুত্তা সব্বপাসেহি যে দিব্ব যে চ মানুসা, চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায়, অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং মা একেন দ্বে অগমিত্থ, দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং আদিকল্যাণং, মজ্ঝে কল্যাণং পরিয়োসানকল্যাণং।' অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ ! আমি দেব-মনুষ্য এবং সকল প্রকার সংযোজন হতে মুক্ত। ভিক্ষুগণ ! তোমরাও দেব-মনুষ্য এবং সকল প্রকার সংযোজন হতে মুক্ত হও। হে ভিক্ষুগণ ! বহুজনের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য তোমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়। দুজন একত্রে গমন করবে না, প্রচার কর সেই ধর্ম যে ধর্মের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে কল্যাণ।' বুদ্ধ এরূপ নির্দেশ প্রদান করে নিজে উরুবেলার সেনানী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

সারনাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মাঝে বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করছেন

উরুবেলার পথে এক নিবিড় বন। সেই বনের মধ্যে বিশাল বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বুদ্ধ মধ্যাহ্নে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় একদল যুবক হৈচৈ করে তাঁর নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করল, প্রভু! আপনি কি এ পথ দিয়ে কোনো স্ত্রীলোককে যেতে দেখেছেন? তখন বুদ্ধ বললেন, কুমারগণ। স্ত্রীলোকে তোমাদের কী প্রয়োজন? যুবকগণ জানাল, 'ঐ স্ত্রীলোক নগর-নন্দিকা, আমাদের সংগে প্রমোদবিহারে এসেছিল। আমরা সকলে প্রমোদে মেতে উঠেছিলাম। এ সুযোগে নগর-নন্দিকা আমাদের মূল্যবান বস্ত্রাদি-জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমরা এখন তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' তথাগত এবার যুবকদের প্রশ্ন করলেন,

কুমারগণ! তোমাদের পক্ষে কোনটি শ্রেয়কর বিবেচনা কর – এ গণিকা অন্বেষণ কিংবা আত্মানুসন্ধান? আত্মানুসন্ধান? সে আবার কী! কুমারগণ অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল। বুদ্ধ তাদের শান্ত হয়ে বসতে বললেন, তারাও বুদ্ধকে বন্দনা করে সামনে বসলেন। অতঃপর বুদ্ধ যুবকদের আত্মানুসন্ধান কী ব্যাখ্যা করলেন, শোনালেন ধর্মকথা। এতে যুবকদের জ্ঞানোদয় হলো। তাঁরা বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিলেন।

উরুবেলার পথে পথে তিনি অনেককে এই কল্যাণধর্মে দীক্ষিত করলেন। এঁদের মধ্যে অগ্নিউপাসক কশ্যপ ভ্রাতৃত্রয় উল্লেখযোগ্য। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি রাজগৃহে গিয়ে রাজা বিম্বিসারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। রাজা তাঁকে 'বেণুবন বিহার' দান করেন। এ বিহারেই সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন পঞ্চাশ জন শিষ্যসহ বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করেন। এখানেই বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য বিনয় বিধান প্রবর্তন করেন। রাজগৃহ থেকে তিনি কপিলাবস্তুতে যান। সেখানে পিতা শুদ্ধোদন, বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তৎপর তিনি গোপাদেবীকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। আনন্দ, দেবদত্ত, অনিরুদ্ধ, ভৃগু, কিম্বিল, ভদ্দিয় প্রমুখ শাক্যকুমারগণ এসময় বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এঁদের সহচর নাপিতপুত্র উপালিও একইসঙ্গে প্রব্রজ্যা নেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুন্দর নন্দকেও বুদ্ধ প্রব্রজ্যা দেন। পুত্র রাহুলকে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা দিয়ে তিনি বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকার দেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রস্নেহবশত বুদ্ধকে রাজ্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। উত্তরে বুদ্ধ রাজাকে এরূপ বলেন, "মহারাজের অপরিসীম পুত্রস্নেহ আমার অপরিজ্ঞাত নয়। কিন্তু আপনার স্নেহডোর তো এখন ছিন্ন হয়েছে। আপনার সেই পুত্র প্রীতির দৃষ্টি দিয়ে আপনি আপনার প্রজাবৃন্দের দিকে তাকান। তাদের প্রত্যেককে আপনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করুন এবং সকল মানুষকে, এমনকি প্রত্যেকটি জীবকে আপনি ভালোবাসুন। তা হলে আপনি সিদ্ধার্থের ন্যায় অগণিত সন্তান লাভ করবেন এবং পরিণামে নির্বাণ সুখের অধিকারী হবেন।" এভাবে বিমুক্ত পুরুষ ভগবান বুদ্ধ স্নেহশীল পিতাকে একজন আদর্শ প্রজাপালক, ধার্মিক নরপতির করণীয় বিষয়ে সচেতন করেন।

এক সময় শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে রোহিণী নদীর জল নিয়ে বিবাদ হয়েছিল। বুদ্ধ সে-বিবাদ মীমাংসার জন্য বৈশালী থেকে কপিলাবস্তু যান। এসময় পাঁচশত শাক্যকুমার ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করেন। তাঁদের স্ত্রীগণ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বৈশালীতে চলে যান। মহাপ্রজাপতি ও তাঁর সহচারিণীগণ হতাশ না হয়ে কেশ কর্তন এবং কাষায়বস্ত্র পরিধান করে বৈশালী পর্যন্ত বুদ্ধের অনুগমন করেন। তাঁরা ক্ষতবিক্ষত পায়ে বিহারে উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয়বার বুদ্ধকে অনুরোধ জানাল। শেষে আনন্দ থের তাঁদের ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা দেয়ার জন্য বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানান। অবশেষে বুদ্ধ প্রার্থনা অনুমোদন করলে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বাসনা পূর্ণ হয়। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে গোপা ও অন্যান্য শাক্য নারীদের নিয়ে ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে নারীগণ সঙ্ঘভুক্ত হলেন।

ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা প্রসঙ্গে বুদ্ধ প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন, "হে আনন্দ! পুরুষের ন্যায় নারীরাও শ্রামণ্যফলের অধিকারী হতে পারে।" তিনি আরও বলেন, "নারীরা উচ্চতর শ্রামণ্যফল লাভের যোগ্য এবং ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, ধর্মদিন্না, ভদ্দকপিলানীর ন্যায় ভিক্ষুণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমার প্রবর্তিত শাসনের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হবে না।" তিনি আরও বলেন, মার্গফললাভে নারী পুরুষের সমকক্ষ, কোনো তারতম্য নেই।

বুদ্ধ একসময় শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। কৃশা গৌতমী নামে এক অসহায় নারীর একমাত্র শিশুপুত্রটি মারা যায়। তিনি পুত্রশোকে পাগলিনীপ্রায় হয়ে বুদ্ধের কাছে ছুটে এসে তাঁর একমাত্র ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য অনুরোধ করেন। তথাগত বুদ্ধ অবগত আছেন মৃতের প্রাণ ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু এই শোকার্ত নারীর শোক উপশম করতে হবে। প্রকৃত সত্য বোঝাতে হবে। বুদ্ধ শান্ত, ধীর কণ্ঠে কৃশা গৌতমীকে বললেন, তুমি এমন গৃহ থেকে এক মুঠো সরিষা নিয়ে এসো, যেখানে কখনো পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র-কন্যা অথবা অন্য কারও মৃত্যু হয়নি। শোকার্ত জননী মৃত সন্তানকে কোলে নিয়ে সারাদিন শ্রাবস্তীর দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন একমুঠো সরিষার সন্ধানে। কিন্তু সরিষা পেলেও এমন কোনো গৃহ খুঁজে পেলেন না যেখানে কেউ মারা যায়নি। শ্রান্ত-অবসন্ন কৃশা গৌতমী দিনশেষে অনুধাবন করলেন, সকলেই মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুই মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তাঁর পুত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। অতঃপর তিনি বুদ্ধের কাছে ফিরে এলেন। বুদ্ধ বললেন, যে-ব্যক্তি মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত কোনোভাবেই তাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। জীবিত ব্যক্তিমাত্রই মৃত্যুর অধীন। একথা শ্রবণ করে কৃশা গৌতমীর শোক উপশম হলো, তাঁর জ্ঞানোদয় হলো। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশ করলেন। এভাবেই বুদ্ধ শরণাগতদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করতেন ।

বুদ্ধের সময় জাতিভেদ প্রথা চরম আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু বুদ্ধ তাঁর সঙ্ঘে সকল পেশা ও জাতি-গোত্রের মানুষের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত করেন। বৌদ্ধধর্মে কোনোরূপ শ্রেণিভেদ, জাতিভেদ কিংবা বর্ণবৈষম্যের স্থান নেই। ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ, মগধের রাজা বিম্বিসার, কোশলের রাজা প্রসেনজিতসহ বিভিন্ন রাজণ্যবর্গ, নাপিতপুত্র উপালি, ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ, নগরশোভিনী আম্রপালি, অস্পৃশ্য সুনীত, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক, দাসী পূর্ণা, স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ এমন অনেকের সমাগমে বুদ্ধের ধর্ম ও সঙ্ঘ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। জন্ম নয়, কর্মগুণেই এঁরা ধর্ম, সঙ্ঘ, বিনয় ও বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিলেন। সাম্য, মৈত্রী, করুণার মন্ত্রে উজ্জীবিত বৌদ্ধধর্ম নানারূপ বৈষম্য-পীড়িত তৎকালীন ভারতবর্ষে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি বিভিন্ন নগর ও জনপদে ধর্মপ্রচার করেন। তন্মধ্যে বুদ্ধগয়া, শ্রাবস্তী, সারনাথ, কৌশাম্বি, বৈশালী, রাজগৃহ, বজ্জি, মল্ল, পাবা, কুশীনারা, চুনার, কনৌজ, মথুরা, আলবী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনমূলক কাজ

পঞ্চবর্গীয় শিষ্য কাদের বলা হয়?

বেণুবন বিহার কেন বিখ্যাত?

বুদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনকে প্রজাপালন বিষয়ে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

পাঠ : ৮
মহাপরিনির্বাণ

গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর দিকে দিকে বিচরণ করে যে ধর্মের আদি, মধ্য ও অন্তে কল্যাণ তা প্রচার করেন। অতঃপর, এক মাঘী পূর্ণিমার দিনে তিনি বৈশালীর চাপাল চৈত্য নামক উদ্যানে অবস্থান

করছিলেন। ঐদিন তিনি উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘ, দেবতা ও মানুষের সামনে ঘোষণা দিলেন, পরবর্তী বৈশাখী পূর্ণিমাতিথিতে তিনি আয়ু সংস্কার ত্যাগ করবেন। জগতের আলো গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করবেন। অতঃপর তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে বৈশাখী পূর্ণিমার প্রাক্কালে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘসহ কুশীনগরে উপস্থিত হলেন। কুশীনগরের পাবা নামক স্থানে এসে তিনি স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। আহার শেষে তিনি অসুস্থ বোধ করেন। পাবা থেকে ফিরে বুদ্ধ মল্লদের শালবনে যমক (জোড়া) শালগাছের নিচে বিশ্রামের জন্য শয়ন করলেন। আকাশে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ। বুদ্ধের সেবক প্রিয় শিষ্য আনন্দ ও অন্য ভিক্ষুরা বুদ্ধের চারপাশে উপবিষ্ট। বুদ্ধের অন্তিম সময়ে আনন্দ অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়েন। আনন্দের উদ্দেশে বুদ্ধ বললেন, "আনন্দ ! অত্তদীপা বিহরথ, অত্তসরণা অঞ্ঞসরণা, ধম্মদীপা বিহরথ ধম্মসরণা অঞ্ঞসরণা।" অর্থাৎ হে আনন্দ নিজেই নিজের দীপ হয়ে বিচরণ করো, আত্ম শরণই অনন্য শরণ, ধর্মদীপ হয়ে বিচরণ করো। ধর্মের শরণই অনন্য শরণ। তিনি আরও বলেন, 'হে আনন্দ ! আমার অবর্তমানে তোমাদের এরূপ মনে হতে পারে, শাস্তার উপদেশ শেষ হয়েছে, আমাদের আর শাস্তা নেই। আনন্দ ! তোমরা এরূপ মনে করবে না। আনন্দ ! মহৎ কর্তৃক যে ধর্ম-বিনয় দেশিত ও প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে সেই ধর্ম-বিনয় আমার অবর্তমানে তোমাদের শাস্তা।' অতঃপর, শেষক্ষণে তিনি 'সুভদ্র' কে দীক্ষা দেন। বুদ্ধ শেষবারের মতো উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করলেন, বুদ্ধের প্রতি, ধর্মের প্রতি, সঙ্ঘের প্রতি অথবা আমার নির্দেশিত পন্থা সম্পর্কে কারো কোনো সংশয় আছে কি না। সমবেত ভিক্ষুগণ মৌন রইলেন। এসময় তিনি তাঁর শেষ উপদেশবাণী প্রদান করেন, "হে ভিক্ষুগণ। সংস্কারসমূহ ব্যয় ধর্মশীল (ক্ষয়শীল)। অপ্রমাদের সাথে নিজ নিজ কর্তব্যপালনে তৎপর হও।" বুদ্ধের শেষ বাণীসমূহ 'মহাপরিনির্বাণ সূত্রে' বর্ণিত হয়েছে। শেষ বাণী উচ্চারণের সাথে সাথে বুদ্ধ ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। একটির পর একটি ধ্যানের স্তর অতিক্রম করে তিনি নিরোধ সমাধি মগ্ন হলেন এবং রাত্রির তৃতীয় যামে পরম সুখময় মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর।

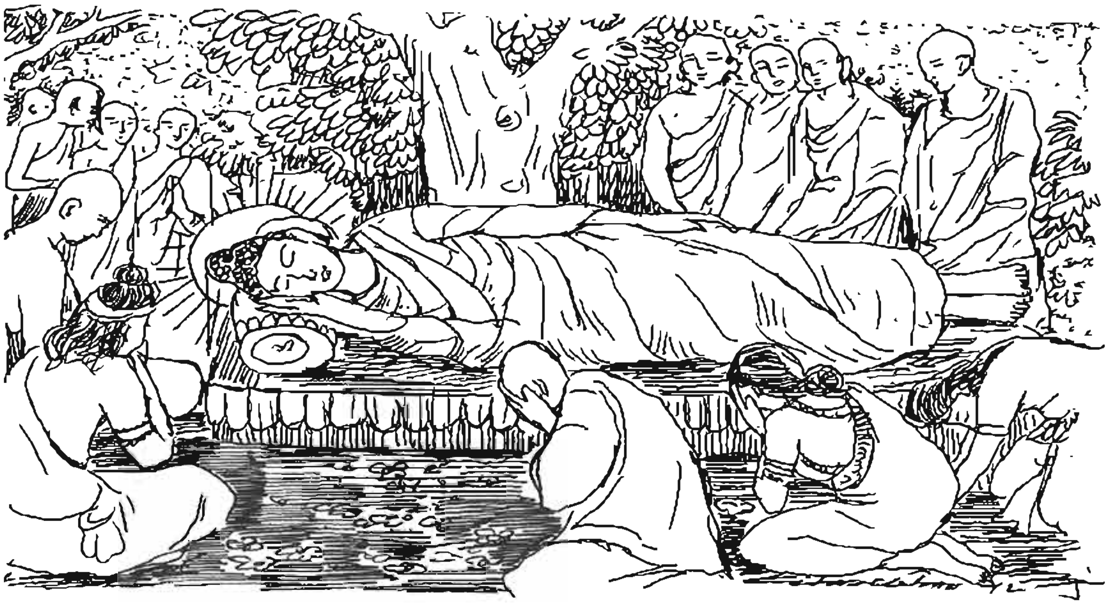

মহাপরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত বুদ্ধ

সপ্তাহকাল তাঁর মরদেহ সংরক্ষণ করা হয়। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ স্থবির তাঁর চিতায় অগ্নিসংযোগ করেন। তাঁর পূতাস্থিসমূহ ব্রাহ্মণ দ্রোণ আট ভাগ করেন। অজাতশত্রু, লিচ্ছবিগণ, শাক্যগণ, বুলিয়গণ, কোলিয়গণ, বেঠদ্বীপবাসী, পাবার মল্লগণ ও কুশীনারার মল্লরা পূতাস্থির অংশ লাভ করেন। বুদ্ধের পূতাস্থি 'বুদ্ধ ধাতু' নামে অভিহিত। বৌদ্ধরা এখনও বুদ্ধ ধাতুর উদ্দেশে বন্দনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধ কখন ও কোথায় মহাপরিনির্বাণের ঘোষণা দেন?

বুদ্ধের শেষ উপদেশ কী ছিল?

কে কে বুদ্ধের পূতাস্থি লাভ করেছিলেন?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. তাঁর জীবন ছিল .... রসে সিক্ত।
২. রানি .... আনন্দে শিহরিত হলেন।
৩. শাক্যবংশে এক .... আবির্ভাব হবে।
৪. উৎসবে মেতে উঠল .... ।
৫. বিশ্বে তিনি .... বুদ্ধ নামেই পরিচিত।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সিদ্ধার্থের জন্মলাভের ঘটনা সংক্ষেপে লেখ।
২. ঋষি অসিতের কাহিনী বর্ণনা কর।
৩. 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' বলতে কী বোঝ ?
৪. পঞ্চবর্গীয় শিষ্য কারা ?
৫. বুদ্ধের শেষ উপদেশ কী ছিল ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার সম্পর্কে যা জান আলোচনা কর।
২. সিদ্ধার্থের বাল্যকাল সম্পর্কে বর্ণনা কর।
৩. গৌতম বুদ্ধের 'মহাপরিনির্বাণ' বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। রানি মায়াদেবী কোন পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন ?

ক. বৈশাখী খ. আষাঢ়ী

গ. আশ্বিনী ঘ. কার্তিকী

২। বাল্যকালে সিদ্ধার্থের অনন্য প্রতিভার পরিচয় ঘটে –

i ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন করে

ii রোহিনী নদীতে পতিত বৃক্ষ সরিয়ে

iii জলের প্রবাহ উন্মুক্ত করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

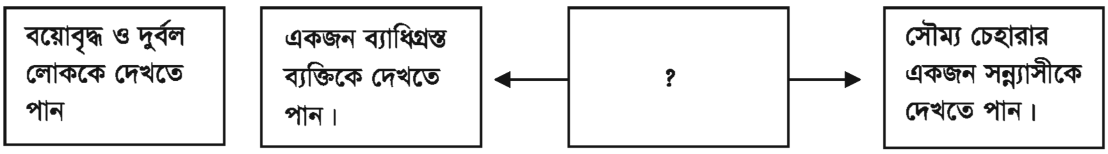

৩। '?' চিহ্নিত স্থানে কোন ঘটনার নির্দেশ করছে ?

ক. সিদ্ধার্থের সংসারজীবনের খ. সিদ্ধার্থের জন্মবৃত্তান্তের

গ. সিদ্ধার্থ একদল লোককে শবদেহ নিয়ে যেতে দেখতে পান ঘ. সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভের

৪। উক্ত ঘটনায় সিদ্ধার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন–

i মানবমুক্তির পথ অন্বেষণে

ii সন্ন্যাসধর্ম পালনে আত্মনিয়োগে

iii নির্বাসনে যাওয়ার

২০২১

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তথ্য ছক

ক্রমিক	বিষয়	ঘটনা
১.	জন্ম	শালবৃক্ষের নিচে
২.	পিতৃভূমি	কপিলাবস্তু
৩.	বিবাহবন্ধন	ষোল বছর বয়সে
৪.	তপস্যা	ছয় বছর

ক. কে হাঁসটিকে তীরবিদ্ধ করেন ?

খ. ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বানী কী ছিল ? ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রদর্শিত তথ্য ছকটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তথ্য ছকে বর্ণিত মনীষী "ছয় বছরের তপস্যায় মধ্যমপথ অবলম্বনের মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সমর্থ হন"–এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত ? যুক্তি প্রদর্শন কর।

২। শুভার্থী সমাজসেবী পরিবারের রূপবতী মেয়ে। তিনি যথাসময়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাই শুভার্থীর পিতা তাঁকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষিত, অশ্বচালনা ও সকল বিষয়ে পারদর্শী এক যুবকের সাথে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। তাঁদের সুখের সংসারজীবন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি বরং শুভার্থীর স্বামী মনের বাসনা পূরণের জন্য বৈরাগ্য জীবনগ্রহণের লক্ষ্যে চলে গেলেন এবং পরমজ্ঞান লাভে ব্রতী হন।

ক. রানি মহামায়া কোন পূর্ণিমায় স্বপ্ন দেখলেন ?

খ. মহর্ষি কালদেবল রাজকুমারকে দেখে প্রথমে খুশি হয়ে পরে কেঁদে ফেললেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার তুলনা করা হয়েছে–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শুভার্থীর স্বামী তাঁর মনের বাসনা পূরণে গৌতমবুদ্ধকে কীভাবে অনুসরণ করেন, তা ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২০২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব হচ্ছে উপাধি বা অভিধা। যিনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষ সাধন করে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হন তিনি বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। অপরদিকে যিনি বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ব্রত পালন করেন তিনি বোধিসত্ত্ব নামে পরিচিত। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব বৌদ্ধধর্মের প্রাণস্বরূপ। সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্য এ-দুটি সত্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এ অভিধা দুটি-ও কারো প্রদত্ত নয়। কেউ কাউকে এ-নাম দিতে পারে না। জীবনচর্যার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। একাগ্র সাধনা ও কঠিন অধ্যবসায়ের দ্বারাই এই দুই অবস্থানে উন্নীত হতে হয়। মানবজীবনে এগুলো সর্বোত্তম মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। এ-অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

* বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব ;
* বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব ;
* বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের গুণের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব।

পাঠ : ১

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পরিচয়

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব দুটি নামবাচক শব্দ। একটি অপরটির পরিপূরক। বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। এখানে বুদ্ধ বলতে শুধু গৌতম বুদ্ধ নয়। শাস্ত্রমতে তাঁর আগেও অনেক বুদ্ধ ছিলেন। তাঁরা আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যে প্রায় এক। তাঁরা অতুলনীয় গুণের আধার। বুদ্ধের ন্যায় বোধিসত্ত্বের সংখ্যাও অনেক। বুদ্ধত্ব অর্জনের সাধনায় তাঁরা নিবেদিত। নিম্নে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পরিচয় তুলে ধরা হলো :

বুদ্ধ-পরিচিতি :

'বোধি' শব্দের অর্থ পরম জ্ঞান। বোধ শব্দ থেকেই বোধি শব্দের উদ্ভব। যিনি বোধি বা জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভ করেন তিনিই হন বুদ্ধ। তাই 'বুদ্ধ' শব্দের সরল অর্থ জ্ঞানী। তবে এই জ্ঞান সাধারণ বা শুধু জাগতিক জ্ঞান নয়। বহুবিধ বিষয়ের সমন্বিত জ্ঞান। বিশেষত চার আর্যসত্য অধিগত জ্ঞান। এই জ্ঞানকে পরমার্থ জ্ঞানও বলা যায়। জাতিস্মর জ্ঞান ও পরচিত্ত অবগতি জ্ঞান এর অধীন। জাতিস্মর জ্ঞান হলো পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করতে পারা এবং পরচিত্ত অবগতি হলো অন্যের মানসিক অবস্থা জানতে পারার বোধশক্তি। এরূপ জ্ঞানশক্তি অর্জন অত্যন্ত কঠিন। কঠোর ত্যাগ তিতিক্ষা ও গভীর একাগ্রতায় রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম এ-জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাই তিনি জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হয়েছেন। 'বুদ্ধ' মানবোত্তম এক অভিধাবিশেষ। সর্ববিধ তৃষ্ণা বিনাশপূর্বক বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধনায় পূর্ণতা সাধিত হলেই এই অভিধা অর্জিত হয়।

সুতরাং বুদ্ধ শব্দের সাধারণ অর্থ জ্ঞানী হলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থ আরও গভীর। এজন্যই পৃথিবীর সব জ্ঞানী ব্যক্তি বুদ্ধ নন। বুদ্ধ রাগ, হিংসা ও লোভহীন এক মহোত্তম পুরুষ। বুদ্ধ নিজের এবং অন্যের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে বলতে পারতেন। কাকে, কখন এবং কীভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত তিনি তা জানতেন। বুদ্ধত্ব জ্ঞান অনন্য ও অসাধারণ। এ-জ্ঞান অতুলনীয়। কর্মের মাধ্যমেই এর পরিচয় মেলে। তিনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী, তাঁর জ্ঞানের পরিধিও অনন্ত। সাধারণ মানুষের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা তা পরিমাপ করা যায় না।

জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অত্যন্ত দুর্লভ। জন্মজন্মান্তরের একনিষ্ঠ সাধনায় বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়। বুদ্ধত্বলাভের পথ সবার জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু সকলের পক্ষে বুদ্ধত্ব লাভ করা সম্ভব হয় না। জগতে একজন বুদ্ধের অন্তর্ধানের বহুকাল পরে আর একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হওয়ার কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। নতুন বুদ্ধ আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী বুদ্ধের অনুশাসনই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অনুশীলন করে। যেমন এখন গৌতম বুদ্ধের অনুশাসন চলছে। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বুদ্ধত্ব অর্জনের সাধনা একটি অঙ্গীকারাবদ্ধ পথপরিক্রমার মতো। এটিকে পারমী পূর্ণতার পরিক্রমাও বলা যায়। অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম – জগতের এই তিন লক্ষণ যিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন তিনিই বুদ্ধত্বলাভে অগ্রসর হন। তিনি চতুরার্য সত্য উপলব্ধি করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গসাধনায় নিয়োজিত হন। এ ছাড়া বুদ্ধত্বলাভের জন্য পূরণ করতে হয় দশ পারমী। পারমী অর্থ পূর্ণতা। দশ পারমী হলো– দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, ক্ষান্তি, বীর্য, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী, উপেক্ষা ও প্রজ্ঞা। পারমী ও উপপারমী এবং পরমার্থ পারমী ভেদে এগুলো আবার ত্রিশ প্রকার। এসব বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করা সহজসাধ্য নয়। সকল পারমী পূরণের জন্য প্রয়োজন জন্মজন্মান্তরের অসংখ্য কুশল কর্মের প্রভাব। এই প্রভাব বা পুণ্যফল অর্জনের জন্য তাঁকে অসংখ্যবার জন্ম নিতে হয়। শুধু মানবকূলে নয়, অন্যান্য প্রাণী হিসেবেও তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হতে পারে। সেই অসংখ্য জন্মে তাঁকে কুশলকর্ম সম্পাদন করে পারমীপূর্ণ ও পুণ্য সঞ্চয় করতে হয়। এভাবে বিবিধ জন্মে পারমী পূরণ করে অতীতে বহু বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছেন, ভবিষ্যতেও হবেন।

বোধিসত্ত্ব-পরিচিতি :

'বোধিসত্ত্ব' বলতে দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সত্ত্বকে বোঝানো হয়। বোধি ও সত্ত্ব দুটি শব্দের সমন্বয়ে 'বোধিসত্ত্ব' শব্দটি গঠিত। এখানে 'বোধি' অর্থ হলো জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। আর সত্ত্ব হলো সেইজন, যিনি জ্ঞান বা প্রজ্ঞা-সাধনায় নিয়োজিত। তিনি জ্ঞান অর্জনের পথে বা দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণে নিজেকে উৎসর্গ করতে সমর্থ হয়েছেন। এ মহৎ লক্ষ্য অর্জনে তিনি সর্বদা প্রচেষ্টা করেন। তাই সরল অর্থে বোধিসত্ত্ব হলো বুদ্ধত্বলাভে অনুপ্রাণিত প্রজ্ঞাবান সত্ত্ব বা বোধি'র লালনকারী সত্ত্বই বোধিসত্ত্ব।

বোধিসত্ত্ব চেতনার উৎসাহ জাগ্রত হয় সাধনকারীর স্বতঃস্ফূর্ত অভিপ্রায় থেকে। কিন্তু আচরণ রীতি হয় অঙ্গীকারাবদ্ধ। এটি আবেগ ও কৌতূহলের বিষয় নয়। চিন্তাশীল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সচেতনভাবে অনুশীলনের বিষয়। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন মতে বহু জন্মের সুকৃতির ফল না থাকলে বোধিসত্ত্ব চেতনা জাগ্রত হয় না। বোধিসত্ত্ব সাধনার পূর্ণতা অর্জিত হয় বুদ্ধত্ব লাভের মাধ্যমে। তাই বোধিসত্ত্বকে বলা হয় বুদ্ধাঙ্কুর। এরূপ চেতনা অত্যন্ত বিরল ও দুর্লভ।

অনুশীলনমূলক কাজ
বুদ্ধ জ্ঞান কীরূপ?
বোধিসত্ত্ব শব্দের অর্থ কী?

পাঠ : ২

বুদ্ধের গুণাবলি

বুদ্ধের গুণ অসীম। এই বিশাল গুণ রাশি একসাথে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এগুলোকে শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন করলে নয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। সে হিসেবে বলা যায় বুদ্ধের গুণ নয়টি। এই নয়টি গুণ হলো নিম্নরূপ ঃ

১. তিনি অর্হৎ : সর্ববিধ অরি বা শত্রুশূন্য মুক্ত মহাপুরুষ।
২. তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ : সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন।
৩. তিনি বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন : অনুশীলনীয়তত্ত্ব ও উপযুক্ত আচরণ জ্ঞানসম্পন্ন ।
৪. তিনি সুগত : নির্বাণরূপ সুস্থানে সুন্দরভাবে পৌঁছেছেন ।
৫. তিনি লোকবিধ : ত্রিলোক সম্পর্কে সম্যকজ্ঞানসম্পন্ন ।
৬. তিনি অনুত্তর : শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাগুণের সর্বোচ্চস্থানের অধিকারী।
৭. তিনি পুরিসদম্ম সারথি : সর্ববিধ অশুভ শক্তির দমনকারী।
৮. তিনি সত্থা দেবমনুস্সানং : দেব ও মনুষ্যগণের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক।
৯. তিনি বুদ্ধোভগবা : সর্ববিধ জ্ঞানের পূর্ণতায় তিনি বুদ্ধ, সেই সমুদয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের আধার বলে তিনি ভগবান।

বুদ্ধের এই গুণসমূহ অর্জন সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি এই গুণরাশির গুরুত্ব উপলব্ধি করাও কঠিন। বুদ্ধ গুণাবলির যে-কোনো একটি গুণ যাঁর পক্ষে অর্জন সম্ভব, কেবল তিনিই এই গুণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। এজন্যেই বলা হয় বুদ্ধগুণ অচিন্তনীয়।

উপরে বর্ণিত নয়টি গুণের প্রত্যেকটি স্তর বহুবিধ বিষয়ে সমন্বিত ও সমৃদ্ধ। যেমন–অর্হৎ বা সর্ববিধ শত্রুশূন্য বলতে আট পর্যায়ের সমাধিচর্যায় উত্তীর্ণ হওয়াকে বোঝায়। রাগ, দ্বেষ, মোহ ও তৃষ্ণাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে এগুলো ক্রমান্বয়ে অনুশীলন করতে হয়। এই ক্রমিক সাধনরীতির প্রতিটি পর্যায়ের অর্জিত সুফলকেও সচেতনতার সাথে সুরক্ষা করতে হয়। সাধনচর্যা ও চর্যায় উন্নীত চিত্তাবস্থাকে স্থিত রাখতে পারলেই পরবর্তী পর্যায়ের অনুশীলন করা যায়। এভাবে দীর্ঘদিনের সাধনায় এক-একটি স্তর অতিক্রম সম্ভব হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে এগুলোকে মার্গ ও ফললাভের সাধনা বলা হয়। এগুলো হলো : ১) শ্রোতাপত্তি–মার্গ ২) শ্রোতাপত্তি–ফল ৩) সকৃতাগামী–মার্গ ৪) সকৃতাগামী–ফল ৫) অনাগামী–মার্গ ৬) অনাগামী–ফল ৭)অর্হৎ –মার্গ ৮)অর্হত্ব–ফল। সুতরাং অর্হৎ বলতে আট স্তরের উচ্চতর সাধন প্রক্রিয়ার পূর্ণতাকে বোঝায়। যিনি এ স্তরে উন্নীত হন, তিনি সর্বজয়ী সাধক।

সম্যক সম্বুদ্ধ বলতে স্ব-উদ্যোগে আর্যসত্যকে সম্যকভাবে স্বয়ং জ্ঞাত হওয়াকে বোঝায়। এজন্য তাঁকে তিন স্তরের জ্ঞান-মহিমায় সম্পূর্ণতা অর্জন করতে হয়েছে। এগুলো হলো : ১) যা জানা অপরিহার্য তা তিনি জেনেছেন, যেমন আর্যসত্য জ্ঞান ; ২) যা চিন্তা করার যোগ্য তা তিনি চিন্তা করেছেন, সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পাদন করে স্বয়ং জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং ৩) যা ত্যাগ করার যোগ্য তা তিনি সযত্নে ত্যাগ করেছেন। এভাবে তিনি তৃষ্ণাহীন বিশুদ্ধ মহাপুরুষ হয়েছেন। অনুরূপভাবে বুদ্ধগুণের প্রত্যেক স্তর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বলা হয় বুদ্ধগুণ অবর্ণনীয়, অচিন্তনীয়।

অনুশীলনমূলক কাজ
বুদ্ধের নয়টি গুণ কী কী?
মার্গ ও ফললাভের সাধনার স্তরগুলোর নাম লেখ

পাঠ : ৩

বুদ্ধের প্রকারভেদ

বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে তিন প্রকার বুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। যথা :

১. সম্মাসম্বুদ্ধ বা সম্যকসম্বুদ্ধ।

২. পচ্চেকবুদ্ধ বা প্রত্যেকবুদ্ধ।

৩. সাবকবুদ্ধ বা শ্রাবকবুদ্ধ।

নিচে এই তিন প্রকৃতির বুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সম্যক সম্বুদ্ধ :

বুদ্ধগণের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সম্যকসম্বুদ্ধ। সম্যকসম্বুদ্ধ বলতে বোঝায়, যিনি কোনো গুরুর সাহায্য ছাড়া স্বীয় আদর্শ ও কর্মের দ্বারা নিরলস প্রচেষ্টায় বুদ্ধত্বলাভ করেছেন। তিনি সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী। সম্যকসম্বুদ্ধগণ জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় দশ পারমী পূর্ণ করেন। তিনি শেষজন্মে মানবকুলে উপযুক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বের অনন্ত জন্মের সুকর্মের প্রভাবে এই জন্মে তিনি অর্হত্ব ফল বা সর্বজ্ঞতা অর্জন করে বুদ্ধ হন।

সম্যকসম্বুদ্ধগণ শুধু নিজের জন্য বুদ্ধ হন না। তাঁরা জগতের সর্বসত্তার পরম মুক্তির দ্বার উন্মোচনের ব্রত নিয়েই বুদ্ধ হন। এজন্যে সকল জীবের কল্যাণে তাঁরা দুঃখমুক্তির পথ ও নির্বাণলাভের উপায় প্রচার করেন।

বৌদ্ধমতে, জগতে সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব অতীব দুর্লভ। একই সময়ে পৃথিবীতে দুজন সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে না। একজন সম্যকসম্বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভ করার হাজার হাজার বছর পর অন্য এক সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। সে অনুযায়ী পৃথিবীতে এ পর্যন্ত আটাশজন সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাবের কথা জানা যায়।

'বুদ্ধবংস' নামক গ্রন্থ পাঠে আটাশজন বুদ্ধের কথা জানা যায়। এ গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী গৌতম বুদ্ধই হলেন সর্বশেষ সম্যকসম্বুদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা আড়াই হাজার বছরেরও আগে থেকে গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মপালন করে আসছেন। তাঁরই প্রতিমূর্তি অথবা ছবি সামনে রেখে বৌদ্ধেরা উপাসনা করেন। কারণ সর্বশেষ সম্যকসম্বুদ্ধরূপে তিনি মানুষের দুঃখমুক্তি ও তৃষ্ণাক্ষয়ের পথ প্রদর্শন করেছেন, নির্বাণ লাভের উপায় নির্দেশ করে গেছেন। তিনি ভবিষ্যত বাণী করেছেন, আর্য মৈত্রের নামে আর একজন সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। এভাবে সময়ের স্রোতে দশ পারমী পূর্ণ করে অনন্তকালের ব্যবধানে একেক জন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়।

প্রত্যেকবুদ্ধ

প্রত্যেকবুদ্ধ হলো আত্মমুক্তির সাধনায় পূর্ণতা অর্জনকারী বিমুক্ত মহাপুরুষ। তাঁরা সম্যক সম্বুদ্ধের দেশিত সাধনপ্রণালি অনুশীলন করে সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয় করেন। এভাবে স্বীয় সাধনাবলে অর্হত্ব ফল লাভ করে তাঁরা বুদ্ধ হন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ জীবনাবসানে নির্বাণ লাভ করে পুনর্জন্ম রোধ করেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণের সাধনালব্ধ জ্ঞান কেবল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁরা অন্যদের নিকট মুক্তির পথ উন্মোচন করেন না।

প্রত্যেকবুদ্ধগণ মূলত সম্যকসম্বুদ্ধের অনুগামী বুদ্ধ। অর্হত্ব ফললাভী এবং নির্বাণগামী এরূপ অসংখ্য প্রত্যেকবুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন। এজন্য বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন জগৎ অর্হৎ বা বুদ্ধশূন্য নয়। সম্যক সম্বুদ্ধগণের মতো প্রত্যেকবুদ্ধগণ সরব নয়। তাঁরা নীরবে নিভৃতে সাধনা করে থাকেন।

শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রাবকবুদ্ধ হলো সম্যকসম্বুদ্ধের অনুশাসন অনুশীলনে পারঙ্গম পুণ্যপুরুষ। একজন সম্যকসম্বুদ্ধের অনেক শিষ্য থাকেন। এই শিষ্যদেরও অনেক শিষ্য থাকেন। এসব শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সম্যকসম্বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে মুক্তি সাধনায় রত থাকেন। এঁদের মধ্যে অনেকে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। তাঁরা আর জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করবেন না। তাঁরা নির্বাণগামী। এরূপ বিমুক্ত পুরুষকে বলা হয় শ্রাবকবুদ্ধ।

সম্যকসম্বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন অনুশীলনের শীর্ষে অবস্থান করেন শ্রাবকবুদ্ধগণ। প্রত্যেক সম্যকসম্বুদ্ধের অনুসারীদের মধ্যে শ্রাবকবুদ্ধ থাকেন। গৌতম বুদ্ধের অনেক শিষ্য শ্রাবকবুদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন, মহাকশ্যপ, বিনয়ধর উপালি, ধর্মভাণ্ডারিক আনন্দ, লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বুদ্ধের সময় অনেক শ্রাবকবুদ্ধ ছিলেন। তাঁরা জীবজগতের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন এবং অন্যদের নির্বাণলাভে সহায়তা করেন।

২০২৩

অনুশীলনমূলক কাজ
তিন প্রকার বুদ্ধের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ কোনটির অন্তর্গত?
প্রত্যেকবুদ্ধের গুণাবলি বর্ণনা কর
কয়েকজন শ্রাবকবুদ্ধের নাম বল

পাঠ : ৪

বোধিসত্ত্বের গুণাবলি

বোধিসত্ত্বের পরম গুণ হলো দশ পারমীর পূর্ণতা সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। এটি বোধিসত্ত্বের অনুশীলনীয় মুখ্য বিষয়। এই পারমীসমূহ চর্চার ফলে বোধিসত্ত্বের জীবনাচরণে স্বাভাবিকভাবে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়, যা অন্য মানুষদের থেকে বোধিসত্ত্বকে অনন্য ও অসাধারণ করে তোলে। এই অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহই হলো বোধিসত্ত্বের গুণ।

বোধিসত্ত্বগুণ হঠাৎ সৃষ্টি হয় না। গুণগুলো বোধিসত্ত্ব সাধনার ক্রমধারায় ধাপে ধাপে অর্জিত হয়। যেমন বোধিসত্ত্ব চেতনা সকলের অন্তরে বিরাজমান হলেও সকলেই বোধিসত্ত্ব পদবাচ্য নয়। যিনি বুদ্ধত্বলাভে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে পারমী পূর্ণতার সাধনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন, তিনিই প্রকৃত অর্থে বোধিসত্ত্ব। পারমী পূর্ণতার অভিপ্রায়ে যে-চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী হওয়া যায় সেগুলোই হলো বোধিসত্ত্বের গুণ।

বোধিসত্ত্বব্রত অনুশীলন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। জন্ম-জন্মান্তরে এটি অনুশীলন করতে হয়। বোধিসত্ত্ব জীবনলাভের জন্য কিছু গুণ অর্জন করতে হয়। এগুলো এক জন্মের সাধনায় অর্জন করা যায় না। এর জন্য জন্ম-জন্মান্তরের অব্যাহত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এরূপ নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই বোধিসত্ত্ব গুণের অধিকারী হতে হয়। বোধিসত্ত্ব গুণ নিম্নরূপ:

১. সর্ব বিষয় অনিত্য –এ ধারণাকে বোধিসত্ত্ব জীবনাচারের সর্বোচ্চ সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন।

২. তথাগত বুদ্ধের দর্শনকেই বোধিসত্ত্বরা একমাত্র পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে সর্বসত্তার কল্যাণকামী হন।

৩. স্বকৃত কর্মকেই জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গী হিসেবে বোধিসত্ত্বরা গ্রহণ করেন। তাই নিঃস্বার্থ, নির্মোহ কর্ম অনুশীলনই বোধিসত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪. বোধিসত্ত্বের একমাত্র লক্ষ্য বুদ্ধত্বলাভ। নাম, যশ, খ্যাতি নিয়ে তাঁরা চিন্তা করেন না।

৫. বোধিসত্ত্বগণ জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু সত্যসাধনা হতে বিচ্যুত হন না।

৬. বোধিসত্ত্বগণ সত্য, ন্যায় ও ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলনে বদ্ধপরিকর হন।

৭. বোধিসত্ত্বগণ সর্বদা সর্বসত্তার কল্যাণ কামনা করেন। তাঁদের কাছে আপন–পর ভেদাভেদ নেই।

৮. বোধিসত্ত্বগণ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার সর্বোত্তম অনুশীলনকারী হন।

২০২১

৯. বোধিসত্ত্বগণ দশ পারমী অনুশীলনে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

১০. বোধিসত্ত্বব্রত একটি স্বতঃস্ফূর্ত সাধনা, বোধিসত্ত্বগণ আপন চেতনা বলে বলীয়ান হয়ে স্বচিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হন।

উপরে বোধিসত্ত্বের শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য ও বিরল গুণসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কী কী গুণ থাকলে আমরা বোধিসত্ত্বকে চিনতে পারি – উল্লেখ কর

পাঠ : ৫

বোধিসত্ত্বের প্রকারভেদ

বোধিসত্ত্ব সাধনা অত্যন্ত দুষ্কর। কঠোর তপস্যা ও চরম আত্মত্যাগের দৃঢ় চেতনায় প্রত্যয়াবদ্ধ হয়েই এ-সাধনা করতে হয়। মানুষ সহজে বোধিসত্ত্বব্রত অনুশীলন করতে পারে না। কারণ মানুষের সহজাত স্বার্থচিন্তা মানুষকে সহজ প্রাপ্তির দিকে ধাবিত করে। পরম মুক্তির কথা মানুষ ভাবতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম মতে বোধিসত্ত্ব তিন প্রকার। যথা :

ক) শ্রাবকবোধিসত্ত্ব
খ) প্রত্যেকবোধিসত্ত্ব
গ) সম্যকসম্বোধিসত্ত্ব

ক) **শ্রাবকবোধিসত্ত্ব :** এখানে শ্রাবক অর্থে শ্রবণকারী, শ্রোতা, শিষ্য বা শ্রদ্ধানুরাগে অনুপ্রাণিত হয়ে বোধিজ্ঞান লাভকারীকে বোঝানো হয়। এরূপ বোধিসত্ত্বের সাধনা ইচ্ছা, শ্রবণ বা দর্শন থেকে জাগ্রত হলেও আবেগতাড়িত নয় বরং স্থির সিদ্ধান্তপ্রসূত। গৌতম বুদ্ধের শিষ্য প্রশিষ্যগণ যাঁরা এরূপ জ্ঞান মার্গের সাধনাব্রতে রত ছিলেন তাঁদের শ্রাবকবোধিসত্ত্ব বলা হয়। সাধনমার্গের পূর্ণতায় শ্রাবকবোধিসত্ত্বগণ শ্রাবক বুদ্ধে উন্নীত হন। শ্রাবকবোধিসত্ত্ব সারিপুত্র, মোদ্‌গল্যায়ন প্রমুখ বুদ্ধের সময়ে শ্রাবকবুদ্ধ হন।

খ) প্রত্যেকবোধিসত্ত্ব : স্ব-উদ্যোগে ও স্বাধীনভাবে কোনো গুরুর অধীন না হয়ে বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে বোধিজ্ঞান লাভের সাধনায় নিয়োজিত সাধককে প্রত্যেকবোধিসত্ত্ব বলে। প্রত্যেকবোধিসত্ত্বগণ বোধিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ গুণে গুণান্বিত হলেও তাঁরা নিজ গুণ প্রভায় অন্যকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন না। বুদ্ধের অনেক শিষ্যই এই স্তরের ছিলেন।

গ) সম্যকসম্বোধিসত্ত্ব : বোধিসত্ত্ব সাধনার সর্বোত্তম প্রক্রিয়া এটি। সর্বসত্তার কল্যাণব্রত নিয়ে বোধিচিত্ত সাধনার অনুসরণকারীকে সম্যকসম্বোধিসত্ত্ব বলে। তাঁরা সাধনার পূর্ণতায় সম্যক সম্বুদ্ধ হন। যেমন গৌতম বুদ্ধ একজন সম্যকসম্বুদ্ধ। সম্যক সম্বোধিসত্ত্বগণ সর্বজীবের মুক্তির মাধ্যমেই নিজের মুক্তি প্রত্যাশা করেন। এভাবেই তাঁরা পারমী অনুশীলন করেন।

আবার সাধনা ব্রতের উৎস বিচারেও বোধিসত্ত্বকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। কোন প্রেক্ষিতে কীভাবে বোধিচিত্ত বা বোধিসত্ত্ব সাধনার উৎসাহ জাগ্রত হলো সে উৎসের ভিত্তিতে বোধিসত্ত্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব
২. শ্রদ্ধাধিক বোধিসত্ত্ব
৩. বীর্যাধিক বোধিসত্ত্ব

১. প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব — যে বোধিসত্ত্ব লক্ষ্য অর্জনে প্রজ্ঞা সাধনাকে সর্বাগ্রে স্থান দেয় তাঁকে প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব বলে। এ-স্তরের বোধিসত্ত্বগণ প্রজ্ঞা পারমী'র অনুশীলনের মাধ্যমে স্বীয় চিত্তকে নিয়ন্ত্রণে এনে ক্রমে অন্য পারমীর পূর্ণতাসাধন করেন।

এরূপ বোধিসত্ত্বগণ সর্বক্ষেত্রে বিশ্লেষণধর্মী হন। তাঁরা প্রজ্ঞার আলোকে প্রত্যেকটি বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করেন। অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে তাঁরা স্বীয় পথ পরিক্রমায় অগ্রসর হন।

২. শ্রদ্ধাধিক বোধিসত্ত্ব — যে-বোধিসত্ত্ব লক্ষ্য অর্জনে শ্রদ্ধাকেই সর্বাগ্রে স্থান দেন তাঁকে শ্রদ্ধাধিক বোধিসত্ত্ব বলে। এ স্তরের বোধিসত্ত্বগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে সকল পারমী পূর্ণ করেন।

শ্রদ্ধাধিক বোধিসত্ত্বগণ নিবেদিত প্রাণ সাধক হন। তাঁরা শ্রদ্ধা চিত্তে একবার যে আদর্শকে গ্রহণ করেন আমৃত্যু সে-ব্রত পূরণে প্রত্যয়াবদ্ধ থাকেন।

৩. **বীর্যাধিক বোধিসত্ত্ব** – যে বোধিসত্ত্ব লক্ষ্য অর্জনে কর্ম প্রচেষ্টাকেই সর্বাগ্রে স্থান দেন তাঁকে বীর্যাধিক বোধিসত্ত্ব বলে। এ-স্তরের বোধিসত্ত্বগণ বীর্য পারমী'র অনুশীলনের মাধ্যমে স্বীয় চিত্তকে নিয়ন্ত্রণে এনে ক্রমে অন্য পারমীর পূর্ণতা সাধন করেন।

বীর্যাধিক বোধিসত্ত্বগণ কঠিন সাধনা ব্রতের অনুরাগী হন। তাঁরা কঠোর সাধনায় নিয়োজিত থাকেন। বীর্য পারমীর বলে মহীয়ান হয়ে তাঁরা সাধনায় অটল থাকেন।

অনুশীলনমূলক কাজ
শ্রাবক বোধিসত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর
প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

পাঠ : ৬

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পার্থক্য

যিনি বোধিজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করেন তাঁকে বোধিসত্ত্ব বলে। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ নন। তাঁদের ভাবী বুদ্ধ বা বুদ্ধাঙ্কুর বলা হয়। ভবিষ্যতে কোনো এক জন্মে তিনি বুদ্ধ হবেন। বুদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁকে বিভিন্ন কুলে অসংখ্যবার জন্ম নিতে হয় এবং দশ উপপারমী, দশ পারমী ও দশ পরমার্থ পারমী পূর্ণ করতে হয়। অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরের কর্মের ধারাবাহিকতায় দশ পারমীর প্রত্যেকটি ত্রি-পর্যায়ে অনুশীলন করে আত্ম শুদ্ধির সাধনায় পরিপূর্ণতা অর্জন করতে হয়। নিজেকে সকল আসক্তি থেকে বিমুক্ত করাই বোধিসত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য।

গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠে একথা জানা যায়। এসব জন্মে বিভিন্ন নামে তাঁকে আখ্যায়িত করা হলেও তাঁর প্রধান পরিচয় হলো বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বরূপে এক জন্মে তিনি পূর্ববর্তী বুদ্ধ দীপঙ্করের কাছ থেকে আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলেন। দীপঙ্কর সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন লক্ষকল্প বছর আগে। সেসময় গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব জীবন সাধনায় রত ছিলেন। তিনি তখন বোধিসত্ত্ব সুমেধ তাপস নামে অমরাবতী নগরে বাস করতেন। দীপঙ্কর বুদ্ধ সশিষ্য এ অমরাবতী নগরে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

অমরাবতী নগর ধনধান্যে পরিপূর্ণ হলেও এর যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। তখন ছিল বর্ষাকাল। বৃষ্টিতে পথঘাট কর্দমাক্ত ছিল। নগরবাসীগণ বুদ্ধের যাতায়াতের জন্য রাস্তা মেরামতে ব্যস্ত ছিলেন। সুমেধ তাপসও সবার সাথে একাজে অংশ নিলেন। এদিকে বুদ্ধের আগমনের সময় হলো। কিন্তু রাস্তার কাজ তখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। এদিকে দীপঙ্কর বুদ্ধ শিষ্যদের নিয়ে সেই অসমাপ্ত রাস্তার কাছে এসে পড়েছেন। আর মাত্র কয়েক হাত রাস্তার কাজ বাকি। নগরবাসীগণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। সুমেধ তাপস দেখলেন আর কোনো উপায় নেই। তিনি হাতের কোদাল ফেলে পরম শ্রদ্ধাভরে সেই কাদাভরা রাস্তার ওপর শুয়ে পড়লেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনি দীপঙ্কর বুদ্ধকে অনুরোধ করলেন তাঁর শায়িত দেহের ওপর দিয়ে যাওয়ার জন্য। দীপঙ্কর বুদ্ধ তাঁর মানসচেতনা উপলব্ধি করলেন। সুমেধ তাপসের মধ্যে তিনি অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। অতঃপর দীপঙ্কর বুদ্ধ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন। রাস্তা পার হওয়ার জন্য তিনি সুমেধ তাপসের গায়ের ওপর পা রাখলেন। ঠিক সে-সময় সুমেধ তাপস দীপঙ্কর বুদ্ধের কাছে সশ্রদ্ধ চিত্তে ভবিষ্যতে সম্যকসম্বুদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশা পূরণের আশীর্বাদ কামনা করেন। দীপঙ্কর বুদ্ধ সুমেধ তাপসের মধ্যে ভাবী বুদ্ধের সব লক্ষণ দেখতে পেলেন। তখন তিনি সুমেধ তাপসের প্রার্থনা পূরণের জন্য আশীর্বাদ করেন। তাঁর আশীর্বাদ সুমেধ তাপসের বোধিসত্ত্ব জীবনের সাধনাকে অনেক বেগবান করে। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় তিনি সকল পারমী পূর্ণ করতে সমর্থ হন। এ-সুকৃতির ফলে শেষ জন্মে তিনি রাজা শুদ্ধোদনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। এ-সময় তাঁর নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে একাগ্র সাধনায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন।

বুদ্ধ সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণের আগে অসংখ্য জন্ম বোধিসত্ত্ব সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর বোধিসত্ত্ব জীবনের সাধনার কথা জাতক সাহিত্যে বর্ণিত আছে। জাতকের বর্ণনামতে গৌতম বুদ্ধ ৫৫০ বার বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জাতকের কাহিনীতে তিনি দান, ধর্ম ও সেবা ইত্যাদি সৎকাজ দ্বারা পারমী পূর্ণ করেন বলে উল্লেখ আছে। এই পারমী পূরণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনি মানুষ, পশু-পাখিসহ নানা জাতিতে জন্ম নিয়েছিলেন। মহাসুদর্শন জাতকে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব কুশাবতী নগরে মহাসুদর্শন নামে এক রাজা হয়ে জন্মেছিলেন। বানরিন্দ্র জাতকে বানররূপে জন্মেছিলেন। মখাদেব জাতকে রাজা মখাদেবরূপে এবং মহাজনক জাতকে রাজা মহাজনকরূপে জন্মেছিলেন। এছাড়া বোধিসত্ত্ব চণ্ডাল, শুদ্র, ক্ষত্রিয়, ময়ূর, কপোত, হাতি, ইত্যাদি নানা কুলেও জন্ম নিয়েছিলেন। এ-জন্মসমূহের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পারমী পূরণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করা। এ-আলোচনা বোঝা যায়, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

২০২৫

বুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব
১. বুদ্ধ — সম্যক জ্ঞানে ও গুণে পূর্ণতা বিষয়ক অভিধা বা উপাধি।	১. বোধিসত্ত্ব — সম্যক জ্ঞান চর্চাকারীর অভিধা বা উপাধি।
২. দশ পারমীর সাধনা পূর্ণ করেই বুদ্ধত্ব অর্জিত হয়। বুদ্ধগণ সর্ব তৃষ্ণামুক্ত বলে পরিনির্বাণ লাভ করেন।	২. অনন্ত জন্মের কর্মপ্রচেষ্টায় বোধিসত্ত্বগণের পারমী চর্যা গতিশীল হয়। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় কারো পক্ষে নির্বাণলাভ সম্ভব নয়।
৩. বুদ্ধগণ বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত থাকেন। তাই তাঁদেরকে ত্রিকালদর্শী বলে।	৩. বোধিসত্ত্বগণ ত্রিকালদর্শী নন। তাঁরা বর্তমান জন্মে সচেতনভাবে কুশলকর্ম সম্পাদনে বেশি তৎপর থাকেন।
৪. বুদ্ধগণ সর্বজ্ঞ। তাঁরা সকল পার্থিব ও লোকোত্তর বিষয় সম্পর্কে জানেন। মানুষসহ সকল জীবের ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।	৪. বোধিসত্ত্বগণ সর্বজ্ঞ জ্ঞানলাভের চর্চাকারী। জীবের ইহকাল ও পরকাল তাঁদের অজ্ঞাত। এ-ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব।
৫. বুদ্ধগণ স্থিত চিত্তের অধিকারী। লোভ, দ্বেষ, মোহ, নিন্দা, প্রশংসা ইত্যাদির অনেক ঊর্ধ্বে তাঁদের অবস্থান। তাঁরা বিমুক্ত মহাপুরুষ।	৫. বোধিসত্ত্বগণের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটতে পারে। বুদ্ধদের মতো তাঁরা বিমুক্ত মহাপুরুষ নন। ভবিষ্যতে বুদ্ধ হওয়াই তাঁদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য ।
৬. বুদ্ধগণ ভবিষ্যৎ বুদ্ধের আগমন সম্পর্কে আভাস দিতে পারেন।	৬. বোধিসত্ত্বগণের পক্ষে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করা সম্ভব নয়।
৭. বুদ্ধগণ আত্মস্থ ধর্ম দর্শন প্রচার করেন।	৭. বোধিসত্ত্বগণ নিজে কোনো দর্শন প্রচার করেন না। তাঁরা সর্বদা বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম দর্শনের অনুসারী।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ‘বুদ্ধ’ শব্দের সরল অর্থ ----।

২. দশ পারমীর সাধনা পূর্ণ করেই ----- অর্জিত হয়।

৩. যিনি বোধিজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করেন ------ বলে।

৪. বোধিসত্ত্বগণ ----- পারমী অনুশীলনে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

৫. জাতকের বর্ণনা মতে গৌতম বুদ্ধ ---- বার বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

৬. বোধিসত্ত্ব অবস্থায় কারো পক্ষে ---- লাভ সম্ভব নয়।

২০২১

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বুদ্ধ কত প্রকার ও কী কী?
২. বোধিসত্ত্ব কত প্রকার ও কী কী?
৩. বুদ্ধ গুণ কেন অচিন্তনীয়?
৪. বোধিসত্ত্ব জীবনের কাহিনী কোথায় বর্ণিত আছে ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বুদ্ধত্বলাভের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
২. বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
৩. বুদ্ধ গুণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।
৪. সুমেধ তাপস কে? তিনি কীভাবে বুদ্ধ হয়েছিলেন লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ‘বোধি’ শব্দের অর্থ কী ?

ক. পরমজ্ঞান খ. জাতিস্মর জ্ঞান
গ. সাধারণ জ্ঞান ঘ. ব্রহ্মজ্ঞান

২। সম্যক সম্বুদ্ধকে সর্বোত্তম বুদ্ধ বলার প্রধান কারণ কোনটি ?

ক. একাধিক শিষ্য থাকা
খ. আত্মমুক্তি সাধনায় পূর্ণতা অর্জন
গ. দুঃখমুক্তি ও তৃষ্ণাক্ষয়ের পথপ্রদর্শন
ঘ. গুরুর শরণাপন্ন না হওয়ার জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

বেস্‌সান্তর রাজা সর্বজীবের প্রতি দয়ালু ছিলেন। তিনি কারো দুঃখ সহ্য করতে পারতেন না। সর্বজীবকে মুক্ত করার মানসে তিনি দান পারমী পূর্ণ করতে গিয়ে সমস্ত সম্পদ দান করে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেন।

৩। বেস্‌সান্তর রাজাকে কোন ধরনের বোধিসত্ত্ব বলা হয় ?

ক. প্রত্যেকবোধিসত্ত্ব খ. সম্যকসম্বোধিসত্ত্ব
গ. শ্রাবকবোধিসত্ত্ব ঘ. শ্রদ্ধাধিকবোধিসত্ত্ব

২০২১

৪। সর্বজীবকে মুক্ত করার মানসে বেস্সান্তর রাজা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব যে-জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন –

i. আর্যসত্য জ্ঞান

ii. সম্যক জ্ঞান

iii. সর্বজ্ঞ জ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বিজয় বড়ুয়া ত্রিরত্নের সেবক ছিলেন। তিনি সর্বদা কুশলকর্মে রত থাকতেন। ভিক্ষুদের ধর্মদেশনা খুব শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ করতেন। তিনি জানতে পারলেন, মার্গলাভী এক ভিক্ষু গভীর জঙ্গলে ধ্যান করতে যাচ্ছেন। তা শুনে ভিক্ষু পৌঁছার আগে তিনি সেখানে গিয়ে অনেক কষ্টে জঙ্গল পরিষ্কার করে সুন্দর একটি আসনের ব্যবস্থা করেন এবং বহুদূরে লোকালয়ে গিয়ে পিণ্ডাচরণের সুযোগ করে দিলেন।

ক. জাতিস্মর জ্ঞান কী ?

খ. বোধিসত্ত্ব সাধনা অত্যন্ত দুষ্কর কেন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

গ. বিজয় বড়ুয়ার সাথে কোন সাধকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "বিজয় বড়ুয়া যে-কোনো এক জন্মে শ্রাবক বুদ্ধ হওয়ার যোগ্য" – একথাটির সাথে তুমি কী একমত? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২।

ছক-১	ছক-২	ছক-৩
পারমী চর্চা গতিশীল	স্বীয় সাধনায় অর্হত্বফল লাভ করেন	সম্যক সম্বুদ্ধের অনুসারী লাভীশ্রেষ্ঠ সিবলী

ক. জগতে কার আবির্ভাব অত্যন্ত দুর্লভ ?

খ. বুদ্ধগুণ অচিন্তনীয় কেন ? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

গ. ছক ১-এ কাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছক ২ ও ৩-এ যাঁদেরকে নির্দেশ করছে তাঁদের কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিপিটক

'ত্রিপিটক' বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনই ত্রিপিটকের মূলভিত্তি। ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত। ধর্মীয় গ্রন্থ হলেও প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্ম-দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে ত্রিপিটকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এজন্য ত্রিপিটককে ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহাসিক তথ্যভাণ্ডার হিসেবেও অভিহিত করা হয়। ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু ধর্মীয় জ্ঞানকে যেমন সমৃদ্ধ করে, তেমনি মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিকে বিকশিত করে। এ-অধ্যায়ে আমরা পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটক সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

* পটভূমি উল্লেখসহ ত্রিপিটক সম্পর্কে ধারণা দিতে পারব ;
* ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের নামসহ বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারব ;
* ত্রিপিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

ত্রিপিটকের পটভূমি

বুদ্ধ লিখিত আকারে কোনো ধর্মোপদেশ দান করেননি। তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব ধর্মোপদেশ দান করতেন তা শিষ্যরা কণ্ঠস্থ করে ধারণ করে রাখতেন এবং প্রচার করতেন। বুদ্ধের শিষ্যরা ছিলেন শ্রুতিধর। তাঁরা বুদ্ধবাণী সহজে স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে পারতেন। বুদ্ধশিষ্যরা একেক জন একেক রকম গুণসম্পন্ন ছিলেন। কেউ ছিলেন বিনয়ে পারদর্শী, কেউ সূত্রে, কেউ বুদ্ধের ধর্মবাণী ব্যাখ্যায়, কেউ দর্শনে, কেউ ধর্ম দেশনায়। এ-কারণে বুদ্ধশিষ্যগণ বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হতেন। যেমন : বিনয়ধর, সূত্রধর, অভিধর্মধর, ধর্মকথিক, অগ্রশ্রাবক, মহাশ্রাবক ইত্যাদি। ভিক্ষু উপালি ছিলেন বিনয়ধর। তিনি বুদ্ধভাষিত বিনয় ধারণ, পালন ও ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তদ্রূপ আনন্দ ছিলেন সূত্রধর। তিনি বুদ্ধভাষিত সূত্রসমূহ ধারণ করে রাখতেন। এজন্য তাঁকে 'ধর্মভাণ্ডারিক' বলা হতো। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় মহাকচ্চায়ন, সারিপুত্র, মহাকোট্ঠিত থের ছিলেন অগ্রগণ্য। এরূপ বুদ্ধের অসংখ্য শিষ্য ছিলেন। শ্রুতিধর এসব শিষ্য বুদ্ধের ধর্মবাণী ধারণ, পালন এবং প্রচারে খুবই যত্নশীল ছিলেন। তখন কেউ এই অমূল্যবাণী লিখে রাখার কথা ভাবেননি।

বুদ্ধশিষ্যগণ সবসময় এক স্থানে থাকতেন না। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বুদ্ধবাণী প্রচার করতেন। বুদ্ধের জীবিতকালে সঙ্ঘে যে-কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে তা বুদ্ধ সমাধান করতেন। কখনো বুদ্ধের নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ তাঁর অনুমতিসাপেক্ষে সমাধান করতেন। ফলে বুদ্ধের জীবিতকালে বড় ধরনের কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু কতিপয় দুর্বিনীত ভিক্ষু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণে পুলকিত বোধ করেন। কারণ, তাঁদের আর বুদ্ধের বিনয়-বিধান মেনে চলতে হবে না। বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করলে বুদ্ধশিষ্যগণ কান্না করতে থাকেন। তখন বুদ্ধের শেষ শিষ্য সুভদ্র ভিক্ষুদেরশোক করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, মহাশ্রমণের মৃত্যুতে

আমরা উপদ্রব হতে মুক্ত হয়েছি এবং এখন থেকে আমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারব। বুদ্ধশিষ্যগণ সুভদ্রের উক্তি এবং দুর্বিনীত শিষ্যদের মনোভাব বুঝে বুদ্ধবাণীর পরিহানির আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা আশঙ্কা করলেন, বুদ্ধবাণী অসংকলিত অবস্থায় থাকলে যে-কোনো সময় বিকৃত হতে পারে। অতঃপর, বুদ্ধশিষ্যগণ মহাকশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে প্রথম সঙ্গীতি আয়োজন করে বুদ্ধবাণী সংকলিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় এ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীতিতে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীতিতে বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য উপালি ও আনন্দ যথাক্রমে ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি করেন। উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘ তাঁদের আবৃত্তিকৃত ধর্ম-বিনয় বুদ্ধবাণী হিসেবে অনুমোদন করেন। এ সঙ্গীতি সাত মাসব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। এভাবে ভিক্ষুসঙ্ঘের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে প্রথম সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী ধর্ম ও বিনয় হিসেবে দুভাগ করে সংকলন করা হয়।

প্রথম সঙ্গীতিতে সংকলিত ধর্ম-বিনয় বুদ্ধশিষ্যগণ কণ্ঠস্থ করে সংরক্ষণ ও প্রচার করতেন। কিন্তু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বছর পরে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ বিনয় বহির্ভূত দশটি বিধিবিধান চালু করলে সঙ্ঘে বিভাজন সৃষ্টি হয় এবং বুদ্ধবাণী নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। তখন এ বিতর্ক নিরসনের জন্য দ্বিতীয় সঙ্গীতির আয়োজন করা হয়। বৈশালীর বালুকারামে যশ স্থবিরের নেতৃত্বে এবং রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীতি আটমাস স্থায়ী হয়েছিল। এতে সাত শত অর্হৎ ভিক্ষু অংশ গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে উপস্থিত ভিক্ষুগণ বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রবর্তিত বিধিবিধান বিচার-বিশ্লেষণ করে বিনয় বর্হিভূত হিসেবে রায় প্রদান করেন এবং প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত ধর্ম ও বিনয় পুনরায় আবৃত্তিপূর্বক প্রকৃত বুদ্ধবাণী হিসেবে অনুমোদন করেন। ভিক্ষুগণ তা কণ্ঠস্থ করে সংরক্ষণ ও প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার বেড়ে গেলে অন্যান্য ধর্মের তীর্থিকগণ ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে সঙ্ঘে প্রবেশ করতে থাকেন। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন। ফলে সঙ্ঘে অরাজকতা সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃত বুদ্ধবাণী নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। এ-সমস্যা নিরসনের জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য থেরর সভাপতিত্বে পাটলীপুত্রের অশোকারাম বিহারে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীতি নয় মাস স্থায়ী হয় এবং এতে এক হাজার অর্হৎ ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির অনুকরণে এ-সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী পুনর্বার আবৃত্তিপূর্বক সংকলন করা হয়। এ-সঙ্গীতিতে বুদ্ধের দার্শনিক বাণীসমূহ অভিধর্ম নাম দিয়ে পৃথকভাবে সংকলন করা হয়। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন যে, ধর্মের মধ্যে অভিধর্ম অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী কেবল ধর্ম-বিনয় নামে বিভক্ত ছিল। তৃতীয় সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী তিন ভাগে বিভক্ত করে সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম হিসেবে বিন্যস্ত করে সংকলন করা হয়, যা ত্রিপিটক নামে পরিচিতি লাভ করে।

তৃতীয় সঙ্গীতির পর সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বুদ্ধবাণী ভারতের বাইরে প্রচার লাভ করে। সম্রাট অশোকপুত্র মহিন্দ্র স্থবির কতিপয় সঙ্গীসহ ত্রিপিটক কণ্ঠস্থ করে সিংহলে নিয়ে যান। সেখানে তা মুখেমুখে প্রচার করা হতো। যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ এবং নানা কারণে সিংহলে বুদ্ধশাসন পরিহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। বুদ্ধবাণী

বিকৃত ও বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য লিখিতরূপ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অতঃপর, খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলের রাজা বট্টগামিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় তালপত্রে বা ভূর্জপত্রে ত্রিপিটক লিখে রাখা হয় এবং এভাবে বুদ্ধবাণীর স্থায়ী রূপ দান করা হয়। কালক্রমে আরও স্থায়িত্বদানের জন্য ত্রিপিটক তালপত্র থেকে পাথরে খোদাই করে, কাগজে লিখে এবং টেপরেকর্ডারে ধারণ করে সংরক্ষণ করা হয়। গ্রন্থরূপ প্রদানের ক্ষেত্রে লন্ডনের পালি টেকস্ট সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়াও থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা এবং মিয়ানমারসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংগঠন বুদ্ধবাণী পুস্তক আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবে বুদ্ধবাণী নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে ত্রিপিটকের রূপ পরিগ্রহ করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধবাণী প্রথম কেন এবং কোথায় সংকলন করা হয়েছিল?

কখন বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক আকারে সংকলিত হয়েছিল?

বুদ্ধবাণী কোথায় এবং কখন লিখিতরূপ পরিগ্রহ করেছিল?

পাঠ : ২

ত্রিপিটক পরিচিতি

মহামতি বুদ্ধের মুখনিঃসৃত অমূল্য বাণীর সংকলন হলো 'ত্রিপিটক'। ত্রিপিটক শব্দটি 'ত্রি' এবং 'পিটক' শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'ত্রি' শব্দের অর্থ 'তিন' আর 'পিটক' শব্দের অর্থ হলো আধার, পেটিকা, ঝুড়ি ইত্যাদি। বুদ্ধবাণী ধরণ ও প্রকৃতি অনুসারে তিনটি ধারায় বিভক্ত করে তিনটি পেটিকা বা আধারে সংরক্ষণ করা হয় বলে তা ত্রিপিটক নামে অভিহিত। তিনটি পিটক হলো : ১ সূত্র পিটক ২ বিনয় পিটক এবং ৩ অভিধর্ম পিটক। বুদ্ধের ধর্মবাণী সূত্র আকারে গ্রথিত ভাগকে সুত্ত বা সূত্রপিটক বলে। সূত্রপিটক পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা : দীর্ঘ নিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্দক নিকায়। নিকায় শব্দের অর্থ দল, ভাগ, সম্প্রদায় ইত্যাদি। বুদ্ধভাষিত দীর্ঘ সূত্রগুলো দীর্ঘ নিকায়ে বা ভাগে সংকলিত করা হয়। তাই এটি দীর্ঘ নিকায় নামে অভিহিত। মধ্যম আকৃতির সূত্রসমূহ যে-নিকায় বা ভাগে সংকলিত করা হয়েছে তা মজ্ঝিম নিকায় নামে পরিচিত। পূর্ববর্তী দুটি নিকায়ের তুলনায় ক্ষুদ্র এবং বিভিন্ন আঙ্গিকের বিষয়বস্তু সংযুক্ত সূত্রসমূহ যে নিকায়ে সংকলিত করা হয়েছে তা সংযুক্ত নিকায় নামে কথিত। সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ধারায় বিধৃত সূত্রসমূহ যে-নিকায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা অঙ্গুত্তর নিকায় নামে খ্যাত। এ-নিকায়ে বিষয়বস্তুসমূহ এক নিপাত, দুই নিপাত, তিন নিপাত এরূপ সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ধারায় বিন্যস্ত করে সংকলিত করা হয়। 'খুদ্দক' শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র বা ছোট। বুদ্ধভাষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রসমূহ যে-নিকায়ে সংকলিত তা খুদ্দক নিকায় নামে পরিচিত। খুদ্দক নিকায়ে ষোলটি গ্রন্থ আছে। যথা : খুদ্দক পাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থের-গাথা, থেরী-গাথা, জাতক, মহানিদ্দেস, চূল্লনিদ্দেস, পটিসম্ভিদামগ্গ, অপদান, বুদ্ধবংস এবং চরিয়া পিটক।

'বিনয়' শব্দের অর্থ হলো নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা বা বিধিবিধান। বুদ্ধ-নির্দেশিত বিধিবিধান যে-পিটকে সংকলিত আছে তা বিনয় পিটক নামে অভিহিত। ভিক্ষুসঙ্ঘ সুশৃঙ্খল, ন্যায়-নিষ্ঠা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সুষ্ঠুভাবে

পরিচালিত হওয়ার মানসে বুদ্ধ এসব বিনয় বা বিধিবিধান নির্দেশ করেছিলেন। বিনয় পিটক প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. সুত্তবিভঙ্গ ২. খন্ধক এবং ৩. পরিবার। সুত্তবিভঙ্গ আবার দুভাগে বিভক্ত : মহাবিভঙ্গ এবং খুদ্দক বিভঙ্গ। মহাবিভঙ্গে পারাজিকা এবং সংঘাদিসেস্সহ ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় বিধিবিধানসমূহ রয়েছে বলে এটি পারাজিকাকন্ড বা ভিক্খুবিভঙ্গও বলা হয়। খুদ্দকবিভঙ্গে ভিক্ষুণীদের প্রতিপালনীয় বিধিবিধানসমূহ রয়েছে। এটিকে পাচিত্তিয়া বা ভিক্খুণীবিভঙ্গও বলা হয়। সুত্তবিভঙ্গের দুটি গ্রন্থে বর্ণিত বিধি-বিধানসমূহকে একত্রে পাতিমোক্খ (পাতিমোক্ষ) বলা হয়। খন্ধক দুভাগে বিভক্ত। যথা : মহাবগ্গ এবং চূল্লবগ্গ। মহাবগ্গ গ্রন্থে বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ থেকে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বুদ্ধের জীবনকাহিনীর ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। চূল্লবগ্গ গ্রন্থে ভিক্ষুসঙ্ঘের বিভিন্ন নিয়মকানুনসহ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরে অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির বর্ণনা পাওয়া যায়।

বুদ্ধের দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণই অভিধর্ম। বৌদ্ধ দর্শনই অভিধর্ম পিটকের মূল আলোচ্য বিষয়। অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। যথা : ১ ধম্মসঙ্গণী ২ বিভঙ্গ ৩ ধাতুকথা ৪ পুগ্গলপঞ্ঞত্তি ৫ কথাবত্থু ৬ যমক এবং ৭ পট্ঠান।

নিম্নে ত্রিপিটকের বিভাজন ছকে প্রদর্শন করা হলো :

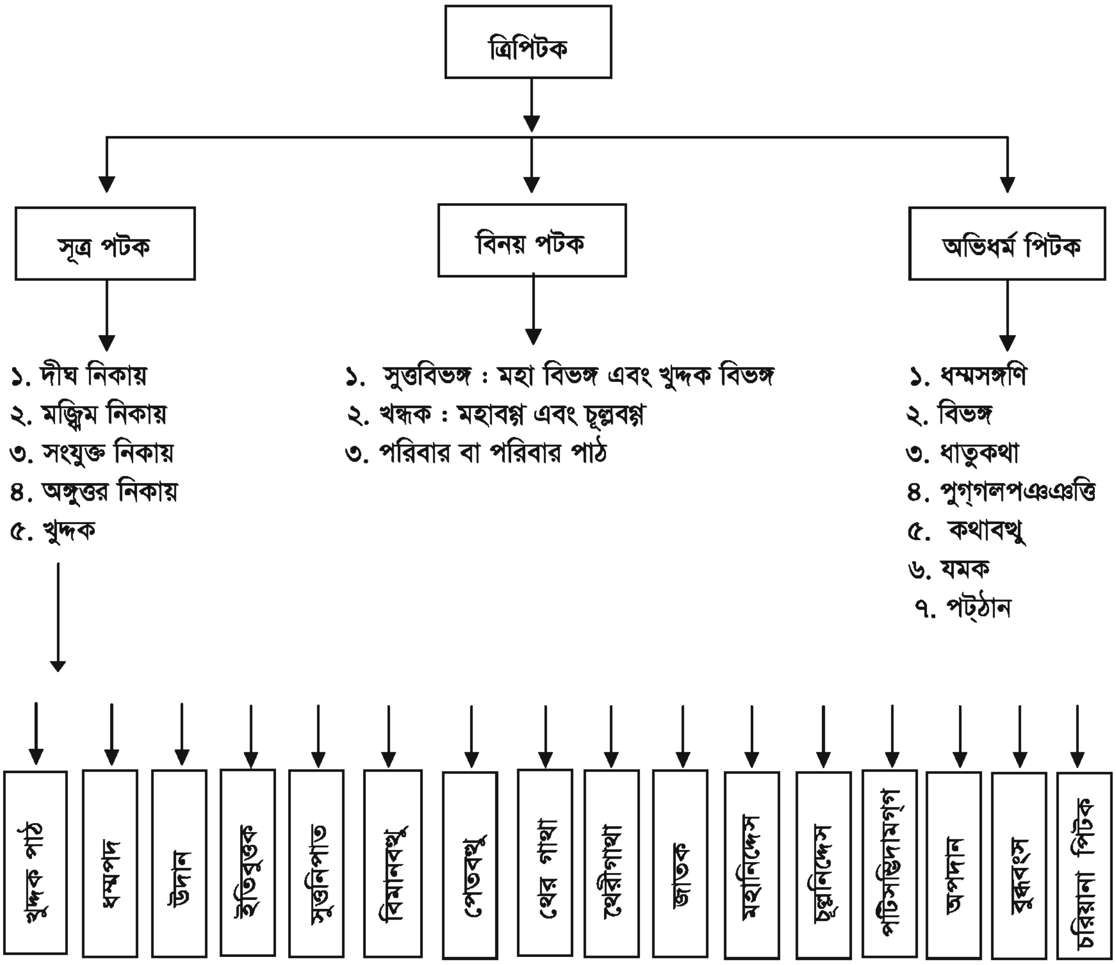

অনুশীলনমূলক কাজ

সূত্রপিটক কয়ভাগে বিভক্ত? খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থগুলোর নাম লেখ।

সুত্তবিভঙ্গ কয়ভাগে বিভক্ত এবং কী কী?

অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থগুলোর নাম বল।

পাঠ : ৩

সূত্র পিটক

সূত্র পিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা : দীঘ নিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্দক নিকায়। নিম্নে নিকায়সমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো :

ক. দীঘ নিকায় : দীঘ নিকায় সূত্র পিটকের প্রথম ভাগ। দীঘ নিকায়ে সর্বমোট চৌত্রিশটি সূত্র আছে। সূত্রগুলো তিনটি বর্গে বিভক্ত। যথা : শীল স্কন্ধবর্গ, মহাবর্গ এবং পাটিকবর্গ। প্রথম বর্গে তেরোটি সূত্র আছে। সূত্রগুলো গদ্যে রচিত। দ্বিতীয় বর্গে দশটি সূত্র, তৃতীয় বর্গে এগারোটি সূত্র আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গের বহু সূত্র গদ্যে ও পদ্যে রচিত। দান, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, ধ্যান, বিমোক্ষ, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, চিত্ত, চৈতসিক ও নির্বাণ ইত্যাদি দীঘ নিকায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এ নিকায়ে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদশের ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায়। বিশেষত বাষট্টি প্রকার ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদ এবং জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে দীঘ নিকায়ে যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তা বুদ্ধের সমসাময়িককালের প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করে। এ-ছাড়া এ নিকায়ের মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বুদ্ধের জীবন চরিতের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়। দীঘ নিকায়ে ধর্ম-দর্শন অপেক্ষা নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠনে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

খ. মজ্ঝিম নিকায় : এটি সূত্র পিটকের দ্বিতীয় ভাগ। মজ্ঝিম নিকায় পঞ্চ নিকায়ের মধ্যে সর্বোত্তম। যে-সূত্রগুলো মধ্যম আকৃতির সেগুলো মজ্ঝিম নিকায়ে স্থান পেয়েছে। এতে একশত বায়ান্নটি সূত্র আছে। সূত্রগুলো তিনটি বর্গে বিভক্ত। যথা : মূল পঞ্ঞাসক বর্গ, মজ্ঝিম পঞ্ঞাসক বর্গ এবং সেল পঞ্ঞাসক বর্গ। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গে পঞ্চাশটি, তৃতীয় বর্গে বায়ান্নটি সূত্র আছে। এ নিকায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো : চারি আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি, পার্থিব ভোগসুখের অসারতা, পরমার্থ সত্য, নির্বাণ ইত্যাদি। এ-গ্রন্থে বুদ্ধের সমকালীন ছয়টি তীর্থিক সঙ্ঘের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তা ছাড়া ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা, ভিক্ষুসঙ্ঘের সাথে গৃহী ও রাজন্যবর্গের সম্পর্ক, বুদ্ধকালীন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণও পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অপরিহার্য আচরণীয় বিষয়সমূহ এ-গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ও সরলভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে মজ্ঝিম নিকায়কে সর্বোত্তম বলে গণ্য করা হয়। বিখ্যাত আচার্য বুদ্ধঘোষ ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মজ্ঝিম নিকায়কে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২০২৩

গ. সংযুক্ত নিকায় : সংযুক্ত নিকায়ে ছাপ্পান্নটি সংযুক্ত বা অধ্যায় আছে। এগুলো পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। সগাথা বর্গে এগারোটি, নিদান বর্গে বারোটি, খন্ধ বর্গে তেরোটি, সলায়তন বর্গে দশটি এবং মহাবর্গে বারোটি অধ্যায় আছে। পাঁচটি বর্গে মোট সূত্রসংখ্যা ২৮৮৯টি। সূত্রগুলো নৈতিক. মনস্তত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয় সর্ম্পকীয় সূত্রের সমবায়ে রচিত। দীঘ ও মজ্ঝিম নিকায়ের তুলনায় সংযুক্ত নিকায়ের সূত্রগুলো ছোট হলেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়বস্তু তিনটি ধারায় বিভাজন করে উপস্থাপন করা হয়েছে : ১. ধর্ম-দর্শন ২. দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি সম্পর্কীয় ঘটনা এবং ৩. ধর্মীয় ব্যক্তি। প্রথম বর্গে শীল, আচার-অনুষ্ঠান, আদর্শ জীবনযাপন ও চরিত্র গঠনের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বর্গ ধর্ম, দর্শন ও বিবিধ আলোচনায় সমৃদ্ধ। এ-নিকায়ে কিছু ছোট ছোট কবিতা বা গাথা আছে যার সাহিত্যিক ও দার্শনিক মূল্য অপরিসীম। কথোপকথনের আকারে এসব কবিতা রচিত। এছাড়া কোশলরাজ প্রসেনজিত, মহাপ্রজাপতি গৌতমী, মারকে পরাভব, বুদ্ধ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের উপদেশ, বুদ্ধ ও যক্ষের কথোপকথন, বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করা, লাভ সৎকারের বিষয়, পঞ্চস্কন্ধ, তিন প্রকার বেদনা প্রভৃতি সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বলা যায়, সংযুক্ত নিকায় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও দার্শনিক বিষয়ের বর্ণনায় খুবই সমৃদ্ধ।

ঘ. অঙ্গুত্তর নিকায় : অঙ্গুত্তর নিকায়ে মোট ২৩০৮টি সূত্র রয়েছে। সূত্রগুলো গদ্যে ও পদ্যে রচিত এবং এগারোটি নিপাত বা অধ্যায়ে বিভক্ত। আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা অনুসারে নিপাতসমূহের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন : এক নিপাতে একটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তদ্রূপ দুই নিপাতে দুইটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেকটি নিপাত আবার কতিপয় বর্গে বিভক্ত। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় রকমের সূত্র রয়েছে। এ নিকায়ে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। অন্যান্য নিকায়ের মতো অঙ্গুত্তর নিকায়ে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা, বীর্য ও বিনয়-সম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়াও এখানে চঞ্চল চিত্তকে সংযত করা, পাপ পরিত্যাগ, তিন প্রকার লোকের কথা, ইন্দ্রিয়দমন, মিতাহার, ও অপ্রমত্ততা– তিনটি বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা, দেবদত্তের পরিণাম, নারী-পুরষের চরিত্র, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকার দায়িত্ব-কর্তব্য ও আচার-আচরণ, উপোসথ এবং উপোসথের উপযোগিতা, সুখ-দুঃখ, শ্রোতাপত্তি মার্গ ও ফল, সকৃদাগামী মার্গ ও ফল, অনাগামী মার্গ ও ফল এবং অর্হত্ব মার্গ ও ফল ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান বিবরণ এখানে পাওয়া যায়।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধান পদ্ধতি, ভৌগোলিক, সামাজিক, ধর্মীয় অবস্থারও নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়। এ ছাড়া, সে-সময়কার রাজা-মহারাজা, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা প্রভৃতি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তাই অঙ্গুত্তর নিকায়ের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

ঙ. খুদ্দক নিকায় : খুদ্দক নিকায় সূত্র পিটকের সর্বশেষ ভাগ। এ-নিকায়ের বিষয়বস্তু ষোল ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ খুদ্দক নিকায় ষোলটি গ্রন্থের সমন্বয়ে গঠিত। একেকটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু একেক রকম। গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা নেই। খুদ্দক নিকায়ে বৈচিত্র্যময় বিষয়ের সমাহার লক্ষ করা যায়। তাই খুদ্দক নিকায়কে প্রকীর্ণক সংগ্রহও বলা হয়। আকারে ছোট হলেও গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অপরিসীম। নবদীক্ষিত ভিক্ষু-শ্রমণরা অন্যান্য গ্রন্থ শিক্ষা করার পূর্বে খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থগুলো শিক্ষা করেন। খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থগুলো হলো : ১. খুদ্দক পাঠ ২. ধম্মপদ ৩. উদান ৪. ইতিবুত্তক ৫. সুত্তনিপাত ৬. বিমান বত্থু ৭. পেতবত্থু ৮. থের গাথা ৯. থেরী গাথা ১০. জাতক ১১. মহানিদ্দেস ১২. চূল্লনিদ্দেস ১৩. পটিসম্ভিদামগ্গ ১৪. অপদান ১৫. বুদ্ধবংস এবং ১৬. চরিয়ানাপিটক।

অনুশীলনীমূলক কাজ
ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো ছকে প্রদর্শন কর
অঙ্গুত্তর নিকায়ে বিষয়বস্তু কীভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে?
খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর তালিকা তৈরি কর

পাঠ : ৪

বিনয় পিটক

বিনয়কে বুদ্ধশাসনের আয়ু বলা হয়। কারণ বিনয় ব্যতীত বুদ্ধশাসনের স্থিতি অকল্পনীয় । বিনয়ের স্থিতিতেই বুদ্ধশাসনের স্থিতি নির্ভরশীল। বলা হয়ে থাকে যে, সূত্র ও অভিধর্ম লুপ্ত হয়ে গেলেও যদি বিনয় পিটক পরম আদরে, গভীর শ্রদ্ধায় ও গৌরবের সাথে অনুশীলিত হয় তবে বুদ্ধের ধর্ম কখনো লুপ্ত হবে না। তাই বিনয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পরে অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীতিতে সর্বপ্রথম বিনয় সংগ্রহ করা হয়েছিল।

বিনয়ের অপর নাম 'নিয়ম', 'নীতি' বা 'শৃঙ্খলা' ইত্যাদি। বিনয়কে সহজ অর্থে 'শীল' বলা হয়। পৃথিবীর সবকিছুই নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত হয়। গ্রহ, তারা, নক্ষত্র সবই একটি নিয়মের মধ্য দিয়েই আবর্তিত। পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য, রংধনুর সমারোহ, সূর্যরশ্মি পর্যন্ত কার্যকারণ নিয়মে আবদ্ধ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলার উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি। অসংযম, আলস্যপরায়ণ, প্রমোদপরায়ণ, অনৈতিকতা, অমিতব্যয়িতা, লোভ, দ্বেষ, মোহ, দুঃশীলতা সকল প্রকার উন্নতির পরিপন্থী। অপরদিকে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সংযম, চরিত্রবল, শীল, সমাধি, উদ্যম, উৎসাহ, প্রচেষ্টা, নিয়মানুবর্তিতা, আত্মত্যাগ, শ্রদ্ধা, সন্তুষ্টি, প্রজ্ঞা, সৎকর্ম সকল প্রকার উন্নতির মূল চাবিকাঠি। বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘের উন্নতির জন্যই বিনয়ের শিক্ষাপদসমূহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন। বিনয়ের নিয়মগুলো দৈনন্দিন জীবনযাপন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য। তাই বুদ্ধ বলেছেন :

সতবস্‌সোপি পব্বজ্জা সিক্‌খন্তো পিটকত্তযং
ওবাদং নানুবত্তন্তে নিরযং সো উপ্পজ্জতি।

অর্থাৎ "যদি কোনো ভিক্ষু শতবর্ষব্যাপী ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেও সম্যকরূপে শীল পালন না করেন, তবে মৃত্যুর পর তাঁকে নরকে যেতে হয়।"

তিনি আরও বলেছেন :

তস্‌সপাসাধিকং হোতি পত্তচীবরং ধারণং
পব্বজ্জা সফলা তস্‌স যস্‌স সীল সুনিম্মলং।

অর্থাৎ পাত্র চীবর ধারণ তারই শোভা পায়, যার শীল সুনির্মল। শীলবান ব্যক্তির জীবন সবচেয়ে বেশি সুখকর হয়।

উল্লিখিত গাথাগুলোর মর্মার্থ অনুধাবন করে জ্ঞানীমাত্রই বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং বিনয়ী আচরণ করা উচিত। বিনয় সকল প্রকার কুশলকর্মের ভিত্তিস্বরূপ। বিনয় ভিক্ষু-শ্রমণদের অবশ্য পালনীয় বিধিবিধান হলেও এতে উন্নত পারিবারিক জীবনযাপনের সুন্দর দিক নির্দেশনা রয়েছে। বিনয়ের অনুশীলনে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি জাগ্রত হয়। তাই বিনয়ের পঠনপাঠন একান্ত প্রয়োজন।

বিনয় পিটক প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত। যথা :

ক. সুত্ত বিভঙ্গ : এটি ভিক্খুবিভঙ্গ এবং ভিক্খুণী বিভঙ্গ নামে দু'ভাগে বিভক্ত।

খ. খন্ধক : এটি মহাবগ্‌গ এবং চূল্লবগ্‌গ নামে দুভাগে বিভক্ত এবং

গ. পরিবার বা পরিবার পাঠ

ক. সুত্ত বিভঙ্গ

বিনয় পিটকের প্রথম গ্রন্থ হলো সুত্ত বিভঙ্গ। সুত্ত শব্দের অর্থ হলো সূত্র, আর 'বিভঙ্গ' শব্দের অর্থ ভেঙে ফেলা অর্থাৎ ভেঙে বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ভাবার্থ ব্যাখ্যা করা। অতএব 'সুত্ত বিভঙ্গ' শব্দের অর্থ হলো 'সূত্র ব্যাখ্যা' অর্থাৎ বিনয়ের নিয়ম-নীতি বা মূল শিক্ষাপদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। পাতিমোক্‌খে ২২৭টি শীলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সুত্ত বিভঙ্গে পাওয়া যায়। এ নিয়মগুলো কোথায় কীভাবে বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল? শীল ভঙ্গকারী কে? শীল কর্তৃক বিশুদ্ধি সম্পর্কীয় অপরাধসমূহ কীভাবে নির্ধারণ করতে হয়? কী প্রকারে শাস্তি প্রদান করলে আপত্তিপ্রাপ্ত ভিক্ষু শীলবিপত্তি হতে নিষ্কৃতিলাভ করতে পারে? এসব বিষয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই সুত্ত বিভঙ্গের মূল উপজীব্য বিষয়। সুত্ত বিভঙ্গের নীতিসমূহের গুরুত্ব অনুসারে আটভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : পারাজিকা. সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিসগ্গীয়া, পাচিত্তিয়া, পটিদেসনিয়া, সেখিয়া এবং অধিকরণ সমথ।

এই নীতিগুলো ভিক্খু বিভঙ্গ এবং ভিক্খুণী বিভঙ্গ -এ দুটি গ্রন্থে সংকলিত। কোন্ নীতি লঙ্ঘনে কী অপরাধ এবং কী তার প্রতিকার তার ব্যাখ্যা গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায়। তাই সুত্ত বিভঙ্গকে আইন বা নীতিশাস্ত্র হিসেবেও গণ্য করা হয়।

১. **ভিক্ষু বিভঙ্গ :** বিনয় পিটকের প্রথম গ্রন্থ। এ-গ্রন্থে ভিক্ষুদের বিনয়সম্পর্কিত নিয়মগুলো লিপিবদ্ধ আছে। বুদ্ধ কোথায়, কীভাবে, কাকে উদ্দেশ করে এসব নিয়ম-নীতি নির্দেশ করেন, শীল ভঙ্গকারীর দোষ এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণিত আছে। ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় নিয়মগুলো এ-গ্রন্থে আটভাগে ভাগ করে বর্ণনা করে হয়েছে। যথা : পারাজিকা. সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিসগ্গীয়া, পাচিত্তিয়া, পটিদেসনিয়া সেখিয়া এবং অধিকরণ সমথ। এতে সর্বমোট ২২৭টি শীলের ব্যাখ্যা আছে।

২. **ভিক্ষুণী বিভঙ্গ :** ভিক্ষুণীদের প্রতিপালনীয় নিয়মগুলো এ-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ভিক্ষু বিভঙ্গের পরিপূরক হিসেবে এটি রচনা করা হয়। এ-গ্রন্থে ভিক্ষুণীদের প্রতিপালনীয় নিয়মগুলো আট ভাগে বিভক্ত করে বর্ণিত হয়েছে। যথা : পারাজিকা. সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিসগ্গীয়া, পাচিত্তিয়া, পটিদেসনিয়া সেখিয়া এবং অধিকরণ সমথ। ভিক্ষুণীদের শীলের সংখ্যা ৩১১। উল্লেখ থাকে যে, ভিক্ষুদের চেয়ে ভিক্ষুণীদের শীলের সংখ্যা ৮৪টি বেশি। সুত্ত বিভঙ্গের অন্তর্গত ভিক্খু বিভঙ্গ ও ভিক্খুণী বিভঙ্গ গ্রন্থদ্বয় পারাজিকা ও পাচিত্তিয়া নামেও পরিচিত।

খ. খন্ধক

বিনয় পিটকের দ্বিতীয় ভাগের নাম খন্ধক। এতে গৌতম বুদ্ধের সম্বোধিলাভের পরের ঘটনাগুলো বর্ণিত আছে। খন্ধকের বিশেষত্ব হচ্ছে যে এতে বিনয়ের বিধিবিধানসমূহকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, ভ্রমণ, নির্মাণ ও উন্নয়ন এরূপ বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যে খন্ধক সমৃদ্ধ। খন্ধক মহাবগ্‌গ এবং চূল্লবগ্‌গ এ-দুভাগে বিভক্ত।

১. মহাবগ্‌গ

মহাবগ্‌গ গ্রন্থটি দশটি অধ্যায় বা স্কন্ধে বিভক্ত। যথা : ১. মহাখন্ধ স্কন্ধ ২. উপোসথ স্কন্ধ ৩. বৈসুপনায়িক স্কন্ধ ৪. প্রবারণা স্কন্ধ ৫. চর্ম স্কন্ধ ৬. ভৈষজ স্কন্ধ ৭. কঠিন স্কন্ধ ৮. চীবর স্কন্ধ ৯. চম্পেয় স্কন্ধ এবং ১০. কৌশাম্বিক স্কন্ধ। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের আকার বৃহৎ বলেই গ্রন্থটি মহাবগ্‌গ নামে অভিহিত। এ-গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের সম্বোধিলাভের পরের ঘটনাগুলো বর্ণিত আছে। বিশেষত বুদ্ধত্বলাভ হতে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বুদ্ধের জীবনের নানা কাহিনী মহাবগ্‌গে আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধের ধারাবাহিক জীবনী রচনার জন্য গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। বুদ্ধত্বলাভের পর থেকে শুরু করে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বুদ্ধ যেসব বিনয়বিধান চালু করেছিলেন তার ধারাবাহিক ইতিহাস এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে বুদ্ধের সমসাময়িক কালের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ রয়েছে। বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের ইতিহাস, বৌদ্ধসঙ্ঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ধর্মচক্র প্রবর্তন, পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের দীক্ষা, বুদ্ধের সাথে সাক্ষাতের জন্য ধনাঢ্য যশের পরিভ্রমণ, রাজা বিম্বিসারের সাথে বুদ্ধের সাক্ষাৎসহ গুরুত্বপূর্ণ বহু ঐতিহাসিক তথ্যে গ্রন্থটি ভরপুর। এ ছাড়াও শিক্ষাদান পদ্ধতি, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক, আদর্শ জীবনগঠনের সঠিক দিক নির্দেশনাও রয়েছে ।

২. চূল্লবগ্‌গ

চূল্লবগ্‌গে বারোটি অধ্যায় বা স্কন্ধ আছে। যথা : ১. কর্ম স্কন্ধ ২. পারিবাসিক স্কন্ধ ৩. সমুচ্চয় স্কন্ধ ৪. শমথ স্কন্ধ ৫. ক্ষুদ্রবস্তু স্কন্ধ ৬. শয়ন আসন স্কন্ধ ৭. সংঘভেদক স্কন্ধ ৮. ব্রত স্কন্ধ ৯. প্রাতিমোক্ষ স্কন্ধ ১০. ভিক্ষুণী স্কন্ধ ১১. পঞ্চশতিকা স্কন্ধ এবং ১২. সপ্তশতিকা স্কন্ধ। 'চূল্ল' শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র। নামকরণ হতে সহজেই বোঝা যায় গ্রন্থের স্কন্ধগুলো ক্ষুদ্র। অধ্যায় বা স্কন্ধগুলোর আয়তন মহাবগ্‌গের তুলনায় ক্ষুদ্র বলে গ্রন্থটিকে চূল্লবগ্‌গ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রথম থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত বুদ্ধ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কী উদ্দেশ্যে কোন বিধিবিধান প্রবর্তন করেছিলেন তার বর্ণনা রয়েছে। একাদশ অধ্যায়ে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির বিবরণ বর্ণনা করা হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় সঙ্গীতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়। নারী জাতির সঙ্ঘে প্রবেশ, মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ অন্যান্যদের দীক্ষাদান, ভিক্ষুণীদের নিয়ম-কানুন, বুদ্ধ কী কী শর্তে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন প্রভৃতি সম্পর্কেও চূল্লবগ্‌গে বর্ণনা পাওয়া যায়।

গ. পরিবার বা পরিবার পাঠ

বিনয় পিটকের এটি শেষ গ্রন্থ। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আচরণ সর্ম্পকিত বিষয়াবলি গ্রন্থটিতে বর্ণিত আছে। বিশেষত, বিনয়ের জটিল এবং দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ-গ্রন্থে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষার্থী ভিক্ষুদের জন্য বিনয় শিক্ষার উপকরণ হিসেবে গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। ছোট-বড় সব মিলে এতে সর্বমোট একুশটি অধ্যায় আছে। এগুলো গদ্যে ও পদ্যে রচিত। প্রত্যেক অধ্যায়ই বিনয়-সর্ম্পকিত শিক্ষাপদসমূহের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। তাই গ্রন্থটিকে বিনয় পিটকের সারবস্তু বলা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিনয়কে কেন বুদ্ধশাসনের আয়ু বলা হয়?

সুত্ত বিভঙ্গকে কেন আইন বা নীতিশাস্ত্র হিসেবেও গণ্য করা হয়?

পরিবার গ্রন্থটিকে কেন বিনয় পিটকের সারমর্ম বলা হয়?

পাঠ : ৫

অভিধর্ম পিটক

ত্রিপিটকের তৃতীয় বা শেষ ভাগ হলো অভিধর্ম পিটক। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের সমৃদ্ধ আলোচনায় গ্রন্থটি পূর্ণ। সূত্র পিটকে যেসব দার্শনিক ও নৈতিক বিষয়সমূহ অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন সেসব বিষয় অভিধর্ম পিটকে সূক্ষ্ম ও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধদর্শন ও পরমার্থ সত্য। যথা : স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, চ্যুতি, প্রতিসন্ধি, বল, নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি ইত্যাদি। অভিধর্ম পিটকে বৌদ্ধ মননশীলতার চরম বিকাশ ঘটে। অভিধর্ম বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ব্যতীত কেউ উত্তম ধর্ম দেশনা করতে পারে না। এতে কাল্পনিক কোনো বিষয়ের অবতারণা নেই। কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের সাহায্যে মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করাই এর প্রধান বিশেষত্ব। বুদ্ধের মনস্ততাত্ত্বিক উপদেশ অভিধর্মের মূল বিষয়বস্তু। বিশেষত চিত্ত, চৈতসিক, রূপ এবং নির্বাণ প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অভিধর্ম পিটকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই অভিধর্মকে উচ্চতর ধর্মও বলা হয়।

অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. ধম্মসঙ্গণি ২. বিভঙ্গ ৩. ধাতুকথা ৪. পুগ্গলপঞ্ঞত্তি ৫. কথাবত্থু ৬. যমক এবং ৭. পট্ঠান।

১. ধম্মসঙ্গণি : অভিধর্ম পিটকের প্রথম গ্রন্থ হলো ধম্মসঙ্গণি। 'ধম্মসঙ্গণি'-এর অর্থ ধর্মের সংগণনা বা ধর্মের শ্রেণিবিভাগ অথবা ধর্মের ব্যাখ্যা। ধর্ম অর্থাৎ লৌকিক ও লোকোত্তর বিষয়সমূহ শ্রেণিবিভাগ করে ব্যাখ্যা করায় গ্রন্থটির এরূপ নামকরণ করা হয়। ধম্মসঙ্গণিকে অভিধর্ম পিটকের মূলস্তম্ভ বলা হয়। এতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের ছোট-বড় যাবতীয় ব্যাপারসমূহকে চিত্ত, চৈতসিক ও জড় পদার্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। নাম-রূপকে কার্যকারণনীতি অনুসারে কুশল-অকুশল এবং অব্যাকৃত ধর্ম হিসেবে

২০২৪

শ্রেনিবিন্যাস করে এ-গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। ধম্মসঙ্গণির আলোচ্য বিষয়সমূহকে চার ভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যায়। এগুলো হলো যথাক্রমে–

ক. চিত্ত ও চৈতসিকের পরিচয়
খ. রূপ বা জড় পদার্থের পরিচয়
গ. পূর্বে উল্লিখিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ বা নিক্খেপ
ঘ. অত্থুদার বা অব্যাকৃত ধর্ম

চিত্ত চৈতসিকে কামাবচার, রূপাবচর, অরূপাবচর এবং লোকোত্তর – এই চার প্রকার চিত্ত পঞ্চস্কন্ধ, জীবিতেন্দ্রিয় প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রূপ পরিচয় বিভাগে কামলোক তথা নরক, মনুষ্য ও দেবলোক প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিক্খপ শব্দের অর্থ হচ্ছে সারমর্ম বা সারসংগ্রহ। এ-বিভাগে চিত্ত ও চৈতসিক সম্পর্কে পূর্ববর্তী বিভাগে যেসব আলোচনা আছে তার সারমর্ম রয়েছে। অত্থুদার শব্দের অর্থ হলো বিশ্লেষণ। অর্থ উদ্ধার বা সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বিশ্লেষণ হলো অত্থুদার। এ-বিভাগে কুশল-অকুশল বিষয়ের কারণ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া অব্যাকৃত বিষয় সম্পর্কেও বর্ণনা পাওয়া যায়।

২. বিভঙ্গ : অভিধর্ম পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'বিভঙ্গ'। বিভঙ্গ শব্দের অর্থ বিশদ ব্যাখ্যা। এতে ধর্মসঙ্গণি বিষয়সমূহের উচ্চতর বা বিশদ ব্যাখ্যা লক্ষ করা যায়। গ্রন্থটিতে আঠারোটি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলোতে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন, অষ্টাদশ ধাতু, চার আর্যসত্য, দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়, প্রতীত্যসমুৎপাদ, চার স্মৃতি প্রস্থান, চার সম্যক প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, ধ্যান, চার অপ্রমেয়, শিক্ষাপদ, চারি প্রতিসম্ভিদা, জ্ঞান-বিভঙ্গ, ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গ (চিত্তের অকুশল অবস্থার দীর্ঘ তালিকা) প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

৩. ধাতুকথা : অভিধর্ম পিটকের তৃতীয় গ্রন্থ। ধাতুকথা শব্দের অর্থ 'ধাতু' সম্পর্কিত আলোচনা। চিত্ত ও চৈতসিকের আলোচনায় পূর্ণ গ্রন্থটি। এ-গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো : পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান), দ্বাদশ আয়তন (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, মন এবং ধর্ম), আঠারো প্রকার ধাতু (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মন, মনোবিজ্ঞান, ধর্ম), চার প্রকার ধ্যান (প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যান), পঞ্চবল (শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা), অষ্টাঙ্গিক মার্গ (সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি) প্রভৃতি।

৪. পুগ্গলপঞ্ঞত্তি : 'পুগ্গল' শব্দের অর্থ পুরুষ, সত্ত্ব বা আত্মা। 'পঞ্ঞত্তি' অর্থ প্রজ্ঞপ্তি, ধারণা, পরিচয় অথবা যথার্থ বলে নির্দেশ করা ইত্যাদি বোঝায়। সুতরাং 'পুগ্গলপঞ্ঞত্তি' শব্দের অর্থ যে-পুস্তক পুগ্গল বা ব্যক্তিবিশেষের পরিচয় প্রদান করে। গ্রন্থটি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। দশটি অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার পুগ্গল বা ব্যক্তির বর্ণনা আছে। পুগ্গল বা ব্যক্তিবিশেষের স্বরূপ ও বিকাশ দেখানোর জন্য পুগ্গলকে নানাভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : সম্যক সম্বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, আর্যপুগ্গল ও তাদের শ্রেণিবিন্যাস, স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামি, অনাগামি, শৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য এবং পৃথকজন লোভচরিত, দ্বেষচরিত এবং মোহচরিত ইত্যাদি। গ্রন্থটিতে প্রথমে ছয়টি প্রজ্ঞপ্তি কী কী উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর, একবিধ পুগ্গল, দ্বিবিধ পুগ্গল, ত্রিবিধ

পুগ্গল, চতুর্বিধ পুগ্গল, পঞ্চবিধ পুগ্গল, ষড়বিধ পুগ্গল, সপ্তবিধ পুগ্গল, অষ্টবিধ পুগ্গল, নববিধ পুগ্গল এবং দশবিধ পুগ্গল-এর ব্যাখ্যা রয়েছে। গ্রন্থটির ভাষাশৈলী ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা অভিধর্ম পিটকের অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ভিন্ন।

৫. কথাবত্থু : অভিধর্ম পিটকের মধ্যে অন্যতম মূল্যবান গ্রন্থ হলো 'কথাবত্থু'। ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর মধ্যে একমাত্র কথাবত্থু গ্রন্থের সংকলকের নাম পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অবসানে মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য স্থবির গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তেইশটি অধ্যায় আছে। গ্রন্থটির প্রত্যেক অধ্যায়ে আট থেকে বারোটি করে প্রশ্নোত্তর মালা রয়েছে। এই প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা তথা সে-সময়ের মানুষের মন ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহামতি সম্রাট অশোকের সময় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সঙ্গীতির সময় মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য স্থবির গ্রন্থটি সংকলন করেন। এটাকে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন-সম্পর্কিত তর্কশাস্ত্র বলা হয়। এ-গ্রন্থে বিভিন্ন জটিল দার্শনিক তত্ত্বের উত্তর-প্রত্যুত্তর রয়েছে। অভিধর্মের কঠিন এবং দুর্বোধ্য দার্শনিক বিষয়গুলোকে এ-গ্রন্থে যুক্তি তর্কে সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বুদ্ধবাণী উদ্ধৃতির মাধ্যমে অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্ব খণ্ডন করা হয়েছে এবং বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের নির্যাস প্রতিফলিত হওয়ায় গ্রন্থটি ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৬. যমক বা যমক প্রকরণ : যুগল বা জোড়া বা যুগ্ম অর্থে 'যমক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'যমক' বলতে একই বিষয়ে দুটি প্রশ্নের অবতারণা করাকে বোঝায়। এই প্রশ্ন দুটিতে কারণ থেকে কারণ নির্ণয় করা বা কারণ থেকে কারণের সত্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটি দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় হলো : মূল-যমক, স্কন্ধ যমক, আয়তন যমক, ধাতু যমক, সত্য যমক, সংস্কার যমক, অনুশয় যমক, চিত্ত যমক, ধর্ম যমক, ইন্দ্রিয় যমক ইত্যাদি। মূল-যমকে কুশল এবং অকুশল ও তাদের মূল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্কন্ধ-যমকে পঞ্চ স্কন্ধের বর্ণনা রয়েছে। ধাতু যমকে অষ্টাদশ প্রকার ধাতুর বিস্তৃত অর্থ বর্ণিত হয়েছে। সত্য যমকে চারি আর্যসত্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। সংস্কার যমকে তিন প্রকার সংস্কারের আলোচনা দৃষ্ট হয় (কায় সংস্কার, বাক্য সংস্কার এবং মন সংস্কার)। অনুশয় যমকে বিবিধ প্রকার অনুশয়ের দার্শনিক বিচার (কাম, রাগ, সন্দেহ, মান, অবিদ্যা ইত্যাদি) পাওয়া যায়। চিত্ত যমকে চিত্ত ও চৈতসিক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ধর্ম যমকে কুশল এবং অকুশল ধর্মের তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইন্দ্রিয় যমকে বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

৭. পট্‌ঠান : অভিধর্ম পিটকের শেষ গ্রন্থ। 'পট্‌ঠান' শব্দের অর্থ হলো সম্বন্ধ, কারণ বা প্রধান কারণ, প্রকৃত কারণ, হেতু ইত্যাদি। গ্রন্থটিতে নাম-রূপের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতিও আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে চারটি বিভাগ রয়েছে। যথা : অনুলোম পট্‌ঠান, পচ্চনীয় পট্‌ঠান, অনুলোম পচ্চনীয় পট্‌ঠান এবং পচ্চনীয় অনুলোম পট্‌ঠান। চার বিভাগকে আবার চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'প্রত্যয়' শব্দের অর্থ হলো 'কারণ' 'নিদান' 'হেতু' ইত্যাদি। যার মাধ্যমে কোনো কার্য সংঘটিত হয় তা-ই প্রত্যয়। পট্‌ঠান গ্রন্থে বর্ণিত চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়সমূহ হলো : হেতু, আরম্মন, অধিপতি, অনন্তর, সমন্তর, সহজাত, অঞ্ঞমঞ্ঞ, নিস্‌সয়, উপনিস্‌সয়, পুরেজাত, পচ্ছাজাত, আসেবন, কম্ম, বিপাক,
২০২৩ আহার, ইন্দ্রিয়, ধ্যান, মগ্গ, সম্পযুত্ত, বিপ্পযুত্ত, অত্থি, নত্থি, বিগত এবং অবিগত প্রত্যয়।

অনুশীলনীমূলক কাজ

অভিধর্ম পিটকে কয়টি গ্রন্থ ও কী কী?

ধম্মসঙ্গণির মূল অলোচ্য বিষয়সমূহ কী?

কথাবত্থু গ্রন্থটিকে কেন ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হলো?

পাঠ : ৬

ত্রিপিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা

বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনই ত্রিপিটকের মূল উপজীব্য বিষয়। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এ-গ্রন্থে বুদ্ধের সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, রাজনীতি, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। তাই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য ত্রিপিটকের গুরুত্ব অপরিসীম। ত্রিপিটকের প্রতিটি বাণী মানুষকে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে উদ্বুদ্ধ করে। অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। সকল প্রকার পাপ বর্জন করে ধর্মময় জীবনযাপনে প্রেরণা যোগায়। মানুষকে দুঃখহীন নৈর্বাণিক পথে পরিচালিত করে। ত্রিপিটক পাঠে কুশল-অকুশল কর্ম, চিত্তের প্রকৃত স্বরূপ, মানুষের বৈশিষ্ট্য, মনোজগতের নানা অবস্থা, দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখমুক্তির উপায়, অনিত্য, অনাত্মা, নির্বাণ, নির্বাণলাভের উপায়, জগতের প্রকৃত স্বরূপ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। তা ছাড়া বুদ্ধজীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ত্রিপিটকে বর্ণিত আছে। ত্রিপিটকের অমৃতবাণীসমূহ রাগ-দ্বেষ-মোহ বিদূরিত করে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও ঐক্যসৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। ভারতবর্ষে জাতিভেদ ও বর্ণপ্রথার নামে যে-নিষ্ঠুরতা প্রচলিত ছিল তা দূরীভূত করতে বুদ্ধবাণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রতিটি বাণী ছোট-বড় সকল প্রাণীকে রক্ষার প্রেরণা যোগায়। সেই আদর্শকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘে জাতি, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল। এভাবে তিনি সমাজে এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সাম্যনীতির আদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধ-নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুসরণে মানুষ বিনয়ী, শীলবান এবং চরিত্রবান হয়। ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবন সুখের হয়। অতএব, বলা যায়, ত্রিপিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বুদ্ধ লিখিত আকার কোনো............. দান করেনি।

২. সিংহলের রাজা বট্টগামিনীর পৃষ্ঠপোষকতার............. ত্রিপিটক লিখে রাখা হত।

৩. সূত্র পিটক.......... প্রধান ভাগে বিভক্ত।

৪. খুদ্দক নিকায়............ সর্বশেষ ভাগ।

৫. অভিধর্ম পিটকের মধ্যে অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হলো.......... ।

২০২৫

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ত্রিপিটক-এর শব্দগত অর্থ কী?
২. সুত্ত পিটকে কয়টি গ্রন্থ ও কী কী?
৩. বিনয় পিটকের শিক্ষা কী?
৪. অভিধর্ম বলতে তুমি কী বোঝ? বল।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ত্রিপিটক রচনার পটভূমি আলোচনা কর।
২. সুত্ত পিটক সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান কর।
৩. বিনয় বলতে কী বোঝ? বিনয় পিটকে কয়টি গ্রন্থ? প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অভিধম্ম পিটকের অন্যতম প্রধান গ্রন্থের নাম কী ?

ক. বিভঙ্গ　　খ. ধম্মসঙ্গনি
খ. ধাতুকথা　　ঘ. কথাবত্থু

২। ভিক্ষুদের বিনয়চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে হবে –

i. নীতিবোধ জাগ্রত
ii. সাধনালাভ
iii. উন্নত জীবনযাপন লাভ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. i ও ii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

শ্রদ্ধেয় বোধিমিত্র ভিক্ষু নতুন উপসম্পদা লাভের পর ভিক্ষু জীবনের নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা জানার জন্য লাইব্রেরি থেকে একটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। গ্রন্থটিতে বিনয়ের জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়গুলো সহজ ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩। শ্রদ্ধেয় বোধিমিত্র ভিক্ষু বিনয়ের কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন ?

ক. সূত্তবিভঙ্গ　　খ. খন্ধক
গ. মহাবগ্গ　　ঘ. পরিবার পাঠ

৪। উক্ত গ্রন্থটিকে বিনয় পিটকের কী বলা হয় ?

ক. সারবস্তু খ. সারসংগ্রহ

গ. পরিশুদ্ধ জীবনবিধি ঘ. অন্যতম গ্রন্থ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

ছক - ১

- নিকায়ে চৌত্রিশটি সূত্র আছে
- নিকায়ে ছাপ্পান্নটি গুচ্ছ আছে
- নিকায়ে দুই হাজার আটত্রিশটি সূত্র আছে

ছক - ২

- ধাতুকথা
- কথাবত্থু
- যমক

ক. চূল্লবর্গের অপর নাম কী ?

খ. ত্রিপিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. ১ম ছকের ইঙ্গিত দ্বারা কোন পিটক নির্দেশ করছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ২য় ছকের বর্ণিত পিটকটিতে ‘বৌদ্ধ দর্শন ও পরমার্থ সত্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে’ — তুমি কি এ-বক্তব্যের সাথে একমত ? যুক্তি প্রদর্শন কর।

২। শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুসঙ্ঘ, বিহার পরিচালনা কমিটি এবং উপাসক উপাসিকাদের সমন্বয়ে ধর্মাঙ্কুর বিহার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। বুদ্ধের নির্দেশিত আদেশ-উপদেশ অনুশীলনের মাধ্যমে সকলেই শীল পালনে সচেষ্ট থাকেন। বিশেষ তিথিতে উপাসক-উপাসিকারা উপোসথ শীল পালনকালে বিহারাধ্যক্ষ বুদ্ধের উদ্ধৃতাংশ স্মরণপূর্বক বলেন, “যদি কোনো ভিক্ষু শতবর্ষব্যাপী ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেও যদি সম্যকরূপে শীল পালন না করেন, তবে মৃত্যুর পর তাঁকে নরকে যেতে হয়।”

ক. ত্রিপিটক কোন ভাষায় রচিত?

খ. ত্রিপিটকের পটভূমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উক্তিটি ত্রিপিটকের কোন পিটকে নিহিত ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত পিটক ‘বুদ্ধশাসনের আয়ুস্বরূপ’ ধর্মীয় দৃষ্টিতে মতামত দাও। ২০২১

চতুর্থ অধ্যায়

সূত্র ও নীতিগাথা

সূত্র ও নীতিগাথা হলো ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে বুদ্ধ তাঁর শিষ্য ও উপাসক-উপাসিকাদের এগুলো দেশনা করেছিলেন। এগুলো ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্তপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। সূত্র ও নীতিগাথাসমূহ বুদ্ধের শিক্ষা বা দর্শনের মর্মবাণী ধারণ করে আছে। এগুলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের পাশাপাশি ইহলৌকিক মঙ্গলও সাধন করে। এগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, বিপদ, রোগ, শোক এবং ভূত, প্রেত, যক্ষ জাতীয় অশুভ শক্তির কুপ্রভাব প্রভৃতি হতে সুরক্ষা এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করে পাঠ করা হয়। তবে একেক সূত্র একেক রকম উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়। যেমন, রতন সূত্র দুর্ভিক্ষ ও মহামারি হতে রক্ষা পেতে, করণীয় মৈত্রী সূত্র ভূত, যক্ষ প্রভৃতির উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে, সু-পুব্বণহ সূত্র অশুভ গ্রহের প্রভাব হতে রক্ষা পেতে, বোজ্ঝঙ্গ সূত্র সকল প্রকার রোগ-শোক হতে রক্ষা পেতে, অঙ্গুলিমাল সূত্র গর্ভযন্ত্রণা হতে মুক্তি পেতে পাঠ করা হয়। ত্রিপিটকে এরূপ আরও অনেক সূত্র আছে যেগুলো পাঠ করলে নানারকম বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং বহুরকম মঙ্গল সাধিত হয়। এ-অধ্যায়ে আমরা রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্র অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

* রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব ;

পাঠ : ১
রতন সূত্রের পটভূমি

বৈশালী ভারতের লিচ্ছবিদের গণরাজ্য ছিল। এটি বর্তমানে বেসার নামে পরিচিত। তথাগত বুদ্ধের সময় বৈশালী অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরী ছিল। সেখানে রাজা, যুবরাজ, শ্রেষ্ঠি, সেনাপতি, কৃষক, বণিক প্রভৃতি নানা শ্রেণি ও জাতের লোক বসবাস করত। নানাপ্রকার খাদ্য সম্ভারে বৈশালী পরিপূর্ণ ছিল। অধিবাসীগণ পরম সুখে বসবাস করছিল।

একসময় বৈশালী নগরীতে প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। মাঠ-ঘাট-ক্ষেত সব শুকিয়ে যায়। চাষবাস ও শস্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নগরীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনাহারে প্রচুর লোক মৃত্যুবরণ করল। শবদেহ নগরের বাইরে নিক্ষিপ্ত করা হলো। পচাগন্ধে অনেক অমনুষ্য-পিশাচাদি নগরে প্রবেশ করল। অমনুষ্যের উপদ্রবে আরও অনেক লোক মারা গেল। বায়ু দূষণের কারণে শুরু হয় মহামারি। এতেও প্রচুর মানুষ ও জীবজন্তুর প্রাণহানি ঘটতে লাগল।

অবশেষে বৈশালীবাসী দুর্ভিক্ষ, অমনুষ্য ও মহামারি – এ তিন উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রাজার কাছে গিয়ে নিবেদন করল, "মহারাজ ! নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হয়েছে। পূর্বের সপ্ত রাজবংশের রাজত্বকালে এরূপ দুর্দশা কখনো উৎপন্ন হয়নি।" রাজার অধার্মিকতার কারণে এই দুর্দশা সৃষ্টি হয়েছে কি না তা জানার জন্য রাজজ্যোতিষীকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। জ্যোতিষী গণনা করে দেখলেন, এতে রাজার কোনো দোষ নেই। তারপর কীভাবে দুর্দশা দূর করা যায় তা নিয়ে সকলে চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তা করে সকলে স্থির করলেন যে, একমাত্র সর্বলোকহিতানুকম্পী, মহাঋদ্ধি ও মহানুভবতাসম্পন্ন ভগবান বুদ্ধের আগমনেই এ-দুর্দশা দূর হবে। অতঃপর প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভেবে রাজা ঠিক করলেন, ভগবান বুদ্ধকে বৈশালীতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবেন। রাজা ভাবলেন, বুদ্ধ এলে বৈশালীর মানুষদের দুর্দশা কেটে যাবে, প্রাণ রক্ষা পাবে, মনোবল ফিরে পাবে এবং সমস্ত ভয় ও অমঙ্গল কেটে যাবে।

বুদ্ধ সেসময় রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন। বৈশালীর রাজা তখন ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। দুইজন লিচ্ছবি কুমার সৈন্যবাহিনী ও উপঢৌকনসহ বুদ্ধকে আনতে যাত্রা করলেন। লিচ্ছবি কুমারগণ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক জানালেন, "ভন্তে ! আমাদের নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হয়েছে। যদি করুণার আধার ভগবান করুণাবশত বৈশালীতে একবার পদার্পণ করেন, তা হলে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।" বৈশালীবাসীর প্রতি অনুকম্পাবশত ভগবান বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং বৈশালীতে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। বৈশালীবাসীসহ রাজা ও রাজঅমাত্যগণ অতি সমারোহে পূজা ও সৎকার করতে করতে ভগবান বুদ্ধকে স্বরাজ্যে নিয়ে যান। ভগবান বুদ্ধ বৈশালী পৌঁছলে দেবরাজ ইন্দ্রদেবতা পরিবেষ্টিত হয়ে ভগবানকে অভ্যর্থনা করতে আসলেন। দেবগণের আগমনে অমনুষ্যগণ পালিয়ে গেল।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে ডেকে বললেন, "আনন্দ, এই রতন সূত্র শিখে লিচ্ছবিদের নিয়ে বৈশালী নগর ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি কর। এই সূত্রের প্রভাবে বৈশালীর দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও ভয় দূর হয়ে যাবে।" বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবির রতন সূত্র আবৃত্তি শুরু করলেন এবং বুদ্ধের ব্যবহৃত পাত্রে জল নিয়ে সিঞ্চন করতে লাগলেন। সর্বার্থসাধক রতনসূত্র পাঠে রোগভয়, অমনুষ্য ভয় এবং দুর্ভিক্ষ ভয় – এই ত্রিবিধ

২০২৩

ভয় দূর হয়ে যায়। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। আবার মাঠে মাঠে শস্যের সমারোহ ঘটে। বৈশালীবাসীর জীবনে শান্তি ফিরে এল। নগরের মানুষ আনন্দে উৎফুল্ল। সবাই ভগবান বুদ্ধের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সবাই করজোড়ে বুদ্ধের সম্মুখে এসে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। এ হলো রতন সূত্রের পটভূমি। সূত্রটি সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের খুদ্দক পাঠ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৈশালী কেমন নগরী ছিল?

বৈশালীতে কয় প্রকার উপদ্রব দেখা দিয়েছিল? কী কী?

ভগবান বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবির কী করলেন?

পাঠ : ২
রতন সুত্তং (পালি)

১. যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানি বা অন্তলিক্‌খে
সব্বে ব ভূতা সুমনা ভবন্তু
অথোপি সক্কচ্চং সুণন্তু ভাসিতং।

২। তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সব্বে
মেত্তং করোথ মানুসিযা পজায
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং
তস্মাহি নে রক্‌খথ অপ্পমত্তা।

৩। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা
সগ্‌গেসু বা যং রতনং পণীতং,
ন নো সমং অত্থি তথাগতেন
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পনীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৪। খযং বিরাগং অমতং পণীতং
যদজ্‌ঝগা সক্যমুনী সমাহিতো,
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৫। যম্বুদ্ধসেট্‌ঠো পরিবণ্ণযী সুচিং
সমাধিমানন্ত রিকঞ্ঞমাহু,
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি।
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৬। যে পুগ্‌গলা অট্‌ঠসতম্পসত্থা
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি ,
তে দক্‌খিণেয্যা সুগতস্‌স সাবকা
এতেসু দিন্নানি মহপ্‌ফলানি
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৭। যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্‌হেন,
নিক্কামিনো গোতমসাসনম্‌হি
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয্‌হ
লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৮। যথিন্দখীলো পঠবিং সিতো সিযা
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিযো,
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি
যো অরিযসচ্চানি অবেচ্চ পস্‌সতি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৯। যে অরিষসচ্চানি বিভাবযন্তি
গম্ভীরপঞ্ঞেন সুদেসিতানি
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা
ন তে ভবং অট্‌ঠমং আদিযন্তি।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১০। সহা 'বস্‌স দস্‌সনসম্পদায
তযস্‌সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি,
সক্কাযদিট্‌ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ।
সীলব্বতং বাপি যদত্থি কিঞ্চি
চতুহ'পাযেহি চ বিপ্পমুত্তো
ছচাভিঠানানি অভব্বো কাতুং,
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১১। কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং
কাযেন বাচা উদ চেতসা বা,
অভব্বো সো তস্‌স পটিচ্ছাদায
অভব্বতা দিট্‌ঠপদস্‌স বুত্তা
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১২। বনপ্পগুম্বে যথা ফুস্‌সিতগ্গে
গিম্‌হানমাসে পঠমস্মিং গিম্‌হে
তথূপমং ধম্মবরং অদেসযী
নিব্বানগামিং পরমং হিতায।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৩। বরো বরঞ্ঞু বরদো বরাহরো
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসযী
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৪। খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আযতিকে ভবস্মিং,
তে খীনবীজা অবিরূল্‌হিচ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথাযং পদীপো
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৫। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানি বা অন্তলিক্‌খে
তথাগতং দেবমনুস্‌সপূজিতং
বুদ্ধং নমস্‌সাম সুবত্থি হোতু।

১৬। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানি বা অন্তলিক্‌খে
তথাগতং দেবমনুস্‌সপূজিতং
ধম্মং নমস্‌সাম সুবত্থি হোতু।

১৭। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানি বা অন্তলিক্‌খে
তথাগতং দেবমনুস্‌সপূজিতং
সঙ্ঘং নমস্‌সাম সুবত্থি হোতু।

অনুশীলনমূলক কাজ
দলগতভাবে শুদ্ধ উচ্চারণে রতন সূত্র পাঠ কর

পাঠ : ৩
রতন সূত্র (বাংলা)

১. ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যেসব প্রাণী এখানে সমবেত হয়েছ, সকলে আনন্দিত হও। তারপর আমার বাক্য শ্রবণ কর।

২. হে ভূতগণ ! সেইহেতু আমার উপদেশ তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। মানুষের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে তাদের হিত চিন্তা কর। তারা দিনরাত তোমাদের পূজা করে। এ কারণে অপ্রমত্তভাবে তাদের রক্ষা কর।

৩. ইহলোক বা পরলোকে যা কিছু বিত্ত (রত্ন) আছে, অথবা স্বর্গলোকে যা কিছু উত্তম রত্ন আছে, তাদের কোনোটিই তথাগতের সমান নয়। এ সকল রত্ন হতে বুদ্ধ রত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।

৪. ধ্যানপরায়ণ শাক্যমুনি যে লোভ, দ্বেষ ও মোহ ক্ষয়কর, বিরাগ ও উত্তম অমত (নির্বাণ) ধর্ম অবগত হয়েছেন, সেই ধর্মের সমান কিছুই নেই। সকল রত্ন হতে এ ধর্মরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।

৫. বুদ্ধশ্রেষ্ঠ যে শুচি (পবিত্র) সমাধির প্রশংসা করেছেন, যার ফল অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় তার সমান অন্য কোনো সমাধি নেই। সকল রত্ন হতে ধর্মরত্ন (বুদ্ধ-প্রশংসিত সমাধি) শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।

৬. যে আট পুগ্গল (পুরুষ) বুদ্ধাদি সাধুগণ কর্তৃক প্রশংসিত, যাঁরা মার্গ ও ফল ভেদে চার জোড়, তাঁরা সুগতের শ্রাবক এবং দক্ষিণার উপযুক্ত পাত্র। সকল রত্ন হতে এই সঙ্ঘরত্ন (ভিক্ষুসঙ্ঘ) শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।

৭. যাঁরা নিষ্কাম এবং গৌতমের শাসনে (ধর্মে) স্থিরচিত্তে নিবিষ্ট, তাঁরা অমৃতে ডুব দিয়ে বিনামূল্যে লব্ধ নির্বাণ ভোগ করছেন এবং প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত (যা লাভ করতে হয় তা লাভী) নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। সকল রত্ন হতে এই সঙ্ঘরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।

৮. ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত ইন্দ্রখীল (স্তম্ভ) চারদিকের প্রবল বায়ুতেও কাঁপে না। যিনি চতুরার্য সত্য সম্যকরূপে দর্শন করেছেন সেই সৎ পুরুষকেও আমি ইন্দ্রখীলের সঙ্গে তুলনা করি। সকল রত্ন হতে এই সঙ্ঘরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।

২০২৩

৯. গভীর প্রজ্ঞাবান (বুদ্ধ) কর্তৃক সুন্দরভাবে দেশিত চতুরার্য সত্য যাঁরা (নিজে উত্তমরূপে অবগত হয়ে) বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেন, তাঁরা অত্যন্ত প্রমত্ত হলেও আটবারের বেশি ভবে জন্মগ্রহণ করেন না। সকল রত্ন হতে এই সঙ্ঘরত্ন (যিনি চতুরার্য সম্যকভাবে জ্ঞাত ও প্রকাশ করেন) শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।

১০. স্রোতাপন্ন ব্যক্তির দর্শন সম্পদ (সম্যক দৃষ্টি) লাভের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু সৎকায় দৃষ্টি, সন্দেহ ত্রিরত্নে অশ্রদ্ধা—এই তিন ধর্ম (ভ্রান্ত ধারণা) থাকে, তা দূরীভূত হয়। তিনি চার প্রকারের অপায় (নরক) হতে বিমুক্ত এবং ছয় প্রকার মহাপাপ (মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা, বুদ্ধের রক্তপাত, বুদ্ধ ব্যতীত অন্য শরণ গ্রহণ, সঙ্ঘভেদ) করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। সকল রত্ন হতে এই সঙ্ঘরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।

১১. তিনি (স্রোতাপন্ন ব্যক্তি) কায়, বাক্য ও মনে কোনো পাপ করে গোপন করতে পারেন না। কারণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে পাপ গোপন করা সম্ভব নয়। সকল রত্ন হতে এই সঙ্ঘরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।

১২. গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথম মাসে (চৈত্র মাসে) বনের তরুলতায় ফুল ফুটলে বনভূমি যেমন মনোহর হয় তেমনি নির্বাণগামী উত্তমধর্ম পরম হিতের জন্য (তথাগত বুদ্ধ) দেশনা করেছেন। সকল রত্ন হতে এই বুদ্ধরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।

১৩. শ্রেষ্ঠ (বর), নির্বাণজ্ঞ (বরজ্ঞ), বিমুক্তি সুখদাতা (বরদ), উত্তম প্রতিপদ আহরণকারী (বরাহরো), অনুত্তর (বুদ্ধ) উত্তম বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনা করেছেন। সকল রত্ন হতে এই বুদ্ধরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।

১৪. (যাঁরা নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের) পুরাতন কর্ম ক্ষীণ, নতুন কর্ম উৎপত্তির সম্ভাবনা নেই, পুনর্জন্মে আসক্তিহীন, (পুনর্জন্মের) বীজ ক্ষীণ (নষ্ট), বৃদ্ধির ইচ্ছা নেই সেই সকল পণ্ডিত ব্যক্তি প্রদীপের মতো নির্বাণ প্রাপ্ত হন। সকল রত্ন হতে এই সঙ্ঘরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।

১৫. (তারপর দেবরাজ ইন্দ্র বললেন) ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যে সমস্ত প্রাণী এখানে সমবেত হয়েছে, এসো সকলে মিলে দেবমানব পূজিত তথাগত বুদ্ধকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের শুভ (মঙ্গল) হোক।

১৬. ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যে সমস্ত প্রাণী এখানে সমবেত হয়েছে, এসো সকলে মিলে দেবমানব পূজিত ধর্মকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের শুভ (মঙ্গল) হোক।

১৭. ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যে সমস্ত প্রাণী এখানে সমবেত হয়েছে, এসো সকলে মিলে দেবমানব পূজিত সঙ্ঘকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের শুভ (মঙ্গল) হোক।

শব্দার্থ

সমাগতানি-সমবেত; ভূম্মানি-ভূমিবাসী; অন্তলিক্খে-আকাশে; সুমনা-সুখী, সক্কচ্চং-মনোনিবেশসহকারে; নিসামেথ-শুনুন; মানুসিয়া পজায়- মানবগণের জন্য; হুরং-পরলোক; অমতং-অমৃত; পরিবণ্ণযী-বর্ণনা করা হয়েছে; সমাধিমানন্ত রিকঞ্ঞঞমাহু- যে সমাধির ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়; পসত্থা-প্রশংসা; দক্খিণেয্যা-দক্ষিণার যোগ্য; সুপ্পযুত্তা-উত্তমরূপে কাজে নিযুক্ত; দল্হন-দৃঢ়ভাবে; নিক্কামিনো-নিষ্কাম; পত্তিপত্তা-সর্বশ্রেষ্ঠ পাওনা; যথিন্দখীলো-যেরূপ ইন্দ্রখীল বা স্তম্ভ, অরিযসচ্চানি-আর্যসত্যসমূহ; ভূসপ্পমত্তা-পৃথিবীতে সপ্রমত্ত থাকা (প্রমাদবহুল); আদিযন্তি-অধিক জন্মগ্রহণ করেন না; দসস্‌নসম্পদায-অন্ত দৃষ্টি বা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ; বিচিকিচ্ছিতঞ্চ-সংশয়; বিপ্পমুত্তো-বিমুক্ত; দিট্‌ঠিপদস্‌স-সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন; বরঞ্ঞু-নির্বাণজ্ঞ; বরদো-বিমুক্তি সুখদাতা; বরাহরো-উত্তম প্রতিপদ আহরণকারী বা নির্বাণরূপ শ্রেষ্ঠ মার্গ আহরণ করেছেন যিনি।

পাঠ : ৪

করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি

একদা ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন। তখন বর্ষা সমাগত। বর্ষাবাসের জন্য ভিক্ষুরা পর্বতের গুহা বা বনের মধ্যে সুবিধামতো কোনো স্থান বসবাসের জন্য বেছে নিতেন। হিমালয় পর্বতের পাশে বনের মধ্যে সেরূপ স্থান ঠিক করে পাঁচশত ভিক্ষু বর্ষাবাস শুরু করলেন। কাছাকাছি গ্রাম থেকে তাঁরা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ ও ভোজন করে পরম সুখে কর্মস্থান ভাবনা করতেন। নির্মল জলবায়ু সেবন এবং সুখাদ্যে তাঁদের শরীর-মন বেশ ভালো হলো।

সেই বনের মধ্যে ছিল বহু বৃক্ষদেবতা। তারা ভিক্ষুদের ধর্মজীবন ও শীলতেজের প্রভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। শীলের তেজ সহ্য করতে না পেরে বৃক্ষদেবতারা গাছ ছেড়ে পরিবার পরিজন নিয়ে যত্রতত্র পালিয়ে বেড়াতে লাগল। তারা কেবল ভাবছিল, কবে ভিক্ষুরা এই স্থান ত্যাগ করবে। যত তাড়াতাড়ি ভিক্ষুরা এই স্থান ত্যাগ করবে তত তাড়াতাড়ি তাঁরা আবার তাদের নিজের আবাসে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু বৃক্ষদেবতারা দেখল, ভিক্ষুরা বর্ষাবাস শেষ না করে স্থান ত্যাগ করবে না।

একদিন ভিক্ষুদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে বৃক্ষদেবতারা এক রাতে ভয়ংকর আকৃতির মূর্তি ধারণপূর্বক ভিক্ষুদের সামনে ভীষণ চিৎকার করে ভয় দেখাতে লাগল। এতে ভিক্ষুরা খুব ভয় পেলেন। ফলে তাঁরা ধ্যান-সমাধিতে চিত্ত নিবিষ্ট করতে পারলেন না। ক্রমে তাঁরা অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়লেন। তারপর বৃক্ষদেবতাগণ ভয়ানক দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। এতে ভিক্ষুদের ভয়ানক শিরঃপীড়া উৎপন্ন হলো। একদিন তাঁরা পরস্পর আলোচনা করে বর্ষবাসব্রত ত্যাগ করে শ্রাবস্তীতে ভগবান বুদ্ধের কাছে চলে এলেন। ভিক্ষুদের দেখে বুদ্ধ তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি বর্ষাবাসের সময় ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন ভিক্ষুরা বুদ্ধের কাছে বর্ষাবাসের স্থান ছেড়ে আসার সব ঘটনা খুলে বললেন।

সব শুনে বুদ্ধ বললেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা আবার সে-স্থানে ফিরে যাও। আমি তোমাদের বৃক্ষদেবতাদের ভয় থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে দিচ্ছি। বৃক্ষদেবতা বা যক্ষদের সাথে শত্রুভাব পোষণ না করে মৈত্রীভাব পোষণ কর। তোমরা ধৈর্য ধরে তাদের প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রদর্শন কর।" এই বলে বুদ্ধ তাঁদের করণীয় মৈত্রী সূত্র দেশনা করলেন এবং বললেন, "এই সূত্র শিক্ষা করে বনে ফিরে যাও। প্রতিমাসে অষ্টধর্ম শ্রবণ দিবসে (আটটি উপোসথ দিবসে) এই সূত্র উচ্চস্বরে পাঠ করবে। এ বিষয়ে ধর্মকথা বলবে, প্রশ্নোত্তর করবে, অনুমোদন করবে। সেই অমনুষ্যগণ আর ভয় দেখাবে না। তোমাদের উপকারী ও হিতৈষী হবে।"

বুদ্ধের উপদেশমতো ভিক্ষুরা সেই স্থানে ফিরে গিয়ে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ ও মৈত্রী-ভাবনায় রত হলেন। করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠের প্রভাবে বৃক্ষদেবতাদের উপদ্রব বন্ধ হলো। মৈত্রী ও করুণার প্রভাবে বৃক্ষদেবতারা আর ভিক্ষুদের কোনো উৎপাত করল না, অধিকন্তু অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তাঁদের সেবায় রত হলো। অবশেষে ভিক্ষুরা সেখানে বর্ষাবাস শেষ করতে সক্ষম হন। এই সূত্রে নির্বাণ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের করণীয় মৈত্রী ভাবনার নির্দেশনা আছে, তাই সূত্রটির নাম 'করণীয় মৈত্রী সূত্র'। পালিতে এই সূত্রের নাম 'করণীয় মেত্তসুত্তং'।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৃক্ষ দেবতারা কেন আতঙ্কিত হয়েছিলেন?

ভিক্ষুরা কেন বর্ষাবাসব্রত ত্যাগ করেছিলেন?

ভিক্ষুদের কথা শুনে বুদ্ধ কী বলেছিলেন?

পাঠ : ৫

করণীয় মেত্তসুত্তং (পালি)

১. করণীযমত্থকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজু চ সুজু চ সুবচো চস্‌স মুদু অনতিমানী।

২. সন্তুস্‌সকো চ সুভরো চ অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো

৩. ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্‌ঞূ পরে উপবদেয্যুং,
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা

৪. যে কেচি পানাভূতত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্ঝিমা রস্‌সকাণুকা থূলা।

৫. দিট্‌ঠা বা যেবা অদিট্‌ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

৬. ন পরো পরং নিকুব্বেথ নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচি নং কঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞ নাঞ্ঞমঞ্ঞস্‌স দুক্‌খমিচ্ছেয্য।

৭. মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।

৮. মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবযে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরং অসপত্তং।

৯. তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা সযনো বা যবতস্‌স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

১০. দিট্‌ঠিঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্‌সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয্য গেধং নহি জাতু গব্‌ভসেয্যং পুনরেতীতি।।

অনুশীলনমূলক কাজ
দলগতভাবে শুদ্ধ উচ্চারণে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ কর

পাঠ : ৬
করণীয় মৈত্রী সূত্র (বাংলা)

১. শান্তিময় নির্বাণপদ লাভে অভিলাষী, করণীয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ব্যক্তি – সক্ষম, সরল বা ঋজু, খুব সরল, সুবাধ্য, কোমলস্বভাব ও অভিমানহীন হবেন।

২. (তিনি সর্বদা যথালাভে) সন্তুষ্ট, সুখপোষ্য, অল্পে তুষ্ট, শান্তেদ্রিয়, অভিজ্ঞ, অপ্রগল্‌ভ বা বিনীত এবং গৃহীদের প্রতি অনাসক্ত হবেন।

৩. এমন কোনো ক্ষুদ্র (নীচ) আচরণ করবেন না যাতে অন্য বিজ্ঞগণ নিন্দা করতে পারেন। সকল প্রাণী সুখী হোক, ভয়হীন বা নিরাপদ হোক, শান্তি ও সুখ উপভোগ করুক–এরূপ চিন্তা করতে হবে।

৪. যেসব প্রাণী অস্থির বা স্থির, দীর্ঘ বা বড়, মধ্যম বা হ্রস্ব, ছোট বা স্থূল।

৫. দেখা যায় বা দেখা যায় না, দূরে বা কাছে বাস করে, জন্মেছে বা জন্ম নেবে সেই সকল প্রাণীগণ সুখী হোক।

৬. একে অপরকে বঞ্চনা করো না, কোথাও কাউকেও অবজ্ঞা করো না। হিংসা বা ক্রোধবশত কারো দুঃখ কামনা করো না।

৭. মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে।

৮. সর্বলোকের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে। ঊর্ধ্ব, নিম্নে ও বক্রভাবে (যত প্রাণী আছে তাদের প্রতি) ভেদজ্ঞান-রহিত, বৈরীহীন ও শত্রুতাহীন হবে।

৯. দাঁড়ানো অবস্থায়, চলমান অবস্থায়, বসা বা শোয়া অবস্থায় এবং না ঘুমানো পর্যন্ত এই স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে। একে ব্রহ্মবিহার বলে।

১০. শীলবান ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন স্রোতাপন্ন ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগপূর্বক কাম ও ভোগবাসনাকে দমন করে পুনর্বার গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করেন না।

শব্দার্থ : সন্তং-শান্ত; সক্কো-সক্ষম বা সমর্থ; অভিসমোচ্চ-সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে; উজু-ঋজু বা সরল; সুজুচ -সুঋজু বা অতি সরল; সন্তুস্সকো-সন্তুষ্ট ব্যক্তি; সুভরো-সুখপোষ্য বা সহজে প্রতিপালন বা সাহায্য করা যায়; অপ্পকিচ্চো-অল্পকৃত্য বা অল্প কর্তব্যযুক্ত; সল্লহু কবুত্তি-যে ব্যক্তি সহজে অভাব বোধ করে না এবং অভাববোধ করলে তা সহজে পূর্ণ করে নিতে পারে, অল্পে তুষ্ট ; সন্তিন্দ্রিয়ো-শান্তেন্দ্রিয়; নিপকো-প্রজ্ঞাবান; অপ্পগব্ভো-অপ্রগল্ভ, বিনীত, অহংকারহীন, বিবেকবান, লজ্জাশীল, শিষ্ট; অননুগিদ্ধো-অনাসক্ত; উপবদেয্যুং-নিন্দা করা; খেমিনো-যিনি নিরাপত্তা বা শান্তি উপভোগ করেন; পাণভুতত্থি-জগতের প্রাণিকুল; থাবরা-স্থির, অনবসেসা-সম্পূর্ণরূপে; তিরিযঞ্চ-বক্রভাবে, অসরলভাবে; অসম্বাধং-ভেদজ্ঞানরহিত; অবেং-বৈরহীন, অসপত্তং-শত্রুতাহীন; তিট্ঠ-দাঁড়ানো; বিগতমিদ্ধো-না ঘুমানো পর্যন্ত; অধিট্ঠেয্য-অধিষ্ঠান; নিকুব্বেথ-বঞ্চনা; মানসং ভাবসে-মৈত্রী পোষণ করবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

করণীয় মৈত্রী সূত্রের বাংলা অনুবাদ লেখ (দলগত কাজ)

পাঠ : ৬
রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের গুরুত্ব

মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে রতন সূত্রের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। রতন সূত্রে বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সঙ্ঘ রত্নের গুণকীর্তন করা হয়েছে। এই তিনটি রত্নকে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়। ত্রিরত্নের শরণ নিলে সবরকম অকুশল কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা যায়। চিত্তের সংযম রক্ষা করা যায়। রতন সূত্রে চতুরার্য সত্যের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে সেই শক্তির কথা বলা হয়েছে। চতুরার্য সত্যকে যিনি জানতে পারেন তিনি সংসাররূপ মহাসাগরের সমস্ত কামনা, বাসনা, লোভ, দ্বেষ, মোহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। কামনা-বাসনা বা তৃষ্ণাহীন ব্যক্তি ইন্দ্রখীল বা প্রোথিত স্তম্ভের সাথে তুলনীয়। ইন্দ্রখীল যেমন প্রবল বায়ুর চাপেও কখনো কম্পিত হয় না, তেমনি চতুরার্য সত্য সম্যকভাবে জ্ঞাত ব্যক্তি লোভ-তৃষ্ণায় কম্পিত বা আসক্ত হন না। তিনি লক্ষ্যে অবিচল থাকেন। তাই বলা যায়, রতন সূত্র সকল প্রকার অমঙ্গল ও অকুশল কর্ম থেকে বিরত রেখে কুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহী করে, স্বধর্মের পথে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। স্বধর্মের পথে পরিচালিত ব্যক্তি সর্ব দুঃখের অবসান করে নির্বাণ লাভে সক্ষম হন।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা হলো, প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা। কোনো জীবকে অবহেলা না করা। কারো অমঙ্গল কামনা না করা। ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করা উচিত।

কারণ-মৈত্রী ভাবনা চিত্তকে সমাহিত করে। কায়-মন-বাক্য সংযত করে। বৈরিতা বা শত্রুতা দূর করে। ভালোবাসা জাগ্রত করে। নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হতে শিক্ষা দেয়। অস্থির বা স্থির, দীর্ঘ বা বড়, মধ্যম বা হ্রস্ব, ছোট বা স্থূল; দৃশ্য-অদৃশ্য, কাছের-দূরের, জন্মগ্রহণ করেছে বা করবে-এরূপ সকল প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে এবং সর্বদা মঙ্গলকামনা করতে উদ্বুদ্ধ করে । বঞ্চনা ও অবজ্ঞা করা থেকে বিরত রাখে। হিংসা পরিত্যাগ ও ক্রোধ দমন করতে সাহায্য করে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথার্থরূপে অনুসরণে প্রেরণা যোগায়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি কায়-মন-বাক্যে কোনো পাপ করেন না। ফলে তাঁর দ্বারা কোনো অকুশল কর্ম সম্পাদনও সম্ভব হয় না। ফলে তিনি নিজে এবং তাঁর সঙ্গে বসবাসকারীগণ নিরুপদ্রব বা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন। এভাবে মৈত্রীভাবনাকারী তৃষ্ণা নিরোধ করে পুনর্জন্ম রোধ করেন এবং নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। অতএব বলা যায়, স্বধর্মের পালনে বুদ্ধদেশিত রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

রতন সূত্রের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উপস্থাপন কর (দলীয় কাজ)

করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা কী?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান কর

১. একসময় বৈশালী নগরীতে প্রচণ্ড---------- দেখা দেয়।

২. এতেন সচ্চেন---------- হোতু।

৩. সেই বনের মধ্যে ছিল বহু ---------।

৪. ---- যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরকখে

৫. মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে.................. সূত্রের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৈশালীতে অনাবৃষ্টির সময় ভগবান বুদ্ধ কোথায় অবস্থান করছিলেন ?

২. ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর সীমানায় পা রাখার সাথে সাথে কী ঘটলো ?

৩. বৃক্ষদেবতারা কেন পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে গেল ?

৪. করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা কী ?

৫. ভিক্ষুরা কীভাবে তাঁদের বর্ষাবাস শেষ করল?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি ব্যাখ্যা কর।

২. করণীয় মৈত্রী সূত্রের বাংলা অনুবাদ লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন সূত্র পাঠের মাধ্যমে অশুভ গ্রহের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ?

ক. ভোজ্ঝাঙ্গ সূত্র খ. সু-পূব্বণ্হ সূত্র
গ. অঙ্গুলিমাল সূত্র ঘ. করণীয় মৈত্রী সূত্র

২। ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করা উচিত, কারণ এতে –

i কায়-মন-বাক্য সংযত হয়
ii শত্রুতা দূর হয়
iii বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

শ্রদ্ধেয় ধর্মশ্রী ভিক্ষু একাগ্র চিত্তে নিবিষ্ট হয়ে চতুরার্য সত্য সম্যকরূপে দর্শন করেছেন। এই সম্যক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৎকায়দৃষ্টি, সন্দেহ, ত্রিরত্নের প্রতি অশ্রদ্ধা এই তিন ধরনের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়।

৩। শ্রদ্ধেয় ধর্মশ্রী ভিক্ষুকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায় ?

ক. স্তম্ভ খ. ধর্মরত্ন
গ. সংঘরত্ন ঘ. সমাধি

৪। উক্ত ভিক্ষুর তিন ধরনের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হওয়ার ফলে, তিনি —

i চার প্রকার নরক হতে মুক্তি পাবেন
ii মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ হত্যা করা থেকে বিরত হবেন
iii বার বার জন্মগ্রহণ করবেন।

২০২৫

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

বর্তিকা নগরীর সমস্যা

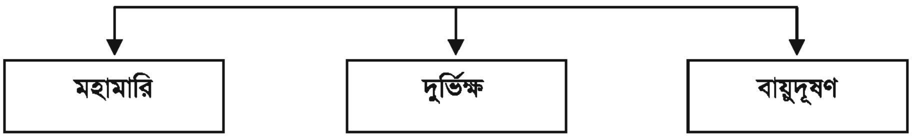

ক. করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা কী ?

খ. ভিক্ষুরা কেন বর্ষাবাস ত্যাগ করেছিলেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. ছকে বর্ণিত সমস্যাবলির সঙ্গে বুদ্ধের কোন সূত্রের ইঙ্গিত রয়েছে — ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বর্তিকা নগরীর সমস্যা সমাধানে উক্ত সূত্রের প্রভাব ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। পারমিতা বড়ুয়া দশম শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী। সে তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। হঠাৎ সে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করার পর তাদের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের অশুভ আভাস পরিলক্ষিত হয়।

ক. বৈশালী বর্তমানে কী নামে পরিচিত ?

খ. সূত্র পাঠ করার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।

গ. উল্লিখিত ঘটনার বিষয় কোন সূত্রের ইঙ্গিত বহন করে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উক্ত সূত্র পাঠ ব্যতিরেকে পরিস্থিতি নিরসন সম্ভব নয়"—আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বৌদ্ধ কর্মবাদ

কর্ম বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা হয় কর্মের শক্তি বিশ্বব্যাপী। বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিই হলো 'কর্মবাদ'। মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুসারে কর্মফল ভোগ করে। ভালো কাজ করলে ভালো ফল এবং মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল তাকে ভোগ করতে হবেই। শুধু মানুষ নয়, জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কর্মের জন্য তার উৎপত্তি, কর্মের মাধ্যমে তার স্বীকৃতি, কর্মই তার বন্ধু, কর্মই তার আশ্রয়। কর্মের দ্বারা উন্নত জীবন যেমন লাভ হয় তেমনি কর্মের দ্বারা হীন জীবনও লাভ হয়। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

* কর্ম-এর ধারণা বলতে পারব;
* বৌদ্ধধর্ম মতে 'কর্মবাদ' কী ব্যাখ্যা করতে পারব;
* কুশল এবং অকুশল কর্মের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারব;
* চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের আলোকে বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে পারব।

পাঠ : ১
কর্ম শব্দের ধারণা

'কর্ম' বলতে কোনো অনুষ্ঠান করা, নির্মাণ করা বা সম্পাদন করা ইত্যাদি বোঝায়। বৌদ্ধধর্মে কর্মকে শুভ-অশুভ, কুশল-অকুশল ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে কর্ম বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ যা চিন্তা করা যায়, বাক্যে উচ্চারণ করা যায় এবং দেহের দ্বারা সম্পাদন করা যায় তাই কর্ম। কায়-বাক্য ও মন এই ত্রিদ্বারে কর্ম সংঘটিত হয়। চিন্তন, কথন, এবং করণ (দৈহিক) সমস্তই কর্মের অধীন। মনের চেতনাহীন ক্রিয়াকে কর্ম বলা হয় না। 'অঙ্গুত্তর নিকায়' নামক গ্রন্থে বুদ্ধ বলেছেন–

"চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি। চেতযিত্বা কম্মং করোতি কায়েন, বাচায মনসা'পি"।

বাংলা অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ! চেতনাকেই (ইচ্ছাকে) আমি কর্ম বলি। কারণ চেতনার দ্বারা ব্যক্তি কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে।

কর্মের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মন বা চিত্ত। চেতনা মনের সহজাত প্রবৃত্তি বিশেষ। চিত্ত থেকে উৎপন্ন উপলব্ধিই চেতনা। একটি ক্ষণের একটি চেতনা সুখ-দুঃখ প্রদান করতে সক্ষম। কায় কর্ম ও বাক্য কর্ম সমস্তই মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বৌদ্ধধর্ম মতে, নিজ নিজ কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হবে। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে। গাছের ফলের মতো কর্মফল মানুষের কর্মকে অনুসরণ করে। কর্ম যদি ভালো বা মন্দ হয় তবে ফলও ভালো বা মন্দ হবে।

কর্মের শ্রেণি বিভাগ

করণীয় অনুসারে কর্ম চার প্রকার। যেমন : ক. জনক কর্ম, খ. উপস্তম্ভক কর্ম, গ. উৎপীড়ক বা উপপীড়ক কর্ম, এবং ঘ. উপঘাতক কর্ম।

২০২৫

ক. জনক কর্ম : যে কর্ম পুনর্জন্ম ঘটায়, জীবিতকালে যে কর্ম স্কন্ধ ও কর্মজরূপ উৎপাদক এবং কুশল-অকুশল চেতনামূলক তাই জনক কর্ম। জনক কর্ম অতীত কর্মেরই ফল।

খ. উপস্তম্ভক কর্ম : যে কর্ম জনক কর্মকে সাহায্য করে তাই উপস্তম্ভক কর্ম। উপস্তম্ভক কর্ম জনক কর্মকে ফল প্রদানে সাহায্য করে। জনক কর্মের প্রভাবে জন্ম হয় আর বেঁচে থাকা হয় উপস্তম্ভক কর্মের প্রভাবে।

গ. উৎপীড়ক বা উপপীড়ক কর্ম : এই জাতীয় কর্ম জনক কর্ম বা উপস্তম্ভক কমের্র বিপাককে দুর্বল করে কিংবা বাধা দেয়। কুশল উৎপীড়ক কর্ম অকুশল উপস্তম্ভক কর্মকে, অকুশল উৎপীড়ক কর্ম কুশল উপস্তম্ভক কর্মকে বাধা দেয় এবং দুর্বল করে।

ঘ. উপঘাতক কর্ম : এ ধরনের কর্মের কাজ হলো বাঁধা দেওয়া। এ রকম কর্ম শুধু বাধা দেয় না জনক কর্মকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। ফল উৎপন্ন করাই হলো এর কাজ।

অনুশীলনমূলক কাজ

অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধ কী বলেছিলেন?

করণীয় অনুসারে কর্ম কয় প্রকার ও কী কী বল।

পাঠ : ২

কর্মবাদের ধারণা

'কর্ম' ও 'বাদ'-দুটি অর্থবোধক শব্দের সমন্বয়ে 'কর্মবাদ' শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'কর্ম' বলতে কায়, বাক্য ও মনে সম্পাদিত কাজ বা ক্রিয়াকে বোঝায়। 'বাদ' বলতে তত্ত্ব বা ধারণার বিশ্বাসকে বোঝায়। সুতরাং কর্মবাদ বলতে কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে বোঝানো হয়।

আয়ু-বর্ণে, ভোগ-ঐশ্বর্যে এবং জ্ঞান-গরিমায় মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তার অন্যতম কারণ কর্ম। জীব মাত্রই নিজ নিজ কর্মের অধীন। কর্মই প্রাণীগণকে হীন-উত্তম বা উঁচু-নিচু বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করে। পৃথিবীতে সকল মানুষের আচার-আচরণ যেমন এক রকম নয় তেমনি আবার স্বভাব-চরিত্র একই রকম নয়। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে ভিক্ষু নাগসেন ও গ্রিক রাজ মিলিন্দের কথোপকথনে নাগসেন স্থবির বলেছিলেন - 'সকল মানুষ এক রকম না হওয়ার কারণ হলো তাদের কৃতকর্ম। বিভিন্ন মানুষের কর্মফলে পার্থক্য আছে বলেই মানুষের মধ্যে নানারকম পার্থক্য লক্ষ করা যায়'। তিনি আরো বলেন - 'সকল বৃক্ষের ফল সমান হয় না। কিছু টক, কিছু লবণাক্ত, কিছু মধুর রসযুক্ত। এগুলো বীজের নানাত্ব কারণেই হয়'। এভাবে কর্মের নানাত্ব হেতু সকল মানুষ সমান হয় না। কারণ প্রাণী মাত্রই কর্মের অধীন। এ রকম ভিন্নতার অন্যতম কারণ হলো কর্ম।

কর্মই প্রাণীকে নানাভাবে বিভাজন করে। জীবের সুখ এবং দুঃখের দাতা কেউ নয়। এগুলো কর্মেরই প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধ সুত্তনিপাত নামক গ্রন্থে বলেন -

ন জচ্চা ব্রাহ্মণো হোতি, ন জচ্চা হোতি অব্রাহ্মণো
কম্মুনা ব্রাহ্মণো হোতি কম্মুনা হোতি অব্রাহ্মণো।

২০২৩

বাংলা অনুবাদ : জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, জন্ম দ্বারা কেউ অব্রাহ্মণ হয় না, কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এবং কর্ম দ্বারা অব্রাহ্মণ হয়।

কস্সকো কম্মুনা হোতি, সিপ্পিকো হোতি কম্মুনা
বাণিজো কম্মুনা হোতি, পেস্সিকো হোতি কম্মুনা।

বাংলা অনুবাদ : কর্ম দ্বারা কেউ চাষী হয়, কর্ম দ্বারা কেউ কারিগর হয়, কর্ম দ্বারাই মানুষ ব্যবসায়ী হয় এবং কর্ম দ্বারা চাকর হয়।

কম্মুনা বত্ততি লোকো, কম্মুনা বত্ততি পজা
কম্ম নিবন্ধন সত্তা, রথস্সানীব যাযতো।

বাংলা অনুবাদ : কর্মের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী সচল। কর্মের মাধ্যমে মানব জন্মের সৃষ্টি। চাকার উপর নির্ভর করে রথ যেমন চলে তেমনি সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্মের উপর নির্ভরশীল।

মানুষের জীবন কর্মবিধানের দ্বারা শৃঙ্খলিত। অতীত কর্মের দ্বারা বর্তমান জীবন নির্ধারিত হয়েছে। আবার বর্তমান কর্মের দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হচ্ছে। অর্থাৎ অতীতের উপর যেমন বর্তমান জীবন নির্ভর করে, আবার বর্তমানের উপরও ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে।

জাতকে দীর্ঘায়ু কুমারের একটি কাহিনী আছে। বারানসিরাজ দীর্ঘায়ু কুমারের মা-বাবাকে হত্যা করেছিলেন। অনেক দিন পর দীর্ঘায়ু কুমার একবার সুযোগ পেয়েছিলেন রাজাকে হত্যা করার। তিনি রাজাকে নিজের পরিচয় দিয়ে সৎকর্মের প্রভাবে রাজাকে হত্যা না করে বললেন, মহারাজ ! আমি আপনার অনিষ্ট করবো না। বরং আপনি আমাকে আমার মা-বাবার মতো হত্যা করুন। তা না হলে আপনার শত্রু পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে। রাজাও তখন দীর্ঘায়ু কুমারকে বললেন, আমিও আপনার অনিষ্ট করবো না। এ ভাবে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, মন্দ কর্ম জন্মলাভের সুযোগ থাকলেও কুশল চিন্তার জন্য তা ঘটলো না। এতে দুজনের উপর শুভ অদৃষ্টফলের প্রভাব পড়েছিল।

অনুশীলনমূলক কাজ
নাগসেন স্থবির গ্রিকরাজ মিলিন্দকে কর্ম সম্পর্কে কী বলেছিলেন? বল
সুত্তনিপাতে বর্ণিত কর্মের ধারণা দাও।

পাঠ : ৩
কর্মফলের ব্যাখ্যা

কর্মবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন কর্মফল ভোগ করবে। কর্ম যদি ভালো-মন্দ হয় তবে ফলও ভালো-মন্দ হবে। আপনি যেমন বীজ রোপণ করবেন, তেমন ফসল পাবেন। কেউ যদি ধানের বীজ রোপণ করে তবে সে ধান পাবে, গম পাবে না। আর যদি কেউ খারাপ ধানের বীজ বপন করে তবে খারাপ ধান পাবে, ভালো ধান পাবে না।

২০২১

পৃথিবীর সর্বত্রই একই নিয়ম প্রযোজ্য। আমি তোমাকে মুক্ত করবো এ কথা বুদ্ধ কোথাও বলেননি। বর্তমান মুর্হূতের কর্ম পরবর্তী মুর্হূতে ফল প্রদান করে। এটাই পৃথিবীতে প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষ নিজ নিজ ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। সুত্ত পিটকের অন্তর্গত 'ধর্মপদ' নামক গ্রন্থে দেখা যায় –

'অত্তাহি অত্তনাথো কোহি নাথো পরোসিযা'।
অত্তনাহি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং

অর্থাৎ নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা বা প্রভু, অন্যকোনো ত্রাণকর্তা বা প্রভু নেই। নিজেকে সুসংযত করতে পারলেই যে কোনো দুর্লভ বিষয় লাভ সম্ভব।

আত্মনির্ভরশীল না হলে কারো পক্ষে কোনোপ্রকার কাজে সফলতা আসে না। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠাই হলো সর্ববিধ মহৎ কাজের ভিত্তিস্বরূপ। মানুষ তার ভালো-মন্দ কর্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করে। কর্ম ফল দেয়, ফল কারণ নির্দেশ করে। বীজ ফল প্রদান করে এবং ফল বীজের বর্ণনা করে। এখানে বীজ এবং ফল উভয়েরই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সেরূপ কর্ম ও কর্মফল পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ফল পূর্ব থেকে কর্মের মধ্যে অঙ্কুররূপে বিদ্যমান থাকে। 'সঙ্গীতি সূত্রে' কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে বিশেষ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন :

ক. অকুশল বা দুঃখদায়ী পাপকর্ম : এগুলো হচ্ছে লোভ-দ্বেষ-মোহাচ্ছন্ন চিত্তে সম্পাদিত কর্ম। এরূপ কর্মের ফল সম্পর্কে ধর্মপদ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে –

দিসো দিসং যং তং কযিরা বেরি বা পন বেরিনং
মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিযো নং ততো করে।

বাংলা অনুবাদ : একজন শত্রু আর একজন শত্রুর যতটুকু ক্ষতি করতে পারে না তার চেয়ে অধিক ক্ষতি করতে পারে নিজের বিপথগামী চিত্ত। ধর্মপদ গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে–

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভযত্থ সোচতি
সো সোচতি নো বিঞ্ঞতি দিস্বা কম্মকিলিট্ঠমত্তনো

বাংলা অুনবাদ : পাপকারী ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অনুশোচনা করে। সে নিজের পাপকর্ম ও তার ফল দেখে গভীরভাবে অনুশোচনা করতে থাকে।

খ. কুশল বা সুখদায়ী পুণ্যকর্ম : শীল পালন, দানানুশীলন, পরোপকারসাধন প্রভৃতি সৎকর্ম কুশল বা সুখদায়ী। পুণ্যকর্ম সুখময় ফলদায়ক। এরূপ কর্মের ফল সম্পর্কে ধর্মপদে বলা হয়েছে–

নং তং মাতা-পিতা কযিরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা
সম্মা পণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে।

বাংলা অনুবাদ : মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যে উপকার করতে পারে না, সুপথে পরিচালিত চিত্ত তার চেয়ে অধিক উপকার করে।

গ. কুশলাকুশল ফলদায়ী পাপ-পুণ্যকর্ম : কুশলাকুশল বিমিশ্রিত চিত্তে সম্পাদিত কর্ম পাপ পুণ্যময় হয় এবং তার ফল সুখ দুঃখময় হয়। এ রকম কর্মের একটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো – কোনো এক ব্যক্তি চুরি, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি হীন উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। কোনো ব্যক্তি তার কাছ থেকে অর্থ চাইলে সে মুক্ত হস্তে দান করে। দুঃখীর দুঃখ মোচনে সে সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ফল লাভের ক্ষেত্রে সে তার বদান্যতা, উদারতা ও পরের উপকার করার ফলস্বরূপ পরবর্তী জন্মে বিত্তশালী হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। তবে চুরি, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অপকর্মের জন্য মিথ্যা অপবাদের ভাগী হতে পারে। বিপুল অর্থ থাকা সত্ত্বেও ভোগে বঞ্চিত হতে পারে। দৈহিক ও মানসিক নানাকষ্টের মধ্য দিয়ে তার জীবনের অবসান হয়।

ঘ. সব রকম কর্মক্ষয়কর কর্ম যার দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব : মানুষ যখন লোভ-দ্বেষ-মোহে আকৃষ্ট হয়, তখন তার মধ্যে নানারকম কামনা-বাসনা উৎপন্ন হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনকে সংযত করার মাধ্যমে এগুলোকে দমন করা সম্ভব। তাঁর জন্য দরকার একাগ্র সাধনা, যার মধ্য দিয়ে পরম মুক্তি লাভ সম্ভব। বুদ্ধ সংযুক্ত নিকায়ের 'সমিদ্ধি সুত্তে' বলেছেন, 'কায়-বাক্য- মনে কোনোরকম পাপকর্ম করা উচিত নয়। কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে স্মৃতিমান হয়ে অনর্থক দুঃখ সেবন থেকে বিরত থাকা উচিত'।

সুকর্ম ও সুকর্মের ফল ব্যক্তিকে পুণ্যময় কর্মানুষ্ঠানের দিকে নিয়ে যায়। অঙ্গুলিমাল ছিলেন নরঘাতক দস্যু। তিনি ৯৯৯ জনকে নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু সেই অঙ্গুলিমালই তাঁর অন্তিম জন্মে অতীতের সমস্ত পাপকর্ম হতে মুক্ত হয়ে অর্হৎ হয়েছিলেন। আলবক যক্ষ বুদ্ধের দ্বারা দমিত হয়ে প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর কর্ম প্রচেষ্টায় স্রোতাপত্তি ফল লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গণিকা আম্রপালি বুদ্ধ নির্দেশিত এবং প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে অর্হত্ব ফল লাভ করেছিলেন। রাজ্য বিস্তারের মোহে সম্রাট অশোক চণ্ডাশোক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। সেই চণ্ডাশোক পরবর্তীকালে ধর্মাশোক হিসেবে খ্যাতি লাভ করে বহু জনহিতকর কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। পিতৃহত্যাকারী রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধের নিকটে এসে ধর্মানুরাগ ও ভক্তির জন্য আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন। কিন্তু পিতৃহত্যাজনিত পাপকর্মের ফলে মৃত্যুর পর নরক যন্ত্রণা ভোগ করেন। ব্রাহ্মণ পুত্র হয়েও ব্রাহ্মণোচিত আচরণের অধিকারী অনেকেই হতে পারে না। অন্যদিকে শূদ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করে দৈহিক সুশ্রীতার জন্য অনেক সুনাম-সুখ্যাতির অধিকারী হওয়া যায়। যিনি বৌদ্ধ কর্মফলে বিশ্বাসী তিনি কোনো জঘন্যতম অপরাধীকেও ঘৃণা করে না। কারণ তিনি জানেন ঐ ব্যক্তি সুযোগ পেলে মহামহীয়ান হতে পারেন। আবার তার সুকর্মের দ্বারা তিনি ইহজীবনেই নিজের কর্মফল ভোগ করতে পারেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

পাঠ : ৪

কুশল ও অকুশল কর্ম

'কুশল' শব্দের সমার্থক শব্দগুলো হলো যথাক্রমে – নিপুণ, শুভ, পুণ্যধর্ম, সৎ, ধার্মিক দোষশূন্য, নির্দোষ, প্রশংসনীয়, গুণসম্পন্ন, কল্যাণ, মঙ্গল ইত্যাদি। লোভ, দ্বেষ, এবং মোহহীন চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কুশল কর্ম বলা হয়। এ ধরনের কাজে কোনোরকম পাপের স্পর্শ থাকে না। দান, শীল ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি কুশলকর্ম। কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হলে কুশল চিত্তের দরকার। এভাবে ভালো কাজ করলে ভালো ফল লাভ করা সম্ভব। বৌদ্ধধর্মে কুশলকর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুশলকর্মের ফল কুশল হয়। পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ক্ষেমা হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন দাসী। একদিন তিনি ভিক্ষু সুজাতকে তিনটি সুমিষ্ট পিঠা দান করেছিলেন। এই কুশল কর্মের ফলে ক্ষেমা সুকৃতি অর্জনপূর্বক বিপর্শী বুদ্ধের সময় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ককুসন্ধ বুদ্ধের সময়ে তিনি ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করে সুন্দর এক মনোরম উদ্যান বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন। কোনাগমন বুদ্ধের সময়েও তিনি একই রকম দানানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তিনি নৃপতি কিকির জ্যেষ্ঠা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে সঙ্ঘকে বাসস্থান নির্মাণ করে দেন। অবশেষে গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি রাজা বিম্বিসারের পত্নী হন।

এ প্রসঙ্গে কুশলকর্মের আরো একটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো :

বোধিসত্ত্ব একবার গরিব ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি পরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন কাজের সন্ধানে তিনি বের হয়ে রাজগৃহের ধনী শ্রেষ্ঠীর পরিবারে কাজ নেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে লাগলেন। একদিন সারাদিন ক্ষেতে পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখলেন সকলেই সেদিন পূর্ণিমার উপবাসব্রত পালন করছে। অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল পালন করেছে। তিনি শ্রেষ্ঠীকে বললেন প্রভু! আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি জানতাম না আজ উপোসথ দিন। তাই সকালে উপোসথ পালন করতে পারিনি। এখন আমি উপোসথ গ্রহণ করতে চাই। শ্রেষ্ঠীর কথা মতো তিনি সারারাত উপবাস থেকে শীলানুস্মৃতি ভাবনা করেন। দুর্ভাগ্যবশত সারাদিনের পরিশ্রম এবং সারারাত অনাহারে উপোসথ পালন করায় পরদিন তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে কুশল চিন্তা-চেতনায় মগ্ন ছিলেন। সেই কুশল কর্ম ও চেতনার প্রভাবে মৃত্যুর পর রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এটা কুশলকর্মের ফল।

অকুশল' শব্দের অর্থগুলো হলো-পাপ, দোষ, ত্রুটি, অপুণ্য, অসৎকার্য, অপরাধ, অশুভ কার্য, অনিপুণ, অমঙ্গল কর্ম, অহিতকর, অন্যায়, অনুপযুক্ত, নীতিবিরূদ্ধ, অযথার্থ, নিকৃষ্ট ইত্যাদি। অকুশল কর্মের মধ্যে লোভ, দ্বেষ এবং মোহ বিরাজমান রয়েছে। অকুশলজনিত কাজের ফল সব সময় অকুশল হয়। অকুশল কর্মের ফলে সমাজে মানুষ অপমানিত হয়। মান-সম্মানের হানি হয়। সর্বোপরি সর্বত্র তার নিন্দা প্রচারিত হয়। অকুশল কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়। মৌদ্‌গল্যায়নকে শেষ বয়সে শারীরিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন অর্হৎ। তিনি পূর্বজন্মে পরম মমতাময়ী মাকে কষ্ট দিয়েছিলেন। সেই কষ্টের ফল হিসেবে তাঁকে অর্হৎ হওয়া সত্ত্বেও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, অকুশল কর্মের ফল জন্মান্তরেও ভোগ করতে হয়।

দেবদত্ত একবার বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। এ সময় তিনি পাহাড় থেকে পাথর ছুঁড়ে দিয়ে বুদ্ধকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এ সময় বুদ্ধের মতো মহাজ্ঞানীর শরীর থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। এই অকুশল কর্মের ফলে দেবদত্তকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

মধ্যম নিকায়ের 'মহাবচ্ছ' সূত্রে উল্লেখ রয়েছে– এক সময় বুদ্ধ বচ্ছগোত্র পরিব্রাজককে কুশল এবং অকুশল কর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন; 'লোভ অকুশল আর অলোভ কুশল। দ্বেষ অকুশল, অদ্বেষ কুশল। মোহ অকুশল, অমোহ কুশল'। তিনি আরো বলেন; হিংসা অকুশল, হিংসা হতে বিরতি কুশল। চুরি অকুশল, চুরি হতে বিরতি কুশল। কামাচার অকুশল, কামাচার হতে বিরতি কুশল। মিথ্যাকথা বলা অকুশল, মিথ্যাকথা বলা হতে বিরতি কুশল। বিদ্বেষ পরায়ণ বাক্য অকুশল, বিদ্বেষ পরায়ণ বাক্য হতে বিরতি কুশল। কর্কশ বাক্য অকুশল, কর্কশবাক্য বলা হতে বিরতি কুশল। বৃথাবাক্য বলা অকুশল, বৃথাবাক্য বলা হতে বিরতি কুশল। অভিধ্যা (লোভ) অকুশল, অনভিধ্যা কুশল। করুণাহীন অকুশল, করুণা কুশল। ভ্রান্তধারণা অকুশল, সত্যধারণা কুশল'। এখানে বুদ্ধ এই দশবিধ ধর্মকে (আচার) অকুশল আর দশবিধ বিরত ধর্মকে কুশল হিসেবে অভিহিত করেছেন।

মৃত্যুকালে সম্পাদিত কর্ম কুশল হোক আর অকুশল হোক বিশেষ ফলদায়ী। জীবনে কুশল কর্মের প্রাধান্য সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় অকুশল চিন্তা উৎপন্ন হলে অবশ্যই নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে সারাজীবনে অকুশল কর্মের পরিমাণ বেশি থাকলেও মৃত্যুক্ষণে কুশলচিত্তের উৎপত্তি হেতু উর্দ্ধগতি লাভ হয়। মৃত্যুক্ষণে কুশল উৎপন্ন হলেই তার গতি সৎ ও সুখের হয়। সুতরাং কুশল চিন্তা উৎপন্ন করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

কুশল এবং অকুশল কর্মের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধর?

পাঠ : ৫
চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের বাংলা অনুবাদ

চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সুত্ত বা ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ সূত্র মধ্যম নিকায়ের (তৃতীয়খণ্ড) ১৩৫ নং সংখ্যক সূত্র। এতে কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। নিচে তা তুলে ধরা হলো।

আমি এ রকম শুনেছি যে, এক সময় ভগবান বুদ্ধ জেতবনে অনাথ পিণ্ডিকের আরামে বাস করেছিলেন। সে সময় তোদেয়্য ব্রাহ্মণের পুত্র শুভ মাণবক বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের সাথে আনন্দময় আলাপ-আলোচনা করেন। তারপর তোদেয়্য পুত্র শুভ মাণবক বুদ্ধকে বললেন, 'হে গৌতম পুত্র! কী কারণে মানুষের মধ্যে কেউ হীন ও কেউ উৎকৃষ্ট, কেউ অল্পায়ু ও কেউ দীর্ঘজীবী, কেউ রোগী ও কেউ নিরোগী, কেউ বিশ্রী ও কেউ সুশ্রী, কেউ গরিব ও কেউ ধনী, কেউ অল্পশক্তিযুক্ত ও কেউ মহাশক্তিযুক্ত, কেউ নীচু কুলজাত, কেউ উচ্চ কুলজাত, কেউ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী লোক জগতে দেখা যায়? হে গৌতম! মানুষের মধ্যে এরূপ হীন ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ কী?

তখন বুদ্ধ উত্তরে বললেন, 'হে মাণবক! এ জগতে জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কর্মই জীবগণের একমাত্র বন্ধু। কর্মই তাদের একমাত্র শরণ বা আশ্রয়। কর্মই জীবগণের একমাত্র রক্ষাকারী। কর্মই জীবগণকে হীন ও শ্রেষ্ঠভাবে বিভক্ত করবে।

শুভ মাণবক বললো, 'হে গৌতম ! আমি আপনার দেশিত বিষয়টি ভালো করে ঝুঝতে পারিনি। আপনি সর্বজ্ঞ। সুতরাং কর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত দেশনা করুন যাতে আমি সহজেই বুঝতে পারি।

তখন বুদ্ধ বললেন, 'হে শুভ মাণবক! তাহলে শোনো। মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো।

শুভ মাণবক বললেন, 'হ্যাঁ ভগবান বলুন।'

তখন বুদ্ধ বললেন, 'হে মাণবক! এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ প্রাণিহত্যাকারী এবং লোভী হয়। তারা সবসময় প্রাণীর রক্তে হাত রঞ্জিত করে। এভাবে হত্যা বা আহত করে জীবের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে। এ রকম আচরণের ফলে তারা মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক বা নরকে যায়। যদি মানবকুলে জন্ম নেয় তবে তারা কম আয়ু পায়।

হে মাণবক ! প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া এবং হতাহত জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতাই কম আয়ু পাওয়ার অন্যতম কারণ।

হে মাণবক! কোনো কোনো নারী পুরুষ প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকে। তারা অস্ত্র ফেলে দেয়, প্রাণী হত্যায় লজ্জা অনুভত করে। সকল প্রাণীর প্রতি করুণা প্রদর্শনপূর্বক জীবনধারণ করে। এভাবে কুশল কাজ করে এবং কুশল জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে তারা জীবনধারণ করে। এ জন্য মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে যায়। স্বর্গে না গিয়ে আবার মানুষ হয়ে জন্ম নিলেও দীর্ঘ জীবন পায়। প্রাণীদের প্রতি করুণা পরায়ণ ও উপকারী হয়ে জীবহত্যা থেকে বিরত থাকার জন্য তারা দীর্ঘজীবী হয়'।

'হে মাণবক! পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ প্রাণীদের উপর অত্যাচার করে। তারা ঢিল, লাঠি বা অস্ত্রের দ্বারা জীবের উপর অত্যাচার চালায়। জীবের উপর এ রকম অত্যাচার করা উচিত নয়। এ ধরনের কষ্ট দেওয়ার জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয়। আর যদি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে তবে তারা সবসময় কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়'।

'হে মাণবক! 'এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ রাগী হয়। সামান্য কথাতেই তারা রেগে উঠে। মন্দ কথা বলে। রাগ, হিংসা দীর্ঘদিন ধরে মনে পুষে রাখে এবং পরে তা আবার প্রকাশ করে। এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোকে অথবা নরকে জন্মগ্রহণ করে। আর যদি তারা মানবকুলে জন্ম নেয়ও তবে তাদের চেহারা খুবই বিশ্রী হয়। এটিই তাদের বিশ্রী হওয়ার কারণ'

'হে মাণবক! পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ রাগহীন হয়। তাদের শত কিছু বললেও তারা রাগ করে না, লাফালাফি ও উচ্চবাক্য করে না। এ জন্য তারা মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। স্বর্গে না গিয়ে আবার মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও দীর্ঘ জীবন পায়। প্রাণীর প্রতি করুণা পরায়ণ ও উপকারী হয়ে জীবহত্যা থেকে বিরত থাকার জন্য তারা দীর্ঘজীবী হয়। হে মাণবক ! এটি তাদের সুশ্রী হওয়ার অন্যতম কারণ।

'হে মানবক! কোনো কোনো নারী বা পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ হয়। যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা বা পুজা পাওয়া লোকদের তারা ঈর্ষা করে। আক্রোশ প্রকাশ করে। দোষী বলে সাব্যস্ত করে। এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোকে অথবা নরকে জন্মগ্রহণ করে। তারা মানবকুলে জন্ম নিলেও গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। হে মাণবক! এটাই গরিব পরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণ।

২০২১

'হে মাণবক ! কোনো কোনো নারী বা পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ হয় না। যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা পূজা পাওয়ার লোকদের তারা ঈর্ষা করে না। ঈর্ষার কারণে কারো প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে না। দোষী বলে সাব্যস্থ করে না। এজন্য তারা স্বর্গে যায়। মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলে মহাপরিবারে জন্ম নেয়। এটাই মহাপরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণ ।

'হে মাণবক! এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ দাতা হয় না। শ্রমণ ব্রাহ্মণকে খাদ্য, পানীয়, কাপড় কোন কিছুই দান করে না। এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুর লোক অথবা নরকে জন্ম নেয়। আর যদি মানবকুলে জন্ম নেয়ও তবে তারা খুব গরিব হয়। এটাই গরিব হওয়ার কারণ'।

'হে মাণবক! এ পৃথিবীতে কোনো নারী বা পুরুষ অহংকারী হয়। সে অভিবাদনের যোগ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করে না। দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান করে না। আসন দানের যোগ্য ব্যক্তিকে আসন দান করে না।পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজা করে না। মান্য করার যোগ্য ব্যক্তিকে মান্য করে না। এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয়। আর যদি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে তারা নীচুকুলে জন্ম নেয়। আর যদি মানবকুলে জন্ম নেয়ও তবে তারা নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে। এটাই নীচুকুলে জন্ম নেওয়ার কারণ'।

'হে মাণবক, এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ অহংকারী হয় না। অভিবাদনের যোগ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করে। এছাড়া যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করেন, আসন দানের যোগ্য ব্যক্তিকে আসন দান করে, পূজা করার ব্যক্তিকে পূজা করে, মান্য করার যোগ্য ব্যক্তিকে মান্য করে। এজন্য তার স্বর্গে যায়। আর মানুষ হয়ে জন্ম নিলেও উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে। এটাই উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করার কারণ।'

'হে মাণবক, এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী পুরুষ শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, ভন্তে, কুশল কী ? অকুশল কী? কী দোষের নয়? কী সেবা করা উচিৎ? কী সেবা উচিৎ নয়। কোন কাজ করলে তা আমার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্টকর ও দুঃখকর হবে এবং কোন কাজ করলে তা আমার জন্য দীর্ঘকাল সুখ বয়ে আনবে? এরূপ কাজ করলে তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয়। আর যদি মানবকুলে জন্মও নেয় তবে তারা প্রজ্ঞাহীন নয়। এটাই প্রজ্ঞাহীন হয়ে জন্মগ্রহণের কারণ'।

'হে মাণবক! এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ, শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কুশল কী? অকুশল কী? কী কী দোষের নয়? কিসের সেবা করা উচিৎ? কিসের সেবা করা উচিৎ নয়? কোন কাজ করলে তা দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট অনিষ্টকর দুঃখকর হবে? কোন কাজ করলে তা আমার জন্য দীর্ঘকাল সুখ বয়ে আনবে? এরূপ কাজের জন্য তারা স্বর্গে যায়। আর মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলে মহজ্ঞানী হয়ে জন্ম নেয়। এটাই মহাজ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করার কারণ'।

'হে মাণবক! এরূপে অল্প আয়ু, দীর্ঘ আয়ু, জটিল ব্যাধিগ্রস্থ, নিরোগ, বিশ্রী, সুশ্রী, দুঃখী পরিবার, সুখী পরিবার, গরিব, ধনী, অল্পশক্তিসম্পন্ন, মহাশক্তিসম্পন্ন, উঁচুকুল, নিচুকুল, জ্ঞানহীন, মহাজ্ঞানী নানারকম মানুষ দেখা যায়'।

'হে মাণবক! কর্মই জীবগণের সঙ্গী। জীবগণ কর্মেরই অধীন। কর্মের মাধ্যমেই মানুষ বিভিন্নকুলে জন্মগ্রহণ করার কারণ হয়। অর্থাৎ তারা দুর্গতি, অপায়, অসুরলোক, নরক বা মানবকুলে জন্ম নেয়। কর্মই বন্ধু। কর্মই প্রতিকারণ। সুতরাং কর্মই মানুষকে হীনকুলে নিয়ে যায়। কর্মই আবার মানুষকে উঁচুকুলে নিয়ে যায়। উঁচুবংশে জন্মাতে সাহায্য করে। শ্রেষ্ঠ করে তোলে'।

বুদ্ধ এভাবে কর্মবাদ ব্যাখ্যা করলে তোদেয়্য পুত্র শুভ মাণবক বুদ্ধকে বললেন ; অতি উত্তম, অতি সুন্দর, অতি মনোরম। আপনি আচ্ছাদিত বস্তুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করলেন। পথ হারা মানুষকে পথ প্রর্দশন করলেন। হে বুদ্ধ ! এখন আমি আপনার প্রবর্তিত ধর্ম এবং প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করলাম। আজ থেকে আপনি আমাকে আপনার শরণাগত উপাসক মনে করুন।

অনুশীলনমূলক কাজ

চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের মূলকথা কী লেখ।

পাঠ : ৬
কর্মবাদের গুরুত্ব

কর্মবাদ বৌদ্ধধর্মে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বুদ্ধের কর্মবাদ অনুসারে চিত্ত বা চেতনাই হলো কুশলকর্ম এবং অকুশল কর্মের উৎপত্তিস্থল। এই কর্মবাদ অনুসারে খারাপ চিন্তা করাও পাপ। কুশল চেতনার মাধ্যমে কুশলকর্ম সম্পাদিত হয়। কার্যকারণনীতির অমোঘ প্রক্রিয়ার দ্বারা গত জীবনের কর্মফলে বর্তমান জীবন, বর্তমান জীবনের কর্মফলে ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করে। স্বর্গ হতে নিম্নতর নরক পর্যন্ত সমস্ত জীব কর্মসূত্রে গ্রথিত। সকলেই কর্মের একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। কোনো কর্ম একবার সম্পাদন করলে অনন্তকাল পর্যন্ত তা ফল প্রদান করতে থাকে। এভাবে কর্মের ফল অখণ্ডনীয়। সবাইকে তা ভোগ করতে হবে। তাই কুশল কাজের জন্য মন সংযত করা দরকার। ধর্মপদে এ বিষয়ে দেখা যায় ;

মনো পুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোমযা
মনসা চ পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো ন সুখমন্বেতি ছাযা'ব অনুপাযিনী

বাংলা অনুবাদ : মন সকল ধর্মের মধ্যে অগ্রগামী। সব ধর্ম মনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসন্ন মনে কেউ যদি কোনো রকম কাজ সম্পাদন করে তাহলে সুখ তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে।

কর্মের দ্বার তিনটি। যথা : কায় দ্বার, বাক্য দ্বার, এবং মনো দ্বার। প্রতিনিয়ত এই তিনটি দ্বার দিয়ে কর্ম সম্পাদিত হয়। কোনো কোনো কর্মে তিনটি দ্বারই এক সঙ্গে থাকে। কোনো কাজে দুটো এবং কোনো কোনো কাজ কেবল একটি দ্বার দিয়েই সম্পাদিত হয়। তিন দ্বারের মাধ্যমে আমরা যে সব কাজ করছি, তার কোনোটি সৎ, কোনোটি অসৎ আবার কোনোটি নিরপেক্ষ। কোনো কর্ম সৎ নাকি অসৎ তার বিচার করা হয় কর্মফলের দ্বারা। যে কর্মের ফল কর্তার নিজের ও নিজের পারিপার্শ্বিক জীবজগতের পক্ষে কল্যাণময় ও সুখপ্রদায়ী তাকে বলা হয় সৎ কর্ম। যা কর্তার নিজের এবং পারিপার্শ্বিক জীবজগতের অকল্যাণকর বা দুঃখ আনয়ন করে তাই অসৎ কর্ম। যে কর্ম সম্পাদন হলেও ফলপ্রসূ হয় না তাই নিরপেক্ষ কর্ম।

কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব, জন্ম দিয়ে নয়। সুন্দরভাবে প্রতিদিন কর্ম সম্পাদন করলে জীবন সুখময় হয়। তবে সম্পাদিত কর্মের মধ্যে কুশল চেতনা থাকা দরকার। এভাবে কাজ করলে ভালো ফলাফল অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কর্মের মাধ্যমেই একজন মানুষ তার নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করতে পারে। কর্মই মানুষকে উচ্চ আসনে আসীন করে। কর্মের সুফল সবদিকেই প্রবাহিত হয়। কর্মই মানুষের চালিকাশক্তি। মানুষ নিজেই নিজের কর্মফল বহন করে। পশ্চাতে ফেলে আসে না। বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে, প্রাণী হত্যা না করা, চুরি না করা, ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া, মিথ্যা কথা না বলা, মাদকদ্রব্য সেবন না করা, বৃথা বাক্য না বলা, কর্কশ বাক্য না বলা-এর বিধান রয়েছে। সুন্দরভাবে জীবিকা অবলম্বনের জন্য অন্যায় ও অসামাজিক সকল প্রকার কাজ করা উচিত নয়। কেননা, নিন্দিত বা খারাপ কাজ যারা করে তাদেরকে সমাজে সবাই অবজ্ঞা করে। ঘৃণার চোখে দেখে। সুতরাং বুদ্ধের কর্মবাদ মনে রেখে কল্যাণময় কর্ম করা উচিত। শুভ বা কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যে ফল অর্জিত হয় তা কখনো পুণ্যের পথ ধ্বংস করতে পারে না। এমন কর্মসম্পাদন করতে হবে যার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্রের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুসারে .... ভোগ করে।
২. .... নানাত্ব হেতু সকল মানুষ সমান হয় না
৩. বৌদ্ধধর্মে ... . উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
৪. কর্মই প্রাণীকে নানাভাবে........... করে।
৫. বর্তমান জীবনের .. .. ভবিষ্যৎ জীবন গঠন হয়।।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কর্মবাদ বলতে কী বোঝ?
২. কর্মের অধীন কারা?
৩. কুশল কর্ম বলতে কী বোঝ?
৪. অকুশল কর্ম বলতে কী বোঝ?
৫. কর্মের দ্বার কয়টি ও কি কি?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।
২. কুশল এবং অকুশল কর্ম সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।
৩. চূল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের সারমর্ম তুলে ধর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন্ বুদ্ধের সময়ে ক্ষেমা হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

ক. ককুসন্ধ খ. কশ্যপ
খ. কোণাগমন ঘ. পদুমুত্তর

২। কর্মবাদ বলতে কী বোঝায় ?

ক. ধারণার বিশ্বাসকে
খ. কর্মফলের গভীর বিশ্বাসকে
গ. পূর্ব জন্মের বিশ্বাসকে
ঘ. ইহকর্মফলের বিশ্বাসকে

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

দায়ক ও ভন্তের কথোপকথন :

দায়ক : বিহারের গিয়ে ত্রিরত্ন বন্দনা শেষে ভিক্ষু বন্দনাপূর্বক পাশে বসে প্রশ্ন করেন – মানুষ ধনী-গরিব, সুশ্রী-বিশ্রী হয় কেন ?

ভন্তে : তিনি দেশনায় বুদ্ধের উদ্ধৃতাংশ দিয়ে বলেন – 'জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কর্মই জীবনের একমাত্র বন্ধু। কর্মই তাদের একমাত্র আশ্রয়। কর্মই জীবগণের একমাত্র রক্ষাকারী। কর্মই জীবগণকে হীন ও শ্রেষ্ঠভাবে বিভক্ত করে।'

৩। দায়কের প্রশ্নকরণের বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?

ক. সুভদ্রের খ. ব্রাহ্মণের
গ. শুভমানবের ঘ. উপালির

৪। ভন্তের দেশনায় বুদ্ধের উদ্ধৃতাংশটিতে কীসের প্রকাশ পেয়েছে –

ক. ধম্মপদের খ. বস্তুবাদের
গ. কর্মবাদের ঘ. ভাববাদের

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নতুনপাড়ার দুই প্রতিবেশী পাশাপাশি অবস্থান করেন। তাঁদের মধ্যে দীপান্বিতা চাক্মার পরিবারের সদস্যরা শান্ত ও ভদ্র। যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা পাওয়া লোকদের তাঁরা ঈর্ষা করেন না বরং বিহারে ও বাড়িতে ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ করে খাদ্য, পানীয় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সামর্থ অনুসারে দান দিয়ে থাকেন। তাই অন্য পরিবারের সদস্যরা হিংসা ও আক্রোশমূলক কথাবার্তা বলে তাঁদের বিরক্তি ঘটান।

ক. ‘সঙ্গীতি সূত্রে’ কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?

খ. দেবদত্তকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে কেন ? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

গ. দীপান্বিতা চাকমার পরিবারের কর্মকাণ্ডগুলো কোন সূত্রের সাথে মিল পাওয়া যায় ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে দুই পরিবারের আচরণে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কী প্রভাব ফেলবে ? ধর্মীয় দৃষ্টিতে তা বিচার বিশ্লেষণ কর।

২।

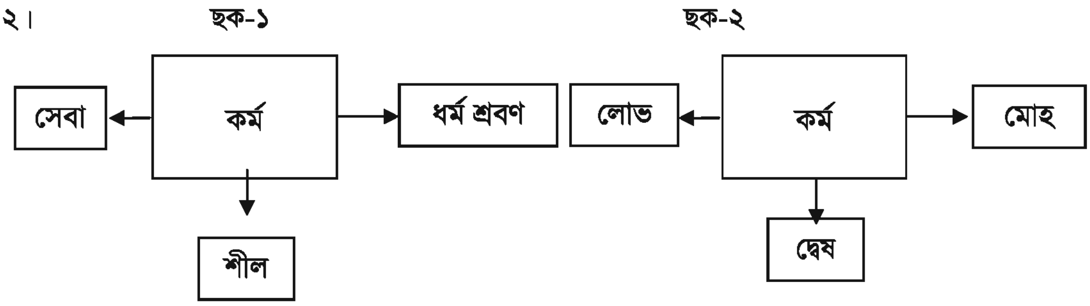

ক. অকুশল শব্দের অর্থ কী ?

খ. উৎপীড়ক কর্ম কী ? ব্যাখ্যা কর।

গ. ছক-১ দ্বারা কোন কর্মের ইঙ্গিত বহন করছে - ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছক-১ ও ২ এ বর্ণিত কর্মফলের পার্থক্য কী হতে পারে ? ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অট্ঠকথা

ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুর সহজ-সরল ব্যাখ্যা স্বরূপ পালি ভাষায় এক শ্রেণির সাহিত্যকর্ম রচিত হয় যা পালি সাহিত্যের ইতিহাসে অট্ঠকথা নামে পরিচিত। ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে রচিত হলেও অট্ঠকথা পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত নয়, একটি স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত। অট্ঠকথা সাহিত্যে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ও আলোচিত হয়। এজন্য অট্ঠকথা সাহিত্যকে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ইতিহাসের অনন্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। এই অধ্যায়ে আমরা অট্ঠকথা সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

* অট্ঠকথা এর ধারণা ও রচনার পটভূমি বর্ণনা করতে পারব;
* অট্ঠকথার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারব;
* অট্ঠকথা রচয়িতাদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ধারণা দিতে পারব;
* অট্ঠকথার গুরুত্ব ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

অট্ঠকথা'র ধারণা ও রচনার পটভূমি

পালি 'অট্ঠকথা' শব্দটি 'অট্ঠ' এবং 'কথা' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'অট্ঠ' শব্দের দ্বারা 'অর্থ', 'কথা' শব্দের দ্বারা কথা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি নির্দেশ করে। অট্ঠকথাকে সংস্কৃতে 'অর্থকথা' বা 'ভাষ্য', ইংরেজিতে 'commentary' বলা হয়। অতএব অট্ঠকথা বলতে অর্থকথা, ভাষ্য, অর্থ বর্ণনা, অর্থবাদ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি বোঝায়। সাধারণত যে গ্রন্থ শব্দের অর্থবর্ণনা বা ব্যাখ্যা করে তাকে অট্ঠকথা বলে। 'সারত্থদীপনী' নামক গ্রন্থে অট্ঠকথা প্রসঙ্গে এরূপ বলা হয়েছে : অত্থো কথিযতি এতাযতি অট্ঠকথা অর্থাৎ অর্থ বর্ণনা করে বলেই অট্ঠকথা।

ত্রিপিটকে অনেক জটিল, দুর্বোধ্য, দ্ব্যর্থক ও উহ্য পদ বা বিষয় রয়েছে যা সকল শ্রেণির পাঠকের নিকট সহজে বোধগম্য নয়। সেসব পদ বা বিষয়সমূহ সমার্থক বা প্রতিশব্দ, উদাহরণ, উপমা, গল্প, ব্যাখ্যা প্রভৃতির সাহায্যে সহজ-সরলভাবে অট্ঠকথায় উপস্থাপন করা হয়। এভাবে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যামূলক পালি ভাষায় যে-সাহিত্যকর্ম রচিত হয় তাকে অট্ঠকথা বলে।

দুঃখমুক্তির অমিয় বাণীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিন ভারতবর্ষের নানাজাতি, নানা কুল এবং নানা শ্রেণির অসংখ্য মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন বুদ্ধের সঙ্ঘে। বৌদ্ধসঙ্ঘে জ্ঞানী ভিক্ষু-ভিক্ষুণী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন স্বল্পজ্ঞানীও। ফলে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ সবার পক্ষে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হতো না। ফলস্বরূপ বুদ্ধের জীবিতকালেই তাঁর ধর্মোপদেশের বিভিন্ন বিষয় অর্থসহকারে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন

হতো। সঙ্ঘের মধ্যে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা ও নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দিত। যেমন : কেউ বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও সঙ্ঘের নিন্দা করলে, সঙ্ঘের বিধিবিধান ভঙ্গ করলে, বুদ্ধবাণীর ভুল ব্যাখ্যা করলে, সঙ্ঘে অসুন্দর আচরণ করলে, ক্রোধোন্মত্ত আলোচনা হলে, ধর্ম-দর্শনসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক দেখা দিলে, বুদ্ধবাণীর কোনো বিষয় দুর্বোধ্য হলে ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হয়ে বিষয়সমূহ প্রতিকার বা সমাধানের চেষ্টা করতেন। এক্ষেত্রে কখনো বুদ্ধ, কখনো বা তাঁর নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করতেন। ত্রিপিটকে এ সম্পর্কে বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন একদা পরিব্রাজক সুপ্রিয় এবং এক তরুণ বুদ্ধ শিষ্যের মধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ বিষয়ে কথোপকথন হচ্ছিল। একদিকে পরিব্রাজক সুপ্রিয় বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের নিন্দা করছিলেন। অপরদিকে তরুণ শিষ্য বুদ্ধের উচ্চ প্রসংশা করছিলেন। এতে ভিক্ষুগণ ইতস্তত বোধ করলে বুদ্ধ এ সম্পর্কে করণীয় ও অকরণীয় বিষয় ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা দীর্ঘনিকায়ের সীলক্খন্ধবগ্গে উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে দেখা যায়, একদা পরিব্রাজক পোতলিপুত্র নবীন ভিক্ষু সমিদ্ধিকে বুদ্ধবাণী ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন : "বন্ধু সমিদ্ধি ! সাক্ষাৎ শ্রমণ গৌতমকে আমি এরূপ বলতে শুনেছি : কায় কর্ম মিথ্যা (নিষ্ফল), বাককর্ম মিথ্যা, একমাত্র মনোকর্মই সত্য। আর সেই সমাপত্তি আছে যা লাভ করে ধ্যানী কিছুই অনুভব করেন না।" তখন ভিক্ষু সমিদ্ধি পরিব্রাজক পোতলিপুত্রকে বলেন, "বন্ধু পোতলিপুত্র ! ঐরূপ বলবেন না, ভগবানের অপবাদ ভালো নয়, ভগবান কখনো ঐরূপ বলবেন না।" এরূপ বলার পর পরিব্রাজক পোতলিপুত্র চলে গেলে ভিক্ষু সমিদ্ধি বিষয়টি আনন্দ থেরকে জ্ঞাত করেন। আনন্দ থের তা বুদ্ধকে পরিজ্ঞাত করেন। বুদ্ধ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার নিমিত্তে উদাহরণ ও অর্থসহকারে কর্মের সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা মহাকম্মবিভঙ্গ সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধসঙ্ঘ গঠনের প্রথমদিকে এভাবে ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের মাধ্যমে সমস্যাসমূহ বুদ্ধ নিজেই সমাধান করতেন। কিন্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধসঙ্ঘ বিস্তৃতিলাভ করলে তাঁর পক্ষে সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হতো না। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, বুদ্ধের ধর্মপ্রচার আরম্ভের কয়েক বছরের মধ্যেই প্রাচীন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ জনপদ বা শহর, যেমন : সারনাথ, রাজগৃহ, বৈশালী, নালন্দা, পাবা, উজ্জয়নী, চম্পা, মথুরা, শ্রাবস্তী প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধসঙ্ঘ গড়ে ওঠে এবং উক্ত স্থানগুলো বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনচর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। এসব স্থানে সবসময় বুদ্ধের পক্ষে বসবাস করা সম্ভব ছিল না বিধায় কেন্দ্রসমূহ বুদ্ধের নেতৃস্থানীয় এক-একজন শিষ্যের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে থাকে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন : আনন্দ, মহাকশ্যপ, মহাকচ্চায়ন, মহাকোট্ঠিত, সারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ান। বুদ্ধের অবর্তমানে তাঁরা বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যসহ সঙ্ঘ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সমস্যার সমাধান দিতেন। নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ বুদ্ধের দেশনাসমূহ ভিক্ষুদের অর্থসহকারে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের মধ্যে বুদ্ধ অনেককে তাঁর ধর্মোপদেশ তথা ধর্মদর্শন যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম মনে করতেন। এক্ষেত্রে মহাকচ্চায়ন, সারিপুত্র এবং মহাকোট্ঠিত থের ছিলেন অগ্রগণ্য। মহাকচ্চায়ন বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত দেশনাসমূহ প্রাঞ্জল এবং সহজ-সরলভাবে শ্রোতাদের নিকট উপস্থাপন করতে পারদর্শী ছিলেন। ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন এবং বুদ্ধ মহাকচ্চায়নকে ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় সর্বাগ্রে স্থান দেন। তা ছাড়া, কেন্দ্রসমূহে ভিক্ষুদের মধ্যে ধর্ম-দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব নির্দেশনা ও ব্যাখ্যাদান করতেন তা বুদ্ধকে যথাসময়ে ১০১২

পরিজ্ঞাত করা হতো। বুদ্ধ নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের যেসব ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা সঠিক মনে করতেন তা অনুমোদন দান করতেন এবং ভিক্ষুদের গ্রহণ, ধারণ ও পালন করতে নির্দেশ দিতেন। প্রথম সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী সংকলনের সময় এসব ব্যাখ্যাও অনুমোদন লাভ করে সংকলিত হয়েছিল, যা ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্যদের এসব ব্যাখ্যাকে অট্ঠকথার সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যা পরবর্তীকালে সমৃদ্ধি লাভপূর্বক অট্ঠকথা রচনার পটভূমি তৈরি করে।

বুদ্ধবাণীর যুগোপযোগী এবং সহজ-সরল অর্থযুক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে যে- সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছিল তাই অট্ঠকথা নামে পরিচিতি লাভ করে। সাধারণত অট্ঠকথা বা ভাষ্য বলতে বোঝায় একজনের প্রজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রাচীন পাঠের নতুন এবং যুগোপযোগী বোধগম্য অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা, যা মূল পাঠের যথোপযুক্ত অর্থ ও ভাব যথাযথভাবে ধারণ করে রাখে।

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলরাজ রাজ বট্টগামিণীর পৃষ্ঠপোষকতায় অট্ঠকথাসমূহ সিংহলি ভাষায় তালপত্রে লিখে সংরক্ষণ করা হয়। এ কারণে বলা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকের আগেই অট্ঠকথা সাহিত্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। সিংহলের অনুরাধাপুরার মহাবিহারে তালপত্রে লিখিত অট্ঠকথাসমূহ সংরক্ষিত ছিল। কালক্রমে তা সীহলট্ঠকথা (সিংহলি অট্ঠকথা) নামে পরিচিতি লাভ করে। সীলট্ঠকথাসমূহ মহা-অট্ঠকথা, মহাপচ্চরি অট্ঠকথা, কুরুন্দি অট্ঠকথা, অন্ধক অট্ঠকথা, সংক্ষেপ অট্ঠকথা ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। অট্ঠকথা রচনার সূচনা ভারতবর্ষে হলেও তা ভারতবর্ষে পাওয়া যেত না। ফলে ভারতীয় এবং অন্যান্য দেশের লোকেরা সহজে বুদ্ধবাণী বুঝতে পারত না। সে-কারণে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দিকে বুদ্ধঘোষ, বুদ্ধদত্ত, ধর্মপাল, মহানাম এবং উপসেন প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিংহলে সিংহলি ভাষায় সংরক্ষিত সীহলট্ঠকথা হতে পালি ভাষায় বর্তমান কালের অট্ঠকথাসমূহ রচনা করেন। এভাবে বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে অট্ঠকথাসমূহ বর্তমান কালের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

প্রথম দিকে অট্ঠকথাসমূহ ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু তথা বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন নিয়ে রচিত হলেও পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়েও নানা শ্রেণির অট্ঠকথা রচিত হয়। ফলে অট্ঠকথা বিশাল ও বৈচিত্র্যময় সাহিত্যভাণ্ডারের রূপ লাভ করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

অট্ঠকথা বলতে কী বোঝ?

বুদ্ধের নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের নামের একটি তালিকা তৈরি কর

ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় পারদর্শী কয়েকজন বুদ্ধশিষ্যের নাম বল

সীহলট্ঠকথাসমূহ কী কী নামে পরিচিত ছিল?

বর্তমানকালের পালি অট্ঠকথাসমূহ কিসের ভিত্তিতে কারা রচনা করেছিলেন?

পাঠ-২

অট্‌ঠকথার বিষয়বস্তু ও পরিচিতি

বুদ্ধের মূলবাণীর বিস্তারিত অর্থ ও ব্যাখ্যামূলক টীকা বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে অট্‌ঠকথা বা অর্থকথা নামে পরিচিত। এটাকে ভাষ্যগ্রন্থ বলা যায়। বুদ্ধের জীবিতকালেই বুদ্ধের ধর্মবাণী, বিধি বিধান এবং সমকালীন বিভিন্ন জটিল বিষয়ের সমস্যা বুদ্ধ ও তাঁর নেতৃস্থানীয় শিষ্য-শিষ্যগণ ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক সমাধান করতেন। বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণের সেসব ব্যাখ্যাকে অট্‌ঠকথা সাহিত্যের সূচনা ও পটভূমি হিসেবে গণ্য করা যায়। অট্‌ঠকথা রচিয়তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আচার্য বুদ্ধঘোষ, আচার্য বুদ্ধদত্ত, আচার্য ধর্মপাল, আচার্য উপসেন, আচার্য মহানাম প্রমুখ। নিম্নে বিভিন্ন পিটকের অট্‌ঠকথার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

সুত্ত পিটকের অট্‌ঠকথা পরিচিতি

সুত্ত পিটক পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা: দীঘনিকায়, মধ্যম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্দক নিকায়। প্রতিটি নিকায়ের স্বতন্ত্র অট্‌ঠকথা রচিত হয়েছে। খুদ্দক নিকায়ে ষোলটি গ্রন্থ আছে। প্রথম চারটি নিকায়ের অট্‌ঠকথাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিতি হলেও খুদ্দক নিকায়ের অনেকগুলো গ্রন্থের অট্‌ঠকথা একই নামে অভিহিত। যেমন, উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা এবং চরিয়াপিটক - এই সাতটি গ্রন্থের অট্‌ঠকথা পরমত্থদীপনী নামে পরিচিত। অপরদিকে, মহানিদ্দেস ও চূলনিদ্দেস গ্রন্থের অট্‌ঠকথা সদ্ধম্মপজ্জোতিকা নামে অভিহিত। আচার্য উপসেন মহানিদ্দেস ও চূলনিদ্দেস গ্রন্থদ্বয়ের অট্‌ঠকথা হিসেবে সদ্ধম্মপজ্জোতিকা রচনা করেন। তাই প্রথম চারটি নিকায়ের অট্‌ঠকথার নাম ও পরিচিতি আলাদাভাবে তুলে ধরা হলো।

মূল গ্রন্থ	অট্‌ঠকথার নাম	লেখক
দীঘ নিকায়	সুমঙ্গলবিলাসিনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
মধ্যম নিকায়	পপঞ্চসূদনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
সংযুক্ত নিকায়	সারত্থপকাসনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
অঙ্গুত্তর নিকায়	মনোরথপূরণী	আচার্য বুদ্ধঘোষ

বিনয় পিটকের অট্‌ঠকথা পরিচিতি

বিনয় পিটক প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : সুত্তবিভঙ্গ, খন্ধক এবং পরিবার বা পরিবার পাঠ। বিনয়পিটকের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে দু'টি অট্‌ঠকথা রচিত হয়েছে। যথা : সমন্তপাসাদিকা এবং কঙ্খাবিতরণী। সমন্তপাসাদিকা সমগ্র বিনয়পিটকের অট্‌ঠকথা হিসেবে পরিচিত। সুত্তবিভঙ্গ গ্রন্থে বর্ণিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিনয় বিধানসমূহ পাতিমোক্‌খ নামে পরিচিত। পাতিমোক্‌খের আলোকে রচিত অট্‌ঠকথাকে কঙ্খাবিতরণী বলে।

অভিধর্ম পিটকের অট্‌ঠকথা পরিচিতি

অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। যথা : ধম্মসঙ্গণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক এবং পট্‌ঠান। অভিধর্ম পিটকের প্রতিটি গ্রন্থের অট্‌ঠকথা রচিত হয়েছে। ধম্মসঙ্গণি এবং বিভঙ্গের অট্‌ঠকথা ছাড়া অভিধর্মপিটকের অন্যান্য পাঁচটি গ্রন্থের অট্‌ঠকথা পঞ্চপকরণট্‌ঠকথা নামে পরিচিত। অভিধর্ম বৌদ্ধ দর্শন হিসেবে খ্যাত।

অভিধর্ম পিটকের অট্‌ঠকথায় বৌদ্ধধর্মের গভীর দার্শনিক বিষয়সমূহ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা

হয়েছে। নিম্নে অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথাসমূহের নাম ও পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

মূলবই	অট্ঠকথার নাম	অট্ঠকথার লেখক
ধম্মসঙ্গণি	অত্থসালিনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
বিভঙ্গ	সম্মোহবিনোদনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
ধাতুকথা	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (১)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
পুগ্গলপঞ্ঞত্তি	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (২)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
কথাবত্থু	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৩)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
যমক	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৪)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
পট্ঠান	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৫)	আচার্য বুদ্ধঘোষ

অনুশীলনমূলক কাজ

পরমত্থদীপনী কোন্ কোন্ গ্রন্থের অট্ঠকথা?

বুদ্ধঘোষ রচিত সুত্তপিটকের অট্ঠকথার একটি তালিকা প্রস্তুত কর

পাঠ : ৩

অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্ত

অট্ঠকথা রচনাকারীদের মধ্যে কালজয়ী অট্ঠকথা রচয়িতা হচ্ছেন বুদ্ধদত্ত। কিন্তু এই কালজয়ী লেখক তাঁর অমর সাহিত্যকর্মে নিজেকে প্রকাশ করেননি। তা ছাড়া, বুদ্ধঘোষের জীবনী পাওয়া গেলেও বুদ্ধদত্তের জীবনী পাওয়া যায় না। ফলে এই মহান লেখকের জন্ম, বাল্যকাল, দীক্ষা, শিক্ষা ও জীবনচর্যা প্রভৃতি কুয়াশাচ্ছন্ন।এই অনুচ্ছেদে প্রখ্যাত অট্ঠকথা রচয়িতা বুদ্ধদত্ত সম্পর্কে পাঠ করব।

জন্মস্থান ও সময়কাল :

গন্ধবংস গ্রন্থে বুদ্ধদত্তকে ভারতের আচার্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বিনয়বিনিচ্ছয় ও উত্তরবিনিচ্ছয় গ্রন্থে তাঁকে উরগপুর নিবাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিনয়বিনিচ্ছয় গ্রন্থটি তিনি চোল রাজ্যের ভূতমঙ্গল গ্রামে বিষ্ণুদাসের আরামে রাজা অচ্যুত বিক্রমের সময়কালে রচনা করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। অভিধম্মাবতার গ্রন্থ মতে, উরগপুর কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পণ্ডিতগণ একমত যে, উরগপুর ছিল বর্তমান কালের দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনপোলির নিকটবর্তী উরায়ুর স্থানটির প্রাচীন নাম। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ হতে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি এবং বিনয়বিনিচ্ছয় টীকা গ্রন্থ মতে, বুদ্ধঘোষ এবং বুদ্ধদত্ত সমসাময়িক ছিলেন। বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, বুদ্ধদত্ত যেদিন সিংহল থেকে জম্বুদ্বীপে ফিরে আসার জন্য রওনা দিয়েছিলেন সেদিন বুদ্ধঘোষও অট্ঠকথা রচনা করার জন্য সিংহলে যাত্রা করেন। উভয়ের জাহাজ মাঝপথে ধাক্কা লেগে থেমে যায়। তখন বুদ্ধদত্ত বুদ্ধঘোষকে 'আবুসো' সম্বোধন করে কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন তা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে বুদ্ধঘোষ বলেন, আমি বুদ্ধবচন সিংহলি হতে মাগধী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য যাচ্ছি। বুদ্ধদত্ত বলেন, আমিও বুদ্ধবাণী মাগধী ভাষায় লেখার জন্য সিংহলে গিয়েছিলাম। আমি কেবল জিনালংকার, দন্তবংস, ধাতুবংস এবং বোধিবংস রচনা সম্পন্ন করেছি। অট্ঠকথা ও টীকা রচনা করতে পারিনি। যদি বুদ্ধবচন সিংহলি হতে মাগধী ভাষায় অনুবাদ করতে ইচ্ছুক হন তাহলে প্রথমে অট্ঠকথা ও টীকা রচনা করবেন। এরূপ বলে তিনি বুদ্ধঘোষকে উৎসাহিত করেন। বুদ্ধঘোষকে 'আবুসো' বলে সম্বোধন করায় কোনো কোনো পণ্ডিত বুদ্ধদত্তকে বয়োজেষ্ঠ্য মনে করেন। বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি এবং বিনয় বিনিচ্ছয় বুদ্ধদত্তের অনেক পরে রচিত। তা ছাড়া, বুদ্ধঘোষ ও বুদ্ধদত্তের গ্রন্থের মধ্যে সাক্ষাতের বিষয়টি পাওয়া যায় না ফলে পণ্ডিতগণ উভয়ের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। তবে সময়কাল বিচারে বুদ্ধদত্ত এবং বুদ্ধঘোষ সমসাময়িক ছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা বা প্রব্রজ্যা লাভ :

বুদ্ধদত্তের দীক্ষা সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু জানা যায় না। অভিধম্মাবতার এবং রূপারূপবিভাগ গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তিনি সিংহলের মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজিত হন। মহাবিহার নিকায়ের নিয়ম অনুযায়ী তিনি ভিক্ষুদের নিকট ধর্ম-বিনয় শিক্ষা লাভ করে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি আজীবন নিকায়ের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন গুরুর নিকট এবং কোন বিহারে দীক্ষিত হয়েছিলেন সে-সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

কবি ও অন্যান্য কীর্তি :

বুদ্ধদত্তের মূল পরিচয় তিনি একজন বৌদ্ধভিক্ষু এবং অট্ঠকথা রচয়িতা বা ভাষ্যকার। আচার্য হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সমকালীন পণ্ডিতদের নিকট তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। পণ্ডিতগণ তাঁর রচিত গ্রন্থ হতে প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করতেন। তিনি সমথ এবং বিদর্শন ভাবনায়ও পরদর্শী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনচর্চায় পারদর্শী এ মহাপুরুষ কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

বুদ্ধদত্তের অধিকাংশ গ্রন্থ পদ্যে রচিত। যেমন, বিনয়বিনিচ্ছয় গ্রন্থটি ৩১৮৩টি গাথায়, উত্তরবিনিচ্ছয় গ্রন্থটি ৯৬৯টি গাথায় এবং অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি ১৪১৫টি গাথায় রচিত। অসীম কবিত্বশক্তির অধিকারী না হলে সহজ-সরলভাবে পদ্যে বা গাথায় বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতেন না। তিনি মহাভাষ্যকার নামেও অভিহিত হতেন।

সাহিত্যকর্ম :

প্রাচীনকালের লেখকগণ গ্রন্থের মধ্যে নাম ও নিজের সম্পর্কে কিছুই লিখতেন না। বুদ্ধদত্তও তাই করেছেন। তাই বুদ্ধদত্তের সাহিত্যকর্ম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। ঐতিহ্য অনুসারে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ বুদ্ধদত্ত রচনা করেন :

২০২৩

১. মধুরত্থবিলাসিনী (বুদ্ধবংসট্ঠকথা)

২. বিনয়বিনিচ্ছয়

৩. উত্তরবিনিচ্ছয়

৪. অভিধম্মাবতার

৫. রূপারূপবিভাগ

৬. জিনলংকার

৭. দন্তবংস বা দাঠাবংস

৮. ধাতুবংস

৯. বোধিবংস

উপরের বর্ণিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিনয়বিনিচ্ছয়, উত্তরবিনিচ্ছয়, অভিধম্মাবতার, রূপারূপবিভাগ এবং মধুরত্থবিলাসিনী- এই পাঁচটি গ্রন্থ পণ্ডিতগণ বুদ্ধদত্তের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকার করেন। বাকি গ্রন্থগুলো নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। তিনি বিনয়বিনিচ্ছয়, মধুরত্থবিলাসিনী এবং অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি দক্ষিণ ভারতের চোল রাজ্যে রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

মৃত্যু :

বুদ্ধদত্তের মৃত্যু সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি সিংহল থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু মৃত্যুর কারণ ও স্থান সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তিনি যেহেতু দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতেই তাঁর গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন, সেহেতু ধারণা করা হয় দক্ষিণ ভারতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধদত্তের জন্মস্থান কোথায়?

কবি হিসেবে বুদ্ধদত্তের মূল্যায়ন কর

ঐতিহ্য অনুসারে বুদ্ধদত্ত রচিত গ্রন্থের তালিকা তৈরি করে তাঁর প্রকৃত রচনাসমূহ চিহ্নিত কর

পাঠ : ৪

অট্ঠকথাচার্য ধর্মপাল

ধর্মপাল সুপ্রসিদ্ধ অট্ঠকথাচার্য ছিলেন। বুদ্ধঘোষের পরেই ছিল তাঁর স্থান। অট্ঠকথা, টীকা এবং অনুটীকা লিখে তিনি পালিসাহিত্য ভাণ্ডারকে নানা আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছেন। অমর সাহিত্যকর্ম রচনা করার জন্য বৌদ্ধগণ এখনও তাঁকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করে। কিন্তু অসীম প্রতিভার অধিকারী এই মহান লেখকের জীবন সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়।

জন্মস্থান ও সময়কাল :

গন্ধবংস গ্রন্থে ধর্মপালকে জম্বুদ্বীপ তথা ভারতের আচার্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ-গ্রন্থে সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর জন্মস্থানের উল্লেখ নেই। সাসনবংস গ্রন্থ মতে, তিনি সিংহলের নিকটবর্তী দমিল রাজ্যের পদরতিত্থের অধিবাসী ছিলেন। নেত্তিপকরণ গ্রন্থের অট্‌ঠকথা মতে, তিনি বদরিত্থ বিহারের নিবাসী ছিলেন। পণ্ডিতগণ 'পদরতিত্থ' এবং 'বদরিত্থ' অভিন্ন স্থান বলে মনে করেন। হিউয়েন সাং-এর মতে, ধর্মপাল কাঞ্চিপুরায় জন্মগ্রহণ করেন। এ-স্থানটি দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ শহর হতে ৪৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বর্তমানকালের কঞ্জেবরণ শহর হিসেবে চিহ্নিত করেন। অপরদিকে পণ্ডিতগণ, 'পদরতিত্থ' বা 'বদরিত্থ' স্থানটি দক্ষিণ ভারতের নাগপট্টনে অবস্থিত বলে অভিমত পোষণ করেন। নাগপট্টন দক্ষিণ ভারতের তেনজোর জেলায় অবস্থিত এবং জন্মসূত্রে তিনি তামিল ছিলেন। বিভিন্ন স্থানের নামোল্লেখ পাওয়া গেলেও তিনি 'পদরতিত্থ' বা 'বদরিত্থ' স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কারণ তাঁর রচিত গ্রন্থ এ-বিষয়টি সমর্থন করে। তাঁর জন্মস্থান হিসেবে যেসব স্থানের নামোল্লেখ পাওয়া যায়া সেসব স্থান দক্ষিণ ভারতেই অবস্থিত ছিল। সম্ভবত, স্থানটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তাই তাঁর জন্মস্থান হিসেবে বিভিন্ন স্থানের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ একমত যে, দক্ষিণ ভারতই ছিল ধর্মপালের জন্মস্থান। তিনি খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল ও দীক্ষা :

ধর্মপালের বাল্যকাল ও দীক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :

'ধর্মপাল কাঞ্চিপুরায় জন্মগ্রহণ করেন। বালক বয়সেই তিনি সুন্দর ও সৎ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন, যা তাঁর সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবন গঠনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। বয়োঃপ্রাপ্ত হলে সে-রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা পাকা হয়। বিবাহের পূর্বরাত্রে তাঁর মনে দুঃখময় ভাবাবেগ উদয় হয়। তিনি বুদ্ধমূর্তির সামনে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করলে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। এক দেবতা এসে তাঁকে সেখান থেকে অনেক দূরের এক পর্বতের বিহারে নিয়ে যান। সেই বিহারের ভিক্ষুগণ তাঁকে দীক্ষা দান করেন। ধর্মপালের গ্রন্থে বা অন্য কোনো গ্রন্থে এ-বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলে বিষয়টি কতটুকু সত্য তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। তাঁর রচিত নেত্তিপকরণ গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতের 'পদরতিত্থ' বা 'বদরিত্থ' বিহারে বসবাস করতেন। ফলে ধারণা করা হয় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতে দীক্ষা বা প্রব্রজ্যা লাভ করেছিলেন। তবে তাঁর দীক্ষাগুরুর নাম জানা যায় না। তিনি মহাবিহার নিকায়ের তথ্যের আলোকে তাঁর গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন। ফলে তিনি মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী বা থেরবাদী ছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

আচার্য বুদ্ধঘোষ এবং আচার্য ধর্মপাল :

বুদ্ধঘোষ এবং ধর্মপাল দুজনেরই রচনারীতি অভিন্ন। শব্দ ও উপমাপ্রয়োগ, বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা এবং ভাষাশৈলীতে উভয়ে একই রীতি অনুসরণ করেছেন। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে উভয়ের ব্যাখ্যা প্রায় একই। ফলে ধারণা করা হয় যে, তাঁরা একই বিদ্যানিকেতনে অধ্যয়ন করেছেন। বুদ্ধঘোষ

সুত্ত পিটকের প্রথম চারটি নিকায়ের উপর অট্ঠকথা রচনা করেছেন। অপরদিকে ধর্মপাল পঞ্চম নিকায় বা খুদ্দক নিকায়ের উপর অট্ঠকথা রচনা করেন। সুত্তপিটকের প্রথম চারি নিকায়ের অট্ঠকথাসমূহ তার আগে রচিত হওয়ায় তিনি শেষ নিকায়ের অট্ঠকথা রচনা করেন। এ-কারণে ধারণা করা হয় যে, বুদ্ধঘোষ ধর্মপালের পূর্ববর্তী ছিলেন।

ধর্মপালের সাহিত্যকর্ম :

১৪টি গ্রন্থ ধর্মপালের রচনা হিসেবে 'গন্ধবংস' গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া গেলেও পণ্ডিতগণ এ-বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। অট্ঠকথাসমূহের মধ্যে ইতিবুত্তকট্ঠকথা, উদানট্ঠকথা, চরিয়পিটকট্ঠকথা, থেরগাথাট্ঠকথা, থেরীগাথাট্ঠকথা, বিমলবিলাসিনী (বিমান বত্থুর অট্ঠকথ) এবং বিমলবিলাসিনী পেতবত্থুর অট্ঠকথা — অর্থাৎ পরমত্থদীপনী নামে পরিচিত এ-সাতটি গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ আছে যে, গ্রন্থসমূহ ধর্মপাল রচনা করেন। ফলে এ-সাতটি গ্রন্থ পণ্ডিতগণ ধর্মপালের রচনা হিসেবে স্বীকার করেন। কিন্তু সাসনবংসে অট্ঠকথাসমূহ ধর্মপালের রচনা হিসেবে স্বীকার করা হলেও টীকাগ্রন্থগুলো ধর্মপালের রচনা হিসেবে স্বীকার করা হয়নি।

ধর্মপালের মৃত্যু :

ধর্মপালের মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তিনি যেহেতু দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন সেহেতু দক্ষিণ ভারতেই তাঁর মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক। তাই তিনি দক্ষিণ ভারতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

অট্ঠকথাচার্য ধর্মপাল কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

অট্ঠকথাচার্য ধর্মপাল রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ : ৫

অট্ঠকথার গুরুত্ব

ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু অট্ঠকথা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলেও এতে প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাই অট্ঠকথাকে প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। অট্ঠকথাসমূহে সাধারণত ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফলে অট্ঠকথার সাহায্যে সহজে এবং যথাযথভাবে বুদ্ধবাণী বোঝা যায়। তা ছাড়া, কালের বিবর্তনে বা অন্য কোনো কারণবশত ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুতে সংযোজন-বিয়োজন বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে কি না তা সহজে নির্ণয় করা যায়। ত্রিপিটক অনুবাদের ক্ষেত্রেও অট্ঠকথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিপিটকে বহু দুর্বোধ্য এবং জটিল বিষয় রয়েছে, যা অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপিটকের অনেক শব্দ দুর্বোধ্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু অট্ঠকথায় সেসব জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ-কারণে অট্ঠকথার সাহায্যে যথাযথভাবে ত্রিপিটক এবং পালি সাহিত্য অনুবাদ করা যায়।

অট্ঠকথায় ত্রিপিটকের পরে রচিত অনেক গ্রন্থের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে পালি সাহিত্যভাণ্ডারে গ্রন্থসমূহের রচনাকাল সম্পর্কে যে বিতর্ক লক্ষ করা যায়, তা অট্ঠকথার সাহায্যে সমাধান করা যায়। অট্ঠকথা পাঠ করে বুদ্ধের সময়কাল থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এর সাহায্যে প্রাচীন রাজন্যবর্গের রাজত্বকাল এবং জীবন-দর্শন নিয়ে প্রচলিত বিতর্ক বা সমস্যা সমাধান করা যায়। অট্ঠকথার পরবর্তীকালে বুদ্ধের জীবন-চরিত, ধর্ম-দর্শন, বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘের ইতিহাস নিয়ে পালি ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অট্ঠকথার সাহায্যে সেসব গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যের ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয় করা যায়। বাক্যাংশের উদ্ধৃতি দেওয়া আধুনিক অভিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অট্ঠকথায় উদ্ধৃতিসহ প্রচুর শব্দার্থ পাওয়া যায়। অট্ঠকথার শব্দার্থের সাহায্যে আধুনিক অভিধান রচনা করা সম্ভব। অট্ঠকথা সাহিত্য পালি ভাষায় রচিত। পালি এক ধরনের প্রাকৃত, যা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা হতে উদ্ভূত। ত্রিপিটক রচনার মধ্য দিয়ে পালি ভাষা সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। পালি ভাষা দু'হাজারেরও অধিক বছরের ইতিহাস ধারণ করে আছে। অট্ঠকথায় সমৃদ্ধ ভাষাশৈলী ব্যবহৃত হয়েছে। অট্ঠকথা সাহিত্যের ভাষাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্যান্য পালি সাহিত্যের ভাষা ও রচনাশৈলীর প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণ করা যায়। তা ছাড়া পালি ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসও জানা সম্ভব। এ-কারণে বলা যায়, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় অট্ঠকথার সাহিত্যের গুরুত্ব সমধিক।

অট্ঠকথা সাহিত্যে বুদ্ধের সময় প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় সংজ্ঞ ও ধর্মমত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, যা বুদ্ধের সময়কালে প্রচলিত ধর্মমতের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। অট্ঠকথা সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের নৃতাত্ত্বিক বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত লোককাহিনীর সাহায্যে শাক্য, কোলীয়, মল্ল, লিচ্ছবি প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা খুবই চিত্তাকর্ষক। অট্ঠকথা সাহিত্যে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়, যা প্রাচীনকালের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় খুবই প্রয়োজনীয়। প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, প্রভৃতির ইতিহাস জানার জন্য পালি অট্ঠকথা সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

অট্ঠকথাকে কেন প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়?

অট্ঠকথায় কোন কোন দেশের তথ্য পাওয়া যায়?

প্রাচীনকালে গ্রাম ও রাস্তাঘাটের নামকরণ কীভাবে করা হতো?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যা মূলক পালি ভাষার যে সাহিত্য কর্ম রচিত হয় তাকে .. .. বলে।
২. আট্ঠকথার সাহায্যে যথাযথ ভাবে............সাহিত্য অনুবাদ করা যায়।
৩. সমকালীন .. .. তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।
৪. গন্ধবংস গ্রন্থে বুদ্ধদত্তকে ভারতের .. .. .. হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।
৫. ধর্মপাল .. .. জন্মগ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অট্ঠকথা শব্দের অর্থ বল।
২. অট্ঠকথা কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী?
৩. পঞ্চনিকায়ের অট্ঠকথা ও অট্ঠকথা রচয়িতার নাম লেখ।
৪. অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথাগুলোর নাম লেখ।
৫. ধর্মপাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অট্ঠকথা রচনার পটভূমি ব্যাখ্যা কর।
২. সুত্ত ও অভিধম্ম পিটকের অট্ঠকথা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দাও।
৩. অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্তের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।
৪. অট্ঠকথাচার্য ধর্মপালের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'অট্ঠ' শব্দের বাংলা কী ?

ক. অতীত খ. অর্থ

গ. অষ্ট ঘ. অথৈ

২। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা পরিলক্ষিত হয় না, কারণ–

i ধর্মপালন সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল

ii তাঁদের সকলের সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার ছিল

iii সকল সুযোগ-সুবিধা একই ছিল

২০২১

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

রমেশ তালুকদার ত্রিপিটকের একটি গ্রন্থ পড়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় শীলের ব্যাখ্যা জানতে পারেন। যাতে ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা থেকে শুরু করে নৈতিক চরিত্র গঠনের নিয়মসমূহ নিহিত ছিল।

৩। **রমেশ তালুকদারের পঠিত বিষয়গুলো কোন গ্রন্থে নিহিত ?**

ক. পরিবার পাঠ খ. খন্ধক

গ. সুত্ত বিভঙ্গ ঘ. ভিক্ষুণী বিভঙ্গ

৪। **উক্ত গ্রন্থ পাঠ করে জানা যায় –**

i ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিধিবিধান

ii বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা

iii ত্রিপিটকের পরিচিতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

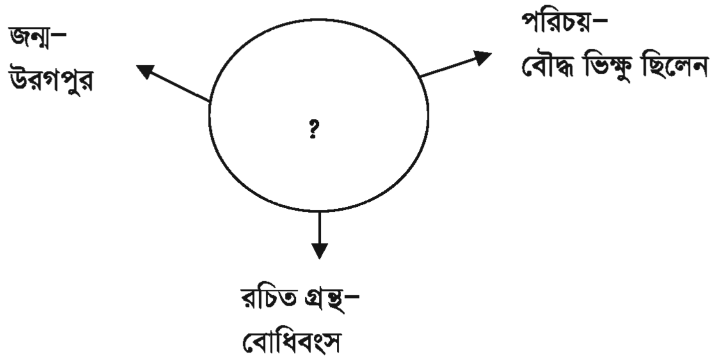

২০২১

ক. গুরুত্ব বিচারে অট্ঠকথাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় ?

খ. অট্ঠকথা বলতে কী বোঝায় ? ব্যাখ্যা কর।

গ. '?' চিহ্নিত স্থানে পাঠ্য বইয়ের অট্ঠকথাচার্য কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উক্ত আচার্য বৌদ্ধ ধর্মের সাহিত্যকর্মে অশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন" – তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত ? যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ কর।

২। অমল চাকমা একজন গ্রন্থপ্রণেতা। গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে তিনি অনেক সুনাম অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সংসারধর্ম পালনে উদাসীন হওয়ায় তিনি গভীর সাধনা করে প্রব্রজ্যা জীবন গ্রহণ করেন।

ক. কঙ্খাবিতরণী গ্রন্থটি কে রচনা করেন ?

খ. বৌদ্ধধর্মে অট্ঠকথার গুরুত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

গ. অমল চাকমার সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের কার কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত আচার্যের প্রব্রজ্যা লাভের কাহিনীটি ধর্মীয় আলোকে মূল্যায়ন কর।

সপ্তম অধ্যায়

নির্বাণ

জীবের জীবন জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং কার্যকারণ সম্বন্ধসঞ্জাত। যেখানে জন্ম-মৃত্যু বা কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে সেখানে দুঃখ বার বার আঘাত হানে। নির্বাণ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলমুক্ত, কার্যকারণ প্রবাহ রুদ্ধ এবং দুঃখমুক্ত এক সুখকর অবস্থা। নির্বাণ এক অলৌকিক অবস্থা, যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। নির্বাণ কারণসম্ভূত নয় বিধায় অবিনশ্বর। নির্বাণ লাভের পর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। ফলে দুঃখও ভোগ করতে হয় না। তাই বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ। নির্বাণ তথাগত বুদ্ধ আবিষ্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। পণ্ডিত ও দার্শনিক সমাজে বুদ্ধের এই তত্ত্ব ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রদীপ যেমন অন্ধকার বিদূরিত করে সর্বদিক আলোকিত করে তেমনি তথাগত বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্ব যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষের মনের কালিমা দূর করে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে আসছে। অসংখ্য মানুষের তৃষ্ণা নির্বাপিত করে দুঃখ নিবৃত্তি করে আসছে। অতএব বলা যায়, নির্বাণের গুরুত্ব অপরিসীম। এই অধ্যায়ে আমরা নির্বাণ সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

* নির্বাণের ধারণা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব;
* নির্বাণসাধনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

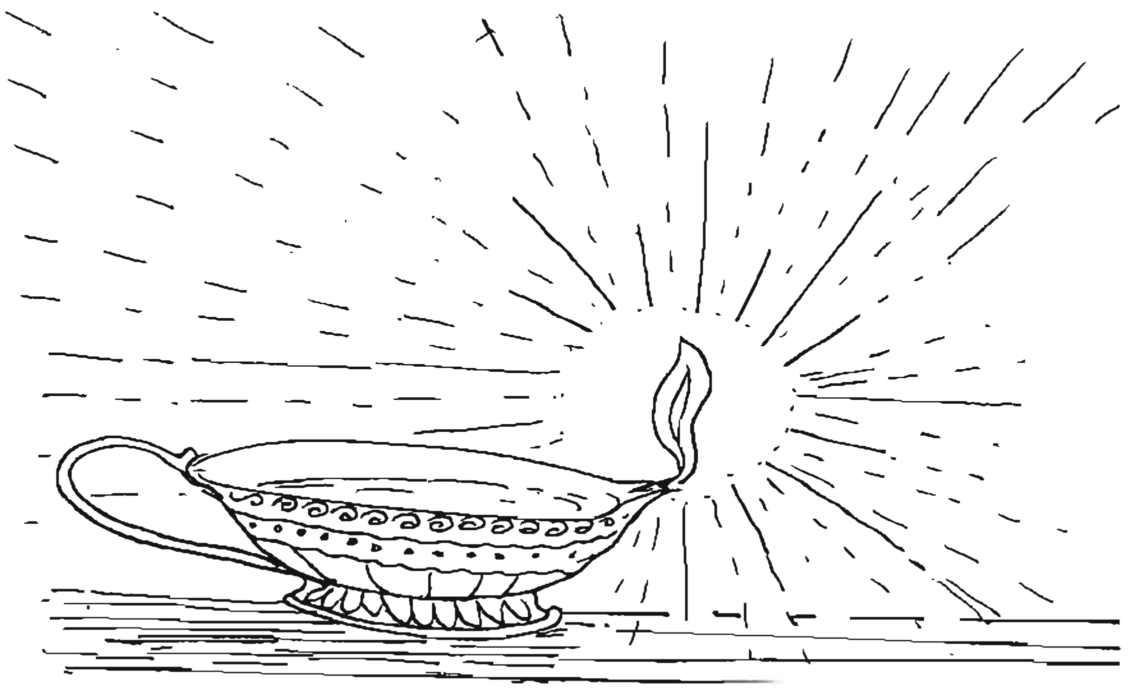

প্রজ্বলিত প্রদীপ অন্ধকার বিদূরিত করছে

পাঠ : ১

নির্বাণের ধারণা

নির্বাণ শব্দের অর্থ 'নির্বাপিত হওয়া'। 'নি' উপসর্গের সঙ্গে 'বাণ' শব্দটি যুক্ত হয়ে 'নির্বাণ' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে। 'নি' উপসর্গটি অভাব, নাই, ক্ষয়, শেষ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'বাণ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ধনুকের তীর। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তৃষ্ণা বোঝাতে 'বাণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অতএব, 'নির্বাণ' বলতে তৃষ্ণার ক্ষয় বোঝায়। আমাদের মনে রাগ, ঈর্ষা, মোহ, লোভ, ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রবৃত্তির উৎপত্তির কারণ হচ্ছে তৃষ্ণা বা কামনা। তৃষ্ণার কারণেই মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করে। যিনি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন তিনি তৃষ্ণামুক্ত হন। তাঁর তৃষ্ণাজাত রাগ-দ্বেষ-মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়। তাঁর জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ নিরুদ্ধ হয়। ফলে তিনি সর্বপ্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হন। অতএব, যে-ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে তৃষ্ণার ক্ষয় হয়, রাগ-দ্বেষ-মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ বা কার্যকারণ নিরুদ্ধ হয় এবং সর্ব প্রকার দুঃখের নিরোধ হয় তারই নাম নির্বাণ। সংক্ষেপে, যাবতীয় দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি হওয়াকে 'নির্বাণ' বলে। তাই বলা হয়, 'নিব্বাণং পরমং সুখং' অর্থাৎ 'নির্বাণ পরম সুখ'।

নির্বাণ এক লোকোত্তর অভিজ্ঞতা। সাধারণ উপলব্ধি বা ভাষা দিয়ে নির্বাণের প্রাপ্তি 'পরম সুখ' বুঝতে পারা সম্ভব নয়। ধরা যাক কোনো ব্যক্তি জীবনে কখনো 'মিষ্টি' খায়নি। তাকে 'মিষ্টি'র স্বাদ কি শুধু বর্ণনা দিয়ে বোঝানো সম্ভব? অনুরূপভাবে নির্বাণ-এর প্রকৃত অবস্থা সাধারণের পক্ষে বোঝা কঠিন। যেমন—কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজ চেষ্টায় হিমালয় পর্বতে আরোহণ করা সম্ভব কিন্তু হিমালয় পর্বত নিয়ে এসে অন্যদের দেখানো অসম্ভব। একইভাবে সাধনার দ্বারা বুদ্ধ নির্দেশিত মার্গ অনুসরণ করে পরম প্রাপ্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ সম্ভব কিন্তু এর অনির্বচনীয় স্বাদ সাধারণকে বোঝানো সম্ভব নয়। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে ন্যূনপক্ষে স্রোতাপত্তি ফল অর্জন না করলে নির্বাণের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না।

নির্বাণ সহজবোধ্য না হলেও বুদ্ধ নির্বাণ লাভের উপায় প্রদর্শন করেছেন। বিভিন্ন সময়ে শিষ্যদের ধর্ম দেশনার মাধ্যমে তিনি নির্বাণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন,

বিঞ্ঞাণস্স নিরোধের তণহাক্খয় বিমুক্তিনো,

পজ্জোতস্সেব নিব্বাণং বিমোক্খ হোতি চেতসো।

অর্থাৎ জ্বলন্ত আগুন নিভে যাওয়ার মতো তৃষ্ণা ক্ষয় পায়। বিমুক্ত পুরুষের বিজ্ঞান নিরোধের সাথে সাথে তাঁর চিত্ত মোক্ষবোধ (বা মুক্তি) লাভ করে। এতে সেই বিমুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হয়। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বুদ্ধ আরও বলেছেন,

যো, ইমস্মিং ধম্ম বিনযে অপ্পমত্তো বিহেস্সতি;

পহায জাতি সংসারং দুক্খস্স'ন্তং করিস্সতী তি।

অর্থাৎ যিনি এই (বুদ্ধ-প্রদর্শিত) ধর্ম ও বিনয়ে অপ্রমত্ত হয়ে বিচরণ করবেন, তিনিই জন্ম এবং সংসারের চক্র অতিক্রম করে দুঃখের অন্ত সাধন করতে পারবেন।

নির্বাণ অনুধাবনের জন্যে এখানে একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া হলো : প্রদীপ জ্বলতে তেল, মোম, সলতে ইত্যাদি উপাদান প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ উপাদানসমূহের সরবরাহ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ প্রদীপ জ্বলতে থাকবে। একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ এভাবে অসংখ্য প্রদীপ জ্বালানো যায়। কিন্তু প্রদীপ প্রজ্বলনের উপাদানসমূহ ক্ষয় বা নিঃশেষ হলে প্রদীপ নির্বাপিত হবে। অনুরূপভাবে মানবজীবনকে প্রদীপের সাথে তুলনা করা যায়। লোভ, দ্বেষ, মোহ, কামনা-বাসনা, রাগ-অনুরাগ, মায়া এসব তৃষ্ণাজাত প্রবৃত্তির কারণে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে। এসমস্ত উপাদান ক্ষয় করা হলে দুঃখের কারণ জন্মনিরোধ বা নির্বাণ লাভ সম্ভব।

অনুশীলনমূলক কাজ
'নির্বাণ' শব্দের অর্থ কী?
কে নির্বাণ লাভ করতে পারেন?

পাঠ : ২
নির্বাণের প্রকারভেদ ও বর্ণনা

নির্বাণের প্রকারভেদ :

নির্বাণ দুই প্রকার। যথা :

১. সোপাদিসেস নির্বাণ।
২. অনুপাদিসেস নির্বাণ।

১. সোপাদিসেস নির্বাণ :

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়। পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধকপুরুষ নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করলে তাকে বলে সোপাদিসেস নির্বাণ। জীবিত অর্হৎ সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন। তিনি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, তৃষ্ণামুক্ত হন, কিন্তু জীবিত থাকেন বিধায় জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রহিত নন। তবে বর্তমান জন্মই তাঁর শেষ জন্ম। তিনি চতুরার্য সত্য সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে ধ্যান-সমাধি দ্বারা সাধনার মাধ্যমে মার্গফল লাভ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ছয় বছর কঠোর সাধনার দ্বারা গয়ার বোধিবৃক্ষমূলে দুঃখ ও তৃষ্ণার ক্ষয় করে গৌতম বুদ্ধ যে-নির্বাণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার নাম সোপাদিসেস নির্বাণ।

২০২১

২. অনুপাদিসেস নির্বাণ :

নির্বাণদর্শী মুক্ত পুরুষ পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ করে যখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তখন তাকে বলে অনুপাদিসেস নির্বাণ। এ নির্বাণ হলো সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হওয়া। এ নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুনরায় প্রজ্বলিত হবেন না। অর্থাৎ তিনি আর জন্মগ্রহণ করবেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন। এ-প্রকার নির্বাণের কোনো পরিণাম নেই, এ-অবস্থা বর্ণনাতীত। এতে সুখ-দুঃখের উপশম হয়। সুখ-দুঃখের উপশমই পরম সুখ। অনন্ত সংসার প্রবাহের এখানেই অবসান হয়। এজন্যেই বুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, 'নিব্বানং পরমং সুখং' অর্থাৎ নির্বাণই পরম সুখ।

আচার্য নাগার্জুন নির্বাণের নিম্নরূপ ব্যাখ্যাপ্রদান করেছেন :

অপ্রতীতম্ অসম্প্রাক্তম্ অনুচ্ছিন্নম্ অশাশ্বতম্,
অনিরুদ্ধম্ অনুৎপন্নম্ এব নিব্বানং উচ্যতে।

অর্থাৎ চরম বিজ্ঞান নিরোধের পর চিত্তসন্ততির যে-অবস্থা হয়, তা প্রতীতির অতীত। কোনো প্রকারে লভ্য নহে। কোনো শাশ্বত পদার্থের উচ্ছেদও নহে। অথবা ভঙ্গুর অবস্থায় শাশ্বতভাব প্রাপ্তি নহে। এর বিনাশ নেই, যেহেতু উৎপত্তি হয় নাই। এসকল লক্ষণযুক্ত অবস্থাকে অনুপাদিসেস নির্বাণ বলে।

উদাহরণস্বরূপ, বুদ্ধত্বলাভের পর গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ধর্মপ্রচার করেন। তারপর আশি বছর বয়সে কুশীনগরের যমক শাল বৃক্ষের নিচে এই অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেছিলেন।

নির্বাণের বর্ণনা :

নির্বাণের স্বরূপ বুঝতে হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব রকম জীব ও জড় বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। কেননা প্রত্যেক জীব ও জড়বস্তুতে আছে ভিন্ন ভিন্ন গুণের সমাবেশ। আবার এই গুণাবলি স্থির বা শাশ্বত নয়, নিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতা কখনো সুখকর নয়, বরং দুঃখময়। মানুষের দেহ ও মন কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সেজন্য আত্মার চিরস্থায়ী অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, সংসার অনিত্য, দুঃখময় এবং অনাত্ম। তাই তিনি এই দুঃখময় সংসারচক্র থেকে বিপথগামী চঞ্চল চিত্তকে সংযত করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কীভাবে তা সম্ভব? বুদ্ধের নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা, ব্রহ্মচর্য পালন এবং ধ্যান-সমাধির অনুশীলনই হলো চিত্ত সংযমের প্রধান উপায়।

নির্বাণের স্বরূপ সম্পর্কে 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নির্বাণ অনিবর্চনীয়, তুলনাবিহীন। স্থান-কাল-পাত্র, যুক্তি, প্রমাণ, কিংবা উপমা দ্বারা নির্বাণ প্রকাশযোগ্য নয়। নির্বাণ শান্ত সুখদায়ক। ধর্মপদ গ্রন্থে নির্বাণ সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ আছে –

আরোগ্য পরমা লাভা, সন্তুট্ঠি পরমং ধনং,
বিস্সাস পরমাঞাতি, নিব্বানং পরমং সুখং।

অর্থাৎ আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ।

গাথায় বর্ণিত এই পরম সুখই সকল মানুষের কাম্য। কিন্তু সুখ পেতে হলে দুঃখকে নির্মূল করা প্রয়োজন। দুঃখ নির্মূল করার উপায় কী? নির্বাণ লাভ করাই এর একমাত্র উপায়। কারণ নির্বাণে দুঃখ সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়,

২০২১

আসে মুক্তি। এই মুক্তির জন্যই সিদ্ধার্থ গৌতম কঠোর সাধনা করেছিলেন। সাধনার শেষে সিদ্ধিলাভ করে তিনি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছিলেন।

এখন আমরা গৌতম বুদ্ধ বর্ণিত 'নির্বাণ পরম সুখ' কথাটির অর্থ বোঝার চেষ্টা করব। মজ্ঝিম নিকায়ের 'অরিয়পরিয়েসন' সূত্রে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ''আমি স্বয়ং জন্ম, জরা, ব্যাধি, শোক ইত্যাদির পরিণতি উপলব্ধি করেছি। এগুলো থেকে অজন্ম , অব্যাধি, অমৃত্যু, অশোক (শোকহীনতা), অক্লেশ ইত্যাদি জেনে নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছি।'' অর্থাৎ নির্বাণ লাভের মাধ্যমে তিনি সব দুঃখের অবসান ঘটিয়েছেন। সুতরাং নির্বাণ হচ্ছে সকল দুঃখের অন্তসাধন অবস্থা। নির্বাণ পরম শুভ।

বিশ্বের সকল বস্তু সংস্কৃত ও অসংস্কৃত ভেদে দুরকম। যেসব বস্তুর কার্যকারণ আছে ও পরিবর্তনশীল তা সংস্কৃত। যেসব বস্তুর হেতু বা কার্যকারণ নেই তা হলো অসংস্কৃত, নির্বাণও অসংস্কৃত, অর্থাৎ কার্যকারণরহিত। এর পরিবর্তন নেই। নির্বাণ শান্ত এবং শাশ্বত। সকল পার্থিব বস্তুর অস্থায়িত্ব বা পরিবর্তনশীলতা দুঃখময়। কিন্তু নির্বাণের আনন্দের স্থায়িত্ব অবিনশ্বর। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, 'নির্বাণ পরম সুখ'। নির্বাণ কারণহীন। এর উৎপত্তি বা বিলয় কোনোটিই নেই। নির্বাণ ধ্রুব, নির্বাণ পরম সুখকর। এজন্য যা কিছু দৃষ্টিগোচর বা অদৃশ্য অথবা কল্পনা-বহির্ভূত তাদের মধ্যে নির্বাণ সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের সাধনার মধ্যে এর চেয়ে উত্তম কাম্য আর কিছুই নেই। এজন্যই ধ্যানী ও বিজ্ঞ পুরুষ নির্বাণলাভের জন্য নিরলস সাধনায় প্রবৃত্ত হন।

বৌদ্ধ ধর্ম যুক্তির ধর্ম, জ্ঞানের ধর্ম এবং জ্ঞানীর ধর্ম। জ্ঞানীর দ্বারাই নির্বাণলাভ সম্ভব হয়। এজন্যে সম্যক জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর গুণাগুণ সম্পূর্ণরূপে জানতে হয়। বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে সংস্কারসমূহ বিনাশ করতে হয়। বস্তুগুণাগুণ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলে তবেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। প্রজ্ঞা ও ধ্যান ছাড়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়। 'ধর্মপদ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে,

> 'নত্থি ঝানং অপঞ্ঞস্স পঞ্ঞা নত্থি অঝাযতো,
> যম্হি ঝানঞ্চ পঞ্ঞা চ স বে নিব্বানসন্তিকে।'

অর্থাৎ যার প্রজ্ঞা নেই তার ধ্যান হয় না। যার ধ্যান নেই তার প্রজ্ঞা লাভ হয় না। যাঁর প্রজ্ঞা এবং ধ্যান দুই-ই আছে তিনি নির্বাণের নিকটে অবস্থান করেন।

সুতরাং শীলবান ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু কিংবা বিজ্ঞ লোককে প্রথমে সাধনার দ্বারা দ্বেষ-মোহহীন হতে হয়। তারপর তিনি সাধনা করে নিস্পৃহ, নিরুপদ্রব, নির্ভয় কল্যাণকামী হবেন। ফলে তাঁর পক্ষে নির্বাণ উপলব্ধি করা সম্ভব।

অনুশীলনমূলক কাজ

নির্বাণের প্রকারভেদ আলোচনা কর (দলীয় কাজ)

পাঠ : ৩
নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা

লোভ, দ্বেষ, কামনা, বাসনার কারণে সৃষ্ট অকুশল কর্ম থেকে বিরত হয়ে কুশল কর্মের মাধ্যমে শান্তিময় জগৎ নির্মাণ এবং জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুঃখময় জীবনপ্রবাহ থেকে মুক্তিলাভের জন্যে নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জগৎ দুঃখময়। তৃষ্ণা থেকে দুঃখের উৎপত্তি। তৃষ্ণার কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যার কারণে মানুষ অকুশল চেতনার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন প্রকার অপকর্মে লিপ্ত হয়। এতে অজ্ঞানী মানুষ নিজের ক্ষতি যেমন করে অন্যদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে সংসার ও জগতে শান্তি বিঘ্নিত হয়। নির্বাণ সাধনায় রত ব্যক্তিকে সবসময় কুশল কর্ম করতে হয়। চারি আর্যসত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করে দুঃখের কারণ তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয়। অক্লান্ত সাধনায় লোভ-দ্বেষ-মোহহীন হয়ে অবিদ্যা দূর করতে হয়। অবিচ্ছিন্ন নির্বাণসাধনায় তিনি নির্ভয় ও কল্যাণকামী হন। ফলে তিনি নিজের ও সকলের কল্যাণ সাধন করেন এবং জগৎ-সংসারের সর্ব প্রকার মঙ্গলের কারণ হন। অপরের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা, অহংকার ইত্যাদি ত্যাগ করেন। আত্মসংযম অনুশীলন করেন। সকলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হন। নির্বাণ সাধনা এভাবেই নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই সকলের নির্বাণসাধনা করা উচিত। স্বল্প সময় বা স্বল্প চেষ্টায় নির্বাণলাভ সম্ভব নয়। এজন্য কঠোর অনুশীলন করতে হয়।

'নির্বাণ' বুঝতে এবং বোঝাতে কষ্টকর হলেও মানুষের পক্ষেই নির্বাণলাভ সম্ভব। বুদ্ধ বলেছেন মানবজন্ম দুর্লভ। কারণ মানুষের বিবেক আছে। মানুষ ভাল মন্দ বিচার করতে পারে। কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মানবজন্ম লাভ করতে হয়। দেবতারা শুধু সুখ ভোগ করে। প্রেতরা শুধু দুঃখ ভোগ করে। পশু-পাখিরা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। একমাত্র মানুষই এ-জগতে দুঃখ এবং সুখ উভয় প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। জগতে মানুষের পক্ষে কুশল কাজ করা সম্ভব। মানুষ অপেক্ষা ইতর প্রাণীর জীবনধারণ কষ্টকর ও অনিশ্চিত, অকুশল কর্ম করলে ইতর প্রাণীরূপে জন্ম নিতে হবে। নির্বাণ লাভের ইচ্ছা ও চেতনা মনে জাগ্রত করে কুশলকর্ম সম্পাদন করলে ইতর কুলে জন্মের সম্ভাবনা ব্যাহত হয়। এজন্য 'নির্বাণ' সাধনা করা উচিত।

নির্বাণ বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত। পরম সুখ নির্বাণ লাভের জন্য জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী কুশল কর্ম করে পুণ্যফল অর্জন করতে হয়। চারি আর্যসত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানপ্রাপ্ত হতে হয়। অনুসরণ করতে হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করলে নির্বাণের পথে প্রবেশ সম্ভব। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষকে সৎ পথে চলতে নির্দেশনা দেয়। বলা হয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, জ্ঞানীর ধর্ম, কাজেই জ্ঞানী ব্যক্তিই প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করেন যে জগৎ দুঃখময়। তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। তৃষ্ণার ফলেই বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্ম নিলেই জরা, ব্যাধি, প্রিয়বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ, মৃত্যু ইত্যাদি বিবিধ প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয়। তৃষ্ণা থেকে মুক্তি লাভ করা সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্যই জ্ঞানী ব্যক্তির নির্বাণ সাধনা করা প্রয়োজন।

২০২১

অনুশীলনমূলক কাজ

নির্বাণ সাধনার জন্য কী কী অনুশীলন করতে হয়?

নির্বাণ সাধনার মাধ্যমে কীভাবে সুন্দর জীবন গঠন করা যায়? যুক্তিসহকারে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর (অর্পিত কাজ)

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. নির্বাণ এক .... অবস্থা।

২. নির্বাণ তথাগত বুদ্ধ .... অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব।

৩. নির্বাণ এক .... অভিজ্ঞতা।

৪. একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ এভাবে অসংখ্য .... জ্বালানো যায়।

৫. যার ধ্যান নেই তার .... লাভ হয় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নির্বাণ শব্দটির অর্থ কী ?

২. অনুপাদিসেস নির্বাণ বলতে কী বোঝ ?

৩. সোপদিসেস নির্বাণ-এর বৈশিষ্ট্য কী ?

৪. ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ গ্রন্থে নির্বাণ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. নির্বাণ সম্পর্কে তোমার ধারণা আলোচনা কর।

২. ‘নির্বাণ বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত’ — ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নির্বাণ কী ?

ক. জাগতিক জ্ঞান খ. আকাঙ্ক্ষা রোধ

গ. চিত্তের সুখ ঘ. তৃষ্ণার ক্ষয়

২০২৫

২। **বিমুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম সম্পূর্ণরূপে নিরোধের কারণ —**

i. তৃষ্ণার ক্ষয় করা

ii. চিত্তমুক্তি লাভ করা

iii. লোভ, দ্বেষ, মোহ ধ্বংস করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

ধর্মপুর আর্যবিহারের বিহারাধ্যক্ষ কল্যাণশ্রী মহাস্থবির সুপরিকল্পিতভাবে বিহার পরিচালনা করেন বিধায় তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সাধনার দ্বারা সম্যক সম্বুদ্ধের প্রদর্শিত ধর্ম ও বিনয়ে অপ্রমত্ত হয়ে বিচরণ করেন এবং এক পর্যায়ে তিনি পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

৩। **কল্যাণশ্রী মহাস্থবির গৌতম বুদ্ধের কোন নির্বাণ জ্ঞান উপলব্ধি করেন ?**

ক. প্রাপ্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ

খ. সোপাদিসেস নির্বাণ জ্ঞান

গ. অনুপাদিসেস নির্বাণ জ্ঞান

ঘ. সোপাদিসেস ও অনুপাদিসেস নির্বাণ

৪। **উক্ত নির্বাণ জ্ঞান লাভের দ্বারা সম্ভব–**

i. জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ নিরোধ করা

ii. পঞ্চ ইন্দ্রিয়সমূহের দমন করা

iii. দুঃখ ও তৃষ্ণা বিনাশ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. i ও ii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। অনিল বিকাশ চাকমা একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। গৃহীজীবনে বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক পড়ে বুদ্ধের সুত্ত, বিনয় ও ধর্মনীতি বিষয়ে বিশদভাবে বুঝতে পারলেন। তাই তিনি সংসারের মায়া ত্যাগ করে বিহারে ভন্তের নিকট প্রব্রজ্যিত হলেন। প্রথমে তিনি ধর্ম প্রত্যক্ষ করে তৃষ্ণার ক্ষয়, রাগ-দ্বেষ-মোহ নির্বাপিত করা; জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ রোধ ইত্যাদি বিষয়ে জাগতিক জ্ঞান অর্জন করেন। শ্রমণ থেকে ভিক্ষুত্বে উপনীত হয়ে তিনি ত্রিপিটক গ্রন্থের জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধের 'নিব্বানং পরমং সুখং'–এই বাণীটি বুঝতে সক্ষম হলেন।

ক. তৃষ্ণা থেকে কী উৎপত্তি হয় ?
খ. আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয় কেন ? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
গ. অনিল চাকমা শ্রমণ অবস্থায় বুদ্ধের কোন তত্ত্ব বুঝতে পারলেন ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ভিক্ষুত্ব লাভের পর অনিল চাকমার অর্জিত শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২। ভিক্ষু সম্মেলনের এক দেশনায় শ্রদ্ধেয় ধর্মকীর্তি স্থবির বললেন, "প্রথমত ধর্মপদ গ্রন্থে নির্বাণ সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ" আছে — 'আরোগ্য পরমা লাভা, সন্তুট্ঠি পরমং ধনং
বিস্সাস পরমাঞাতি, নিব্বানং পরমং সুখং।"

বুদ্ধ বলেছেন—"মানবজন্ম দুর্লভ। মানুষের বিবেক আছে। ভালোমন্দ বিচার করে কুশলকর্ম সম্পাদন করে মানব জন্ম হয়।"

ক. গৌতম বুদ্ধ কত বছর যাবৎ ধর্ম প্রচার করেন ?
খ. নির্বাণ লাভের পর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না কেন ?
গ. ধর্মকীর্তি স্থবির তাঁর দেশনায় কোন ধরনের নির্বাণের ইঙ্গিত করেছেন – ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বুদ্ধের দেশনায় নির্বাণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

সঙ্গীতি

বৌদ্ধ সঙ্গীতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সঙ্গীতি সম্পর্কে জ্ঞান ব্যতীত বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। বুদ্ধ লিখিত আকারে কোনো ধর্মোপদেশ দেননি। তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব ধর্মোপদেশ করতেন তা তাঁর শিষ্যগণ স্মৃতিতে নিখুঁতভাবে ধারণ করে রাখতেন এবং মৌখিকভাবে প্রচার করতেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর শিষ্যগণ সেসব ধর্মোপদেশ সঙ্গীতি আহ্বানের মাধ্যমে প্রথমে সংকলন করেন। তারপর স্বধর্মের অনুসারী মহাকারুণিক ভিক্ষুগণ বিভিন্ন সময় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংকলিত বুদ্ধবাণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা, গ্রন্থাকারে ও নানা উপায়ে সংরক্ষণ এবং প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির ভূমিকা অনন্যসাধারণ। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধ সঙ্গীতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

* সঙ্গীতির ধারণা ও পটভূমি বর্ণনা করতে পারব;
* সঙ্গীতির মাধ্যমে বুদ্ধবাণী কীভাবে সংকলিত হয়েছিল তার ধারণা দিতে পারব;
* প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব;
* বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ : ১

সঙ্গীতির ধারণা

অভিধানে 'সঙ্গীতি' শব্দের বিভিন্নরকম অর্থ পাওয়া যায়। যেমন : সঙ্গীত, গান, পাখির কূজন, প্রচার, ঘোষণা, পূর্বাভিনয় বা মহড়া, সভা বা সম্মেলন এবং সমবেতভাবে উচ্চারণ, আবৃত্তি, গীত, পুনরায় শ্রবণ বা বিবেচনা করা ইত্যাদি। বিভিন্ন রকম অর্থ পাওয়া গেলেও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীতি শব্দটি সভা বা সম্মেলন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বুদ্ধের জীবিতকালে তাঁর ধর্ম-দর্শন এবং সঙ্ঘের বিধিবিধানসহ যে-কোনো বিষয়ে বিতর্ক বা সমস্যা দেখা দিলে তা বুদ্ধ নিজে বা তাঁর নির্দেশনায় নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ সমাধান করতেন। কিন্তু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর এরূপ সকল সমস্যা পণ্ডিত ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হয়ে সভা বা সম্মেলন আহ্বানের মাধ্যমে সমাধান করতেন। জানা যায় যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধ ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন মীমাংসা, প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ, সংকলন, সংরক্ষণ, বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং প্রচার-প্রসারের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতি নামে পরিচিত। অতএব সংক্ষেপে বলা যায়, সঙ্গীতি হলো ভিক্ষুসঙ্ঘের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী সভা বা সম্মেলন। এসব সভায় শত শত প্রবীণ, জ্ঞানী এবং অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত থাকতেন। আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে এসব সম্মেলন কয়েকমাস ব্যাপী চলতো।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা বুদ্ধবাণী পণ্ডিত বুদ্ধশিষ্যগণ এক সঙ্গীতি আহ্বান করে একত্রে সংকলন করেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তা প্রথম সঙ্গীতি নামে পরিচিত। প্রথম সঙ্গীতিতে সংকলিত বুদ্ধবাণী ভিক্ষুগণ স্মৃতিতে ধারণ করে মৌখিকভাবে প্রচার করতেন। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত বুদ্ধবাণী এভাবে প্রচার করা হতো। মুখে-মুখে প্রচারিত হওয়ায় বা গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ বা লিপিবদ্ধ না হওয়ায় বুদ্ধবাণী নিয়ে মাঝে মাঝে বিতর্ক দেখা দিত। এ ছাড়া, নানা কারণে বুদ্ধবাণী বিকৃতি ও পরিহানির সম্মুখীন হতো এবং সঙ্ঘের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হতো। ভিক্ষুসঙ্ঘ সঙ্গীতি আহ্বানের মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধান করে বুদ্ধবাণী যথাযথভাবে রক্ষা করতেন। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম। কিংবদন্তি অনুসারে নয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা জানা যায়। তবে সঙ্গীতির সংখ্যা, অনুষ্ঠানের সময়কাল ও স্থান সম্পর্কে বিতর্ক লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন যে, সর্বমোট ছয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি সঙ্গীতি ভারতবর্ষে, চতুর্থটি সিংহলে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠটি মিয়ানমারে (বার্মায়) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কোনো কোনো সিংহলি (শ্রীলঙ্কার) তথ্য মতে, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিংহলে। তা ছাড়া, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতি নিয়েও বিতর্ক আছে। যেমন, দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর মহাসাঙ্ঘিকদের তত্ত্বাবধানে এক সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা জানা যায়। কিন্তু তা থেরবাদী গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় যে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা মহাযান সূত্রে উল্লেখ নেই। মহাযান মতে, তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশ্মীরের জলন্ধরে। থাইল্যান্ডের কিংবদন্তি মতে, প্রথম তিনটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমটি সিংহলে এবং অষ্টম ও নবম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল থাইল্যান্ডে। মহাবংস মতে, প্রথম তিনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে, চতুর্থ ও পঞ্চম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিংহলে। নানা বিতর্ক থাকলেও থেরবাদী বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন, প্রথম তিনটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে, চতুর্থটি সিংহলে, পঞ্চম এবং ষষ্ঠটি মিয়ানমারে (বার্মায়)। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এই ছয়টি সঙ্গীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বুদ্ধবাণী সংকলন এবং অদ্যাবধি বিশুদ্ধভাবে তা সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে এ ছয়টি সঙ্গীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এগুলোকে মহাসঙ্গীতিও বলা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

সঙ্গীতি বলতে কী বোঝ?

কিংবদন্তি অনুসারে মোট কয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

পাঠ : ২
সঙ্গীতির উদ্দেশ্য ও পটভূমি

ছয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। বুদ্ধবাণী সংকলন এবং বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করাই সঙ্গীতিসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এক এক সঙ্গীতির পটভূমি এক এক রকম। প্রথম সঙ্গীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর সুভদ্র নামক এক দুর্বিনীত ভিক্ষুর আচরণে সকলে শঙ্কিত হন। হিউয়েন-সাং-এর ভ্রমণ-বিবরণী এবং তিব্বতি গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, অধিকাংশ দুর্বিনীত ভিক্ষুর অভিপ্রায় ছিল সুভদ্রের মতো। ফলে মহাকশ্যপ স্থবির এবং অন্যান্য

নেতৃস্থানীয় বিনয়ী ভিক্ষুরা বুদ্ধশাসনের পরিহানির কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাঁদের ধারণা, বুদ্ধের মৃতদেহ বর্তমান থাকতেই যদি এরূপ চিন্তা-চেতনার সূত্রপাত হয় তাহলে অচিরেই ভিক্ষুসঙ্ঘ বিনয়চ্যুত হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। বুদ্ধবাণী কলুষিত হবে। বিস্মৃত হয়ে হারিয়ে যাবে। ফলে বুদ্ধশাসন পরিহানির সম্মুখীন হবে। এরূপ চিন্তা করে ধর্ম-বিনয়ে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুগণ বিভিন্ন বুদ্ধশিষ্য কর্তৃক স্মৃতিতে ধারণকৃত বুদ্ধবাণীসমূহ একত্রে সংকলন করে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। অতপর, বুদ্ধবাণী সংকলন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বছর পর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ সঙ্ঘে বিনয় বহির্ভূত দশটি বিধিবিধান চালু করেন। এ দশটি বিধি-বিধানকে 'দসবত্থুনী' বলা হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতি অধ্যায়ে আমরা দশবত্থুনী সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ব। বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রবর্তিত দসবত্থুণী বিনয় সম্মত কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে বৈশালীর বালুকারামে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

তৃতীয় সঙ্গীতির ইতিহাস সমীক্ষায় দেখা যায়, সম্রাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে। তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার বেড়ে যায় এবং তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। ফলে অন্যান্য ধর্মের বহু তীর্থিক বা সন্ন্যাসী লাভ-সৎকারের আশায় মস্তক মুণ্ডন এবং পাত্র-চীবর ধারণ করে ভিক্ষু বলে পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁরা অসদুপায় অবলম্বনপূর্বক বিহার ও মন্দির দখল করে বসবাস করতে থাকেন। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন। এতে সঙ্ঘে যেমন অরাজকতা দেখা দেয় তেমনি প্রকৃত বুদ্ধবাণী নিয়েও সংশয় সৃষ্টি হয়। প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ এবং সঙ্ঘে বিরাজমান অরাজকতা বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে পাটলীপুত্রের অশোকারাম বিহারে তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

চতুর্থ সঙ্গীতির ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক-পুত্র মহেন্দ্র থের ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রার মাধ্যমে শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভারতীয় তামিলরা শ্রীলঙ্কা দখল করে শাসন করতে থাকে। তারা বৌদ্ধ বিহার ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে থাকে। তাদের সঙ্গে সিংহলিদের সবসময় যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। অবশেষে সিংহলিদের সহায়তায় রাজা বট্টগামণী তামিলদের বিতাড়িত করে শ্রীলঙ্কার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাজা বট্টগামণীর সুশাসনে শান্তি ফিরে আসতে থাকে এবং বৌদ্ধধর্ম নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকার কারণে সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যুদ্ধবিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষের মধ্যে ভোগবাদী মনোভাব সৃষ্টি হতে থাকে এবং মানুষ নীতিজ্ঞান হারাতে থাকে। বারবার বিদেশী আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম পরিহানির সম্মুখীন হতে থাকে। তাছাড়া, মহাবিহার ও অভয়গিরি নিকায়ের দ্বন্দ্বের কারণে সঙ্ঘে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। সঙ্ঘে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অধার্মিক ভিক্ষুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বহু অর্হৎ ভিক্ষু থাকলেও স্মৃতিতে ত্রিপিটক ধারণ করে রাখা ভিক্ষু সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকে। এসব কারণে মৌখিকভাবে প্রচলিত বুদ্ধবাণীর বিকৃতি ও পরিহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। অতপর রাজা বট্টগামণীর পৃষ্ঠপোষকতায় অট্ঠকথাসহ সমস্ত বুদ্ধবাণী তথা ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করে চিরস্থায়িত্ব দানের উদ্দেশ্যে সিংহলের আলু বিহারে (মতান্তরে আলোক বিহার) চতুর্থ সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল। আলু বিহারে এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে এ সঙ্গীতিকে আলুবিহার সঙ্গীতিও বলে।

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে অনুষ্ঠিত এ সঙ্গীতিতে অট্ঠকথা সহ সমগ্র ত্রিপিটক তালপত্র বা ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে মিয়ানমারের রাজা মিণ্ডনমিনের রাজত্বকালে মান্দালয়ে পঞ্চম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপিটক তথা বুদ্ধবাণী মার্বেল পাথরে খোদাই করে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনের অনতিদূরে 'কাবা আয়ে বিশ্বশান্তি প্যাগোডায়' পঞ্চম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল। উক্ত সঙ্গীতিতে মান্দালয় পর্বতে ত্রিপিটক ৭২৯ খানা মার্বেল পাথরে খোদিত করা হয়।

ত্রিপিটক বিভিন স্থানে বিভিন্ন লোকের দ্বারা লিখিত ও খোদিত হতে থাকে। এতে লেখক ও খোদাইকারীর প্রমাদবশত বুদ্ধবাণী ভুলভাবে উপস্থাপিত হতে থাকে। তাছাড়া বিদেশী শাসনের কারণে সমাজে দলাদলি ও ধর্মীয় ব্যাপারে শৈথিল্য দেখা দেয়। বুদ্ধবাণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য বুদ্ধশাসনের উন্নতি এবং দেশবিদেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪-১৯৫৬ সালে মিয়ানমারে ষষ্ঠ সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। উক্ত সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক আবৃত্তি ও টেপ রেকর্ডে ধারণ করা হয়। এই সঙ্গীতিতে বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহ তুলনামূলক আলোচনা করে পুনর্মুদ্রণের জন্য খসড়া তৈরি করা হয়।

উপরে বর্ণিত ছয়টি মহাসঙ্গীতির প্রেক্ষাপট বা পটভূমি ভিন্ন ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য প্রায়ই অভিন্ন। পরিশুদ্ধভাবে বুদ্ধবাণী সংকলন, সংকলনের ও প্রচার করাই সঙ্গীতিসমূহের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুশীলনমূলক কাজ

সঙ্গীতির প্রধান উদ্দেশ্য কী ?

চতুর্থ সঙ্গীতির পটভূমি বর্ণনা কর

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সঙ্গীতি কোথায় এবং কী কারণে আহ্বান করা হয়েছিল?

পাঠ : ৩
প্রথম সঙ্গীতি

প্রথম সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ : প্রথম সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ সম্পর্কে কোনো মতানৈক্য নেই। কথিত আছে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় মহাকশ্যপ স্থবির কুশীনগরে ছিলেন না। তিনি পাবা থেকে কুশীনগর যাওয়ার পথে বুদ্ধের পরিনির্বাণের কথা জানতে পারেন। তিনি আরও শুনলেন যে, সুভদ্র নামক এক অবিনীত বৌদ্ধ ভিক্ষুর উক্তিতে পণ্ডিত ও বিনয়ী ভিক্ষুরা বুদ্ধশাসনের পরিহানি আশঙ্কা করে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। অনেক দুর্বিনীত ভিক্ষু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণে খুশি হন। কারণ বুদ্ধের অবর্তমানে তাঁরা যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন। মহাকশ্যপ স্থবির কুশীনগরে পৌঁছে দুর্বিনীত ভিক্ষুদের অভিপ্রায় শুনে বিস্মিত এবং শঙ্কিত হন। কারণ বুদ্ধ লিখিতভাবে কোনো ধর্মোপদেশ দান করেননি। তাঁর ধর্মোপদেশসমূহ শিষ্যগণ কণ্ঠস্থ করে প্রচার করতেন। মহাকশ্যপ স্থবির এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় বিনয়ী ভিক্ষুগণ চিন্তা করলেন, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকলে বা বিভিন্ন জন কর্তৃক কণ্ঠস্থ থাকলে বুদ্ধবাণী কলুষিত ও বিকৃত হতে পারে।

বিস্মৃত হয়ে হারিয়ে যেতে পারে। অন্যজনের বাণীও বুদ্ধবাণী হিসেবে প্রচারিত হতে পারে। এরূপ হলে বুদ্ধশাসনের পরিহানি ঘটবে। এসব চিন্তা করে মহাকশ্যপ স্থবির এবং ধর্ম-বিনয়ে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুগণ বুদ্ধবাণী সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই প্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

প্রথম সঙ্গীতির সময়কাল, স্থান ও পৃষ্ঠপোষকতা : প্রথম সঙ্গীতির সময় ও স্থান নিয়ে কিছুটা মতভেদ লক্ষ করা যায়। তবে অধিকাংশ বৌদ্ধ ঐতিহ্য মতে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা অজাতশত্রু এ-সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় গুহার সামনে বিশাল মণ্ডপ তৈরি করা হয় । এতে দক্ষিণমুখী ও উত্তরমুখী করে পাঁচশো স্থবিরের আসন সজ্জিত করা হয়। মণ্ডপের মধ্যভাগে পূর্বমুখী করে ধর্মাসন নির্মাণ করা হয়।

সঙ্গীতিকারক নির্বাচন : মহাকশ্যপ স্থবির সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম সঙ্গীতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এতে স্থির হয় যে সজ্জায়নে অংশগ্রহণকারী সকল ভিক্ষু অর্হৎ হবেন। অতঃপর, বৌদ্ধধর্মে পণ্ডিত পাঁচশো জন অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আনন্দ স্থবিরকে প্রথমে নির্বাচন করা হয় নি। কারণ তিনি তখনও অর্হত্বে উন্নীত হন নি। ফলে তাঁকে বাদ দিয়ে চারশো নিরানব্বই জন ভিক্ষু নির্বাচন করা হয়। কিন্তু তার জন্য একটি আসন খালি রাখা হয়। কারণ তিনি বুদ্ধের সেবক এবং শ্রুতিধর ছিলেন। বুদ্ধের সকল ধর্মোপদেশ তিনি ধারণ করে রাখতেন। তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে বুদ্ধশিষ্যগণ অবহিত ছিলেন এবং সকলে তাঁর উপস্থিতি কামনা করছিলেন। সঙ্গীতি আরম্ভের ঠিক আগে আনন্দ স্থবির অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। অতপর, তিনি ঋদ্ধিবলে সঙ্গীতি মণ্ডপে প্রবেশ করে নিজ আসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁকে নিয়ে পাঁচশো জন পূর্ণ হলে সঙ্গীতির কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়।

প্রথম সঙ্গীতির কার্যক্রম : মহাকশ্যপ নিজেই প্রশ্নকর্তা নিযুক্ত হন। প্রথমে বিনয় সজ্জায়ন করা হবে বলে স্থির করা হলো। উপালি ধর্মাসন অলঙ্কৃত করেন। মহাকশ্যপ স্থবির সঙ্ঘের সম্মতি অনুসারে উপালি স্থবিরকে বিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। প্রথমে, চারি পারাজিকা কখন প্রজ্ঞাপ্ত হয়, কাকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপ্ত হয়, কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়, মূল প্রজ্ঞপ্তি ও অনুপ্রজ্ঞপ্তি প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। উপালি স্থবির সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এভাবে তেরোটি সজ্ঞাদিসেস, দু'টি অনিয়ত, চারি পটিদেসনীয়া ধর্ম, ত্রিশটি নিস্সগ্গিয়, বিরানব্বইটি পাচিত্তিয় প্রভৃতি একে একে আবৃত্তি করে স্থির করা হয়। তৎপর উভয় বিভঙ্গ, মহাবগ্গ, চূল্লবগ্গ ও পরিবার পাঠো আবৃত্তি করা হয়। উপস্থিত সঙ্গীতিকারক ভিক্ষুগণ উপালি স্থবিরের বিনয় আবৃত্তি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনলেন। তাঁরা সর্বসম্মতি ক্রমে উপালি কর্তৃক দেশিত বিনয় অনুমোদন করেন। এছাড়া 'ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র' শিক্ষাপদ নিয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ বুদ্ধ জীবিত থাকতে এসব বিষয়ে ভিক্ষুরা ইচ্ছা করলে পরিবর্তন করতে পারবেন বলেছিলেন। পাঁচশো অর্হৎ ভিক্ষুর অনুমোদন লাভের পর বিনয় সজ্জায়ন শেষ হয়। বিনয় বুদ্ধশাসনের আয়ুস্বরূপ। তাই ধর্ম ও বিনয়ের মধ্যে বিনয় আগে সংগৃহীত হয়।

তারপর বিনয়ের মতো ধর্ম (বা সুত্ত) আবৃত্তির জন্য আনন্দ স্থবিরকে আহ্বান করা হয়। আনন্দ স্থবির ধর্মাসনে বসেন। মহাকশ্যপ স্থবির প্রশ্নকর্তার আসনে বসে শ্রুতিধর আনন্দ স্থবিরকে ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমে 'ব্রহ্মজাল সূত্র' কোথায় দেশিত হয়েছিল, কাকে উপলক্ষ করে দেশিত হয়েছিল প্রশ্ন করা হয়। তারপর, ব্রহ্মজাল সূত্রের নিদান, পুগ্গল প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তারপর শ্রামণ্যফল সূত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। আনন্দ স্থবির প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। এভাবে দীঘনিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্দকনিকায় আবৃত্তি করা হয়। পাঁচশো অর্হৎ ভিক্ষুর অনুমোদন লাভের পর সূত্র বা ধর্ম সঙ্গায়ন শেষ হয়। প্রথম মহাসঙ্গীতি সম্পন্ন হতে চার মাস সময় লেগেছিল। পাঁচশো অর্হৎ দ্বারা প্রথম সঙ্গীতি সম্পন্ন হয়েছিল বলে একে পঞ্চশতিকা সঙ্গীতিও বলা হয়।

প্রথম সঙ্গীতির ফলাফল : পাঁচশো অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে মহাকশ্যপ স্থবিরে সভাপতিত্বে এবং উপালি ও আনন্দ স্থবিরের দেশনায় বুদ্ধবাণী ধর্ম-বিনয় হিসেবে সংকলিত বা সংগৃহীত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

প্রথম সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ কী?

আনন্দ স্থবিরকে প্রথমে কেন সঙ্গীতিকারক হিসেবে নির্বাচন করা হয়নি?

প্রথম সঙ্গীতিতে উপালি থের কী আবৃত্তি করেন?

পাঠ : ৪

দ্বিতীয় সঙ্গীতি

দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ : বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশো বছর পর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ সঙ্ঘে বিনয়-বহির্ভূত দশটি বিধিবিধান বা দশবত্থুনী প্রচলন করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা উপোসথ দিবসে ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যখানে পানি ভর্তি তাম্রপাত্র রেখে উপাসক-উপাসিকাদের কহাপণ (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) প্রদানের জন্য অনুরোধ করতেন। তাঁরা অন্যান্য বিনয়ধর ভিক্ষুদের এ দশটি বিনয় বহির্ভূত বিধানকে সমর্থন জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। তাঁরা যশ স্থবিরকে উপঢৌকন দিয়ে বশে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু যশ স্থবির বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের বিনয় বহির্ভূত ও সঙ্ঘ পরিপন্থী গর্হিত আচরণ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান। বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তিনি বজ্জি ভিক্ষুদের বিনয় বহির্ভূত কর্ম হতে নিবৃত্ত করার জন্য বিনয়ী ভিক্ষু ও ধার্মিক লোকদের অনুরোধ করেন। এতে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ ক্ষুব্ধ হয়ে যশ স্থবিরকে 'পটিসারণীয় কম্ম' প্রদান করেন। অর্থাৎ পুনরায় মিলনের বা বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। যশ স্থবির দুর্বিনয়ী ভিক্ষুদের কথায় কর্ণপাত না করে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য বৈশালীবাসীদের অনুরোধ জানান। এতে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে 'উক্খেপনী দণ্ড' প্রদানপূর্বক তাঁকে সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করেন। যশ স্থবির এ সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রমান্বয়ে বিনয়ী ভিক্ষুদের আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিনয়ী ভিক্ষুগণ বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রচলিত দসবত্থুনী বা দশটি বিধিবিধান বিনয়সংগত কি না এ-সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন। দশটি বিধিবিধান বা দশবত্থুনী হলো নিম্নরূপ :

১. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে সিং-এর মধ্যে লবণ জমা রেখে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু পাতিমোক্ষের পঁয়ত্রিশ নং পাচিত্তিয়া অনুসারে ভিক্ষুগণ তা করতে পারেন না।

২. মধ্যাহ্নের পর সূর্যের ছায়া দুই আঙুল হেলে পড়লেও ভিক্ষুগণ খাদ্য গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু পাতিমোক্ষের নিয়ম অনুসারে ভিক্ষুগণ মধ্যাহ্নের পর ভোজন করতে পারেন না।

৩. ভিক্ষুগণ একবার ভোজন করে পুনরায় অন্য গ্রামে গিয়ে ভোজন করতে পারবেন। কিন্তু পাতিমোক্ষের পঁয়ত্রিশ নং পাচিত্তিয়া অনুসারে ভিক্ষুগণ তা করতে পারেন না।

৪. এক সীমাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন আবাসের ভিক্ষুগণ পৃথক পৃথকভাবে উপোসথ পালন করতে পারবেন। কিন্তু এটি সীমা ও আবাস-সম্পর্কীয় বিধির পরিপন্থী।

৫. অনুপস্থিত ভিক্ষুর অনুমতি পরে নেওয়া হবে এরূপ চিন্তা করে ভিক্ষুগণ বিনয়কর্ম সম্পাদন করতে পারবেন। কিন্তু এটি সঙ্ঘবিধির পরিপন্থী।

৬. বিধিবিধানের আলোকে বিচার না করে পরম্পরা-প্রচলিত আচার বা প্রথাকে ভিক্ষুগণ মান্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু বৌদ্ধমতে, কোনো বিষয় সঠিক এবং বিনয়সম্মত না হলে পরম্পরা প্রচলিত হয়ে আসলেও গ্রহণ করা যায় না।

৭. ভিক্ষুগণ বিকালে দুধ ও দধির মধ্যবর্তী অবস্থার পানীয় বা ঘোল জাতীয় তরল পদার্থ পান করতে পারবেন। কিন্তু এটি পাতিমোক্ষের পঁয়ত্রিশ নং পাচিত্তিয়া বিধির পরিপন্থী।

৮. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে তাড়ি জাতীয় পানীয় পান করতে পারবেন। কিন্তু এটি পাতিমোক্ষের একান্ন নং পাচিত্তিয়া বিধির পরিপন্থী।

৯. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে ঝালরযুক্ত কম্বল ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু এটি পাতিমোক্ষের উননব্বই নং পাচিত্তিয়া বিধির পরিপন্থী।

১০. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে সোনা, রুপা বা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত দ্রব্য গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু এটি পাতিমোক্ষের আঠার নং নিসগ্গীয় বিধির পরিপন্থী।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির সময়কাল, স্থান ও পৃষ্ঠপোষকতা :

বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশো বছর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। তখন ছিল রাজা কালাশোকের রাজত্বকাল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালীর বালুকারামে দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সঙ্গীতিকারক নির্বাচন ও কার্যক্রম : বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ যশ স্থবিরকে দণ্ডপ্রদান করে সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করলে তিনি তাঁর জন্মভূমি কোশাম্বীতে অবস্থান নেন। সেখান থেকে তিনি বিনয়ী ভিক্ষুদের খবর প্রদান করে একত্রিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি পশ্চিম ভারতের অবন্তি ও পাঠেয়্য অঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের ভিক্ষুদের নিকট খবর প্রেরণ করেন এবং নিজে অহোগঙ্গ পর্বতে অবস্থানকারী মহামান্য সম্ভূত সানবাসী ভিক্ষুর নিকট গমন করেন। স্থবির সম্ভূত সানবাসী মহাতার্কিক এবং পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দসবত্থুনী সম্পর্কে যশ স্থবিরের অভিমত সমর্থন করেন। এ-সময় খবর পেয়ে পশ্চিম ভারত হতে ষাটজন এবং দক্ষিণ

ভারত হতে আটাশি (৮৮) জন অর্হৎ ভিক্ষু অহোগঙ্গ পর্বতে পৌঁছে সম্ভুত সানবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, দসবত্থুনী সম্পর্কে মীমাংসা না হলে ভবিষ্যতে বুদ্ধশাসনের ক্ষতি হতে পারে। তাঁরা সম্ভুত সানবাসীর পরামর্শে রেবত স্থবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে দসবত্থুনী সম্পর্কে অবহিত করেন। রেবত স্থবির সমস্ত দসবত্থুনী বিচার বিশ্লেষণ করে বিনয় বহির্ভূত বলে রায় দেন এবং বলেন বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের তা পরিত্যাগ করা উচিত।

এ সময় বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণও নিজেদের পক্ষে লোক সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে থাকেন। তাঁরাও রেবত স্থবিরকে স্বপক্ষে আনবার জন্য মহামূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। রেবত স্থবির তা প্রত্যাখ্যান করে তাঁদের দসবত্থুনী তথা বিনয়ের পরিপন্থী আচরণ ত্যাগ করতে উপদেশ প্রদান করেন। তখন তাঁরা রেবত স্থবিরের শিষ্য উত্তরের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু তাতেও তাঁরা ব্যর্থ হন। অতঃপর উপস্থিত ভিক্ষুগণ রেবত স্থবিরের পরামর্শে বৈশালীতে গিয়ে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য সঙ্গায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সঙ্গায়ন করার উদ্দেশ্যে ত্রিপিটকধর প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত সাতশো অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করে বৈশালীর বালুকারামে সমবেত হন। সেখানে দুই পক্ষের ভিক্ষুদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে আটজন ভিক্ষুর সমন্বয়ে একটি কার্যকারক সভা গঠন করা হয়। এ সভায় পূর্ব ভারত হতে চারজন এবং পশ্চিম ভারত হতে চারজন ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন। কার্যকারক সভার আটজন ভিক্ষু হলেন : সব্বকামী, খুজ্জশোভিত, সাল্হ, বসভ, রেবত, সম্ভুত সানবাসী, যশ এবং সুমন স্থবির। এই আটজন মহাপণ্ডিত ভিক্ষুর দ্বারা গঠিত কারক সভায় 'দসবত্থুনী' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা হয় এবং দসবত্থুনী বিনয় সম্মত নয় বলে ঘোষণা করা হয়। চুল্লবগ্গ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, উক্ত সভায় রেবত থের সভাপতিত্ব করেন এবং সব্বকামী থের ধর্মাসন অলংকৃত করেন। প্রথম সঙ্গীতির অনুকরণে সমস্ত কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এই সঙ্গীতি আট মাস চলেছিল। প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত বুদ্ধবাণী পুনরায় আবৃত্তি করে এ সঙ্গীতিতে ধর্ম-বিনয় হিসেবে সংগৃহীত হয়। সাতশো অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে এর নাম সপ্তশতিকা মহাসঙ্গীতি। ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় বিনয় প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়ায় এ সঙ্গীতিকে বিনয় সঙ্গীতিও বলা হয়।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির ফলাফল : এই সঙ্গীতিতে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রবর্তিত দসবত্থুনী বিনয়সম্মত নয় বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত বুদ্ধবাণী প্রকৃত বুদ্ধবাণী হিসেবে অনুমোদিত হয় এবং তা পুনরায় আবৃত্তি করে ধর্ম-বিনয় হিসেবে সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির এই সিদ্ধান্ত এক দল মেনে নিতে পারেননি। তাঁদেরকে সজ্ঘ হতে বহিষ্কার করা হয়। তাঁদের সংখ্যাও অনেক। তাঁরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। ফলস্বরূপ তাঁরা আর একটি সঙ্গীতির আয়োজন করেন। কথিত আছে যে, সে সঙ্গীতিতে দশ হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গীতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর ভিক্ষুসজ্ঘ 'স্থবিরবাদী' ও 'মহাসাঙ্গিক' এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

'দসবত্থুনী' কী?

দ্বিতীয় সঙ্গীতির কার্যকারক সভার সদস্যদের নাম লেখ

দ্বিতীয় সঙ্গীতিকে কেন সপ্তশতিকা সঙ্গীতি বলা হয়?

পাঠ : ৫

তৃতীয় সঙ্গীতি

তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ : সম্রাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার বেড়ে যায় এবং তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। ফলে অন্যান্য ধর্মের বহু তীর্থিক বা সন্ন্যাসীগণ লাভ-সৎকারের আশায় মস্তক মুণ্ডন এবং পাত্র-চীবর ধারণ করে ভিক্ষু বলে পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁরা অসদুপায় অবলম্বনপূর্বক বিহার ও মন্দির দখল করে বসবাস করতে থাকেন এবং ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন। যেখানে-সেখানে ছদ্মবেশী ভিক্ষুরা গিয়ে উৎপাত করতে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। তাঁদের বিনয় বহির্ভূত আচরণে বিনয়ী ভিক্ষুরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ফলে সঙ্ঘে অরাজকতা দেখা দেয়। এ ছাড়াও সে সময় বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রায় আঠারোটি নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা প্রত্যেকে নিজেদের বুদ্ধের মতবাদের প্রকৃত অনুসারী বলে দাবি করতে থাকেন। ফলে কোনটি বুদ্ধের প্রকৃত মতবাদ তা নির্ণয় করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, এক নিকায়ের ভিক্ষু অন্য নিকায়ের ভিক্ষুর সঙ্গে বসবাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, বিনয়ী ভিক্ষুগণ ছন্দবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্গে উপোসথ, প্রবারণা প্রভৃতি বিনয়কর্ম সম্পাদন করতে অস্বীকৃতি জানান। এসব অরাজক পরিস্থিতিই তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের অন্যতম কারণ।

তৃতীয় সঙ্গীতির সময়কাল, স্থান ও পৃষ্ঠপোষকতা :

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রের অশোকারামে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। সম্রাট অশোক এ সঙ্গীতিতে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাছাড়া সঙ্গীতি সমাপ্ত হলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত প্রেরণ করেন।

সঙ্গীতিকারক নির্বাচন ও কার্যক্রম : প্রকৃত বিনয়ী ভিক্ষুরা ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্গে উপোসথ, প্রবারণা ও পাতিমোক্ষ আবৃত্তি প্রভৃতি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে অস্বীকৃতি জানালে পাটলীপুত্র নগরের উপরে বর্ণিত ধর্মানুষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকে। তখন অধার্মিক ভিক্ষুরা চক্রান্ত করে সম্রাট অশোকের নিকট হতে উপোসথ করবার জন্য আদেশ জারি করালেন। তাতেও ধার্মিক ভিক্ষুরা উপোসথ পালন করতে রাজি হলেন না। ফলে অনভিজ্ঞ মন্ত্রীর আদেশে বহু ধার্মিক ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়। সম্রাট অশোক এ-খবর জ্ঞাত হয়ে খুবই মর্মাহত হন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, তাঁর উদাসীনতার কারণে অনেক ভিক্ষুর প্রাণ সংহার হলো। এ পাপ কার্যের জন্য তিনি দায়ী কি না তা জানার জন্য মন্ত্রীকে প্রেরণ করে অহোগঙ্গ পর্বত হতে বৌদ্ধধর্মে পারঙ্গম মহাপণ্ডিত মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবিরকে আনয়ন করেন। মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবির সম্রাট অশোককে জানালেন যে, পাপ চেতনা না থাকলে সেই কার্যে কোনো অপরাধ হয় না। অতঃপর, সম্রাট অশোক তাঁর নিকট সপ্তাহব্যাপী বুদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবিরের পরামর্শে এক এক জন ভিক্ষুকে পর্দার অন্তরালে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি "কোন মতবাদী।" ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুরা কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। কেবল বিনয়ী ভিক্ষুরা এক বাক্যে বললেন যে, তাঁরা "বিভাজ্যবাদী"। তখন সম্রাট অশোক বুঝতে পারলেন, কারা প্রকৃত ভিক্ষু। তিনি অবিনয়ী ছদ্মবেশী ভিক্ষুদের শ্বেতবস্ত্র পরিধানপূর্বক সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করেন।

জানা যায় যে, তাঁদের সংখ্যা ষাট হাজারের অধিক। অতঃপর, সম্রাট অশোক বিনয়ী ভিক্ষুদের বলেন, ‘‘ভন্তে ! এখন সঙ্ঘ বিশুদ্ধ হয়েছে। ভিক্ষুসঙ্ঘ উপোসথ কর্ম সম্পাদন করুন।’’ তৎপর বিশুদ্ধ সঙ্ঘ একত্রিত হয়ে অশোকারাম বিহারে উপোসথ কর্ম সম্পাদন করেন।

সঙ্ঘ বিশুদ্ধ হওয়ার পর মোগ্‌গলীপুত্র তিষ্য স্থবির প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলনের জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন। তিনি সঙ্গীতির জন্য ধর্ম-বিনয়ে পরদর্শী ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন এক হাজার অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করেন। এ সঙ্গীতিতে মোগ্‌গলীপুত্র তিষ্য স্থবিরের সভাপতিত্বে প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির অনুকরণে ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত হয়। এই সঙ্গীতিতে মোগ্‌গলীপুত্র তিষ্য স্থবির ‘কথাবত্থু’ নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে অন্যান্য মতবাদীদের মতামত খণ্ডন করে বিভাজ্যবাদীদের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। বুদ্ধবাণীর সারমর্ম প্রতিফলিত হওয়ায় গ্রন্থটি অভিধর্ম পিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নয় মাস ব্যাপী চলে এ সঙ্গীতি। স্মৃতিধর অর্হৎ ভিক্ষুগণ শুদ্ধ বুদ্ধবাণী পুনরায় স্মৃতিতে ধারণ করে নেন। এই সঙ্গীতিতে সর্বপ্রথম অভিধর্ম পিটকের উল্লেখ করা হয় এবং বুদ্ধবচনকে ‘ত্রিপিটক’ আখ্যা দেওয়া হয়।

ধর্মপ্রচারক প্রেরণ : এই সঙ্গীতির পরেই মহামতি অশোক ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশবিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য ‘ধর্ম মহাপাত্র’ নামে বিশেষ শ্রেণির রাজকর্মচারীও নিযুক্ত করেন। তাঁরা নগরে প্রান্তরে সর্বত্র ধর্মনীতি প্রচার করতেন। তিনি স্বীয় পুত্র ও কন্যা যথাক্রমে মহেন্দ্র স্থবির ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রাকেও ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তৃতীয় সঙ্গীতির পর সম্রাট অশোক যেসব দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন তা তুলে ধরা হলো :

ধর্ম প্রচারক	**ধর্ম প্রচারের স্থান**
মজ্ঝন্তিক থের	কাশ্মীর ও গান্ধার রাজ্যে
মহাদেব থের	মহিষমণ্ডল
রক্ষিত থের	বনবাসী
ধর্মরক্ষিত থের	অপরান্তক
মহাধর্ম রক্ষিত থের	মহারাষ্ট্র
মহারক্ষিত থের	যোনলোক
মজ্ঝিম থের	হিমবন্ত প্রদেশ
সোন ও উত্তর থের	সুবর্ণভূমি
মহেন্দ্র থেরর নেতৃত্বে ইত্থিয়, উত্থিয় ভদ্দসাল, সম্বল এবং উপাসক সুমন	লঙ্কাদ্বীপ

তৃতীয় সঙ্গীতির ফলাফল : তৃতীয় সঙ্গীতির ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করা হয়।

২০২৩

২. সঙ্গীতিকারক সব ভিক্ষু এক বাক্যে স্বীকার করে নেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে গৃহীত ধর্ম বিনয়সমূহ তথাগত বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী ও উপদেশ।

৩. প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে যে ধর্ম–বিনয় আবৃত্তি ও গৃহীত হয়েছিল সেগুলো তৃতীয় সঙ্গীতিতে আবার অনুমোদিত হয়।

৪. তৃতীয় সঙ্গীতিতে প্রথম সঙ্গীতিতে আবৃত্তিকৃত বিনয়কে ঠিক রেখে ধর্মকে দুভাগে ভাগ করে সূত্র ও অভিধর্ম নামে আখ্যায়িত করা হয়। ফলে বুদ্ধবাণী মোট তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যথা—বিনয়, সুত্ত ও অভিধর্ম। এ তিনটি সংকলনের পর নামকরণ করা হয় ত্রিপিটক।

অনুশীলনমূলক কাজ

কতজন অর্হৎ ভিক্ষু তৃতীয় সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণ করেন?

তৃতীয় সঙ্গীতিতে কোন কোন স্থানে ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হয়েছিল? তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ : ৬

বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলনে সঙ্গীতির ভূমিকা

বুদ্ধ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব ধর্মোপদেশ দিতেন বুদ্ধশিষ্যগণ তা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন এবং মুখে-মুখে প্রচার করতেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর প্রথম সঙ্গীতিতে বিভিন্ন ভিক্ষু কর্তৃক স্মৃতিতে ধারণকৃত বুদ্ধের উপদেশসমূহ প্রথম সংকলন করে একত্র করা হয়। কালক্রমে এগুলোই বর্তমানকালের ত্রিপিটকের রূপ পরিগ্রহ করে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। নানা কারণে মুখে-মুখে প্রচারিত যে-কোনো বিষয় বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তন্মধ্যে অন্যতম কারণসমূহ হচ্ছে : ১. অন্যভাষার প্রভাব ২. একাধিক ভাষাভাষী লোকের সহাবস্থান ৩. উচ্চারণের দুর্বলতা ৪. বোঝার দুর্বলতা এবং ৫. ব্যাখ্যা করার দুর্বলতা। কণ্ঠস্থ বা স্মৃতিতে ধারণ করে মুখে-মুখে প্রচারিত হওয়ার কারণে বুদ্ধবাণীর ক্ষেত্রেও বিকৃতি বা অর্থান্তর হওয়ার আশঙ্কা ছিল। দ্বিতীয় সঙ্গীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশো বছরের মধ্যে বিনয়ের কতিপয় বিধিবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে প্রথম সঙ্ঘে বিবাদ সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ সঙ্ঘ প্রথম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুনরায় প্রথম সঙ্গীতিতে সংকলিত বুদ্ধবাণী আবৃত্তি ও সংকলিত করে বিশুদ্ধতা রক্ষা করা হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের একশো বছরের মধ্যে বৌদ্ধসঙ্ঘ আঠারো নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি নিকায়ের ভিক্ষুগণ নিজেদেরকে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক-বাহক হিসেবে প্রচার করতেন। তা ছাড়া, সম্রাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার বেড়ে গেলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেক তীর্থিক বা সন্ন্যাসী মস্তক মুণ্ডণ ও পাত্র চীবর ধারণ করে ভিক্ষু হিসেবে পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতেন। ফলে কোনটি প্রকৃত বুদ্ধবাণী তা নির্ধারণ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুনরায় প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলন করা হয়। এরপর সম্রাট অশোক-পুত্র মহেন্দ্র থের তা সিংহলে নিয়ে যান। সেখানেও বুদ্ধবাণী কণ্ঠস্থ করে দীর্ঘদিন

২০২৩

মুখে-মুখে প্রচার করা হয়। সেখানে যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ এবং ভোগবাদী মানসিকতার কারণে বুদ্ধবাণী বিকৃত ও বিস্মৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন রাজা বট্টগামণী সিংহলে রাজত্ব করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় চতুর্থ সঙ্গীতি আয়োজন করে তালপত্রে বা ভূর্জপত্রে প্রথম বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ করা হয়, যা বর্তমানকালের ত্রিপিটকের ভিত্তি তৈরি করে। তখন থেকে তালপত্রে লিখিত বুদ্ধবাণীর পাণ্ডুলিপি নকল করে, শিলালিপিতে খোদাই করে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বুদ্ধবাণী সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু খোদাইকার বা লিপিকারের প্রমাদবশত ক্ষেত্রবিশেষে বুদ্ধবাণী অশুদ্ধভাবে উপস্থাপন হতে থাকে। ফলে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুনরায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ সঙ্গীতির আয়োজন করা হয়। সেসব সঙ্গীতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ তুলনামূলক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শুদ্ধভাবে বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়, যা আমরা বর্তমানে সহজে লাভ করতে এবং শিক্ষা করতে পাচ্ছি। অতএব বলা যায়, বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলনের ক্ষেত্রে সঙ্গীতির ভূমিকা অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

কোথায় এবং কখন প্রথম বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল?

কী কী কারণে মুখে-মুখে প্রচারিত বিষয় বিকৃত হতে পারে?

অনুশীলনী

শূণ্যস্থান পূরণ কর

১. সঙ্গীতি হলো ভিক্ষু-সঙ্ঘের সর্বোচ্চ ------- সভা বা সম্মেলন।

২. ধর্ম বিনয়ে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুগণ বুদ্ধবাণীসমূহ----------- প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

৩. সঙ্গীতি আরম্ভের ঠিক আগে আনন্দ স্থবির ------------- প্রাপ্ত হন।

৪. প্রথম মহা সঙ্গীতি সম্পন্ন হতে---------- মাস সময় লেগেছিল।

৫. তাঁরা ধর্মকে .... এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রথম সঙ্গীতি কার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ?

২. বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুরা কেন অধর্মবাদী?

৩. কেন এবং কার কাছে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ?

৪. সঙ্গীতির মাধ্যমে কীভাবে বুদ্ধবাণী সংকলিত হয় ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. প্রথম সঙ্গীতির ফলাফল বর্ণনা কর।

২. "দশ বত্থুনী " কাকে বলে এবং কী কী ? উল্লেখ কর।

৩. তৃতীয় সঙ্গীতির পটভূমি ও ফলাফল আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কে বুদ্ধের সর্বশেষ শিষ্য ছিলেন ?

ক. ধর্মরক্ষিত খ. মহাদেব

গ. সুভদ্র ঘ. আনন্দ

২। দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের প্রধান কারণ কোনটি ?

ক. যশ স্থবিরকে সংঘ থেকে বহিষ্কার করা

খ. দুর্বিনীত ভিক্ষুদেরকে স্বীকৃতি দেয়া

গ. সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা

ঘ. দসবজ্জুনীকে বিনয়-বহির্ভূত ঘোষণা করা।

নিচের ছবিটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ছবি মডেল : (বাম থেকে) রাজা অজাতশত্রু, সম্রাট কালাশোক, সম্রাট অশোক, সম্রাট কণিষ্ক

৩। বুদ্ধবাণী সংকলন ও সংরক্ষণে মডেলে উল্লিখিত শাসকগণ কী অবদান রাখেন ?

ক. সঙ্গীতি আহ্বানের খ. সূত্র ও নীতিগাথা প্রচারে

গ. জাতকের উপদেশ প্রচারে ঘ. অট্‌ঠকথার প্রসারে

৪। উক্ত ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রধানত কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ?

ক. কর্মযজ্ঞ নিয়ন্ত্রণ করা খ. সম্পদ বৃদ্ধি করা

গ. রাজ্যের সম্প্রসারণ করা ঘ. ধর্মপ্রচার করা।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। চার্ট - ১

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা
১.	অংশগ্রহণকারী	৫০০ জন
২.	কার্যকাল	৪ মাস

চার্ট - ২

ক্রমিক নং	পদবি	ব্যক্তি
১.	সভাপতি	মোগ্গলীপুত্র তিষ্য
২.	পৃষ্ঠপোষক	সম্রাট অশোক

ক. দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর ভিক্ষুসঙ্ঘ কয়ভাগে বিভক্ত হয় ?

খ. বৌদ্ধধর্মে সঙ্গীতি আহ্বানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।

গ. চার্ট-১ এ বর্ণিত তথ্যটি কোন সঙ্গীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সঙ্গীতি আয়োজনে চাট-২ -এ উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের ভূমিকা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় স্পীকার। জনগণের কল্যাণে ও এলাকার উন্নয়নে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্যরা সংসদ অধিবেশনে বিভিন্ন সমস্যা উত্থাপন করেন এবং তা যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত, বাতিল ও সংশোধন করেন। পরিশেষে তা আইনে পরিণত হয়।

ক. "কথাবত্থু" গ্রন্থটি কে রচনা করেন ?

খ. ধর্ম মহাপাত্র বলতে কী বোঝায় ? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের কোন কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত বহন করে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত কর্মকাণ্ডের ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

নবম অধ্যায়

জাতক

'জাতক' শব্দের অর্থ হলো যে জাত বা জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বা জন্ম- জন্মান্তরের জীবন-কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহ জাতক নামে অভিহিত। বুদ্ধ হওয়ার আগে সিদ্ধার্থ গৌতমকে বহু কল্পকাল নানাকুলে জন্মগ্রহণ করে বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সাধনা করতে হয়েছিল। বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যে সত্ত্ব সাধনায় রত থাকেন তাঁকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। এজন্য প্রতিটি জন্মে তিনি বোধিসত্ত্ব নামে অভিহিত। জন্মজন্মান্তরের জীবনপ্রবাহে কর্মফলের কারণে তিনি রাজা, মন্ত্রী, দেবতা, বণিক, চণ্ডাল, পশু-পাখি প্রভৃতি নানা কুলে জন্মগ্রহণ করে বোধিসত্ত্ব জীবনচর্চা করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, বীর্য, ক্ষান্তি, মৈত্রী, সত্য, ভাবনা, অধিষ্ঠান ও উপেক্ষা-এই দশবিধ পারমিতা চর্চা করে তিনি চরিত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করেন। অতঃপর শেষজন্মে পূর্ণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে বোধিজ্ঞান লাভ করেন এবং সম্যক সম্বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। জাতকের কাহিনীগুলোতে গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের নানা ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। জাতকের আখ্যানগুলোতে দেখা যায়, তিনি কোথাও ঘটনার প্রধান চরিত্র, কখনো তিনি ঘটনার পর্যবেক্ষক, আবার কোথাও তাঁর ভূমিকা গৌণ। জাতকের কাহিনীগুলো নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ। জাতকের বিশেষত্ব হলো গল্পের ছলে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষ সাধন করা। বুদ্ধ তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ও অনুসারীদের প্রসঙ্গক্রমে অতীত জীবনের ঘটনাবলি বর্ণনা করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশসাধনে উদ্বুদ্ধ করতেন। জাতক পাঠে সৎ গুণাবলিসম্পন্ন আদর্শ জীবন গঠন করা যায় এবং সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী, করুণা জাগ্রত হয়। এছাড়া জাতকে গৌতম বুদ্ধের সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। জাতকের ভূমিকা এখানেও সীমাবদ্ধ নয়। যে সমস্ত কথাসাহিত্য লোকপরম্পরা চলে আসছে, আদিম অবস্থায় এগুলোর স্বরূপ কেমন ছিল, কীভাবে পরিবর্তিত হলো এবং এগুলো রচনার উদ্দেশ্য কী ছিল প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে হলেও জাতকের পঠন-পাঠন আবশ্যক। বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারে গল্প-উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রচনার চিরন্তন উৎস হিসেবেও জাতকের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। এ-কারণে জাতককে প্রাচীন ইতিহাসের অনন্য উৎস বলা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা শুক জাতক, সেরিবাণিজ জাতক, জনসন্ধ জাতক এবং সুখবিহারী জাতক– এই চারটি জাতক পাঠ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

* বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী বর্ণনা করতে পারব;
* বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ : ১

শুক জাতক

অনেক অনেক দিন আগের কথা। বারানসির রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তখন হিমবন্ত প্রদেশে বোধিসত্ত্ব শুক পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শুক পাখিরূপী বোধিসত্ত্ব ছিলেন বড়ই বলশালী। তিনি হাজার হাজার শুক পাখির দলপতি ছিলেন। দলপতি শুক ও তাঁর স্ত্রীর একটি পুত্রসন্তান ছিল। উভয়ে সন্তানকে আদর-স্নেহে লালনপালন করতেন।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে শুক ও তাঁর স্ত্রীর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেল। আগের মতো আর উড়তে পারেন না। মা-বাবাকে বাসায় রেখে শুকসন্তান খাবারের খোঁজে যেত। একদিন উড়ে যেতে যেতে দেখল, সমুদ্রবেষ্টিত একটি সবুজ দ্বীপ। দ্বীপটিতে ছিল একটি আমবন। সেখানে পাকা পাকা রসালো আম। সোনার মতো রং। সে মনের সুখে আমের রস খেল। মধুর মতো মিষ্টি সে রস। ফেরার পথে মা-বাবার জন্য পাকা আম নিয়ে এল।

বোধিসত্ত্ব আম খেয়েই বুঝতে পারলেন আমগুলো ছিল সেই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের।

তিনি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমটি কি সেই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের?

ছেলে বললো, হ্যাঁ বাবা।

বোধিসত্ত্ব বললেন, দেখ বাবা, অতদূরে যাওয়া বড়ই কষ্টের। যেসব শুক ওই দ্বীপে যায়, তারা বেশিদিন বাঁচে না। তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান। এই বৃদ্ধ বয়সে আমাদের আর কেউ নেই। আর কোনোদিন ওই দ্বীপে যেও না।

কিন্তু শুক সন্তান মা-বাবার উপদেশ শুনলো না। লোভে পড়ে সে প্রায়ই ঐ দ্বীপে আমের রস খেতে যেত।

একদিন সে অনেক আমের রস খেল। এত বেশি খেল যে তার শরীর ভারী হয়ে গেল। তারপর বুড়ো মা-বাবাকে খাওয়ানোর জন্য সে ঠোঁটে একটি পাকা আম নিয়ে উড়তে আরম্ভ করল। দীর্ঘ পথ চলায় সে ক্লান্তি বোধ করছিল। তার দুচোখে ঘুম-ঘুম ভাব। তাই হঠাৎ আমটি সমুদ্রে পড়ে গেল।

শুক পাথি মা-বাবার জন্য আম নিয়ে যাচ্ছে

ক্লান্তি ও ঘুমে সে চেনা পথ হারিয়ে ফেলল এবং নিচু হয়ে পানি স্পর্শ করে উড়তে লাগল। ক্লান্ত, শ্রান্ত শুকসন্তান এক সময়ে গভীর সমুদ্রে পড়ে গেল। তখনই সমুদ্রের একটি বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল। বোধিসত্ত্ব দেখলেন, বেলা যায়। সূর্য ডুবে গেল। আস্তে আস্তে রাতও নেমে এল। তাঁদের সন্তান ফিরে এল না। তিনি বুঝতে পারলেন, সে সমুদ্রে পড়ে মারা গেছে।

মা-বাবা তার জন্য হাহাকার করতে লাগলেন।

তাঁদের দেখাশোনার আর কেউ রইল না। এক সময় বুড়ো মা-বাবা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মারা গেলেন।

উপদেশ : গুরুজনের কথা মেনে চলতে হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

শুকসন্তান মা-বাবার উপদেশ না শুনে কী করত?

বাবা-মার উপদেশ না শোনায় শুক সন্তানের কী পরিণতি হয়েছিল লেখ।

পাঠ : ২

সেরিবাণিজ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার সেরিব নামক রাজ্যে ফেরিওয়ালা হয়ে জন্মেছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল সেরিবান। সেই দেশে সেরিবা নামে আরও একজন ফেরিওয়ালা ছিল। সে খুবই লোভী ছিল। একবার বোধিসত্ত্ব সেরিবাকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধপুর নগরে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন।

অন্ধপুরে এক সময় এক ধনী শ্রেষ্ঠী পরিবার বাস করতেন। কিন্তু ধন-সম্পদ হারিয়ে সেই শ্রেষ্ঠী পরিবার গরিব হয়ে যায়। পরিবারের সব পুরুষ একে একে মারা যায়। সেই পরিবারে একটি ছোট মেয়ে ও বুড়ি ঠাকুরমা ছাড়া আর কেউ বেঁচে রইল না। তারা প্রতিবেশীর বাড়িতে কাজ করে অতি কষ্টে সংসার চালাত।

তাদের বাড়িতে একটি সোনার থালা ছিল। শ্রেষ্ঠী সেই সোনার থালায় ভাত খেতেন। শ্রেষ্ঠীর মৃত্যুর পর সেই থালার ব্যবহার আর কেউ করত না। এভাবে অনেক দিন ব্যবহার না করায় থালাটার গায়ে ময়লা জমে যায়। তারপর ভাঙা থালাবাটির সঙ্গে পড়ে থাকতে থাকতে সেটা আর সোনা বলেও মনে হতো না। বুড়ি ঠাকুরমাও থালাটির কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

একদিন ফেরিওয়ালা লোভী সেরিবা 'কলসি কিনবে, কলসি কিনবে' বলতে বলতে সেই শ্রেষ্ঠীর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ফেরিওয়ালার ডাক শুনে মেয়েটি ঠাকুরমাকে বলল, ও ঠাকুরমা, আমাকে একখানা গয়না কিনে দাও না।

ঠাকুরমা বললেন, আমরা গরিব মানুষ, পয়সা পাব কোথায়?

মেয়েটি তখন পুরানো ভাঙা থালাবাটির ভিতর থেকে সোনার থালাটি নিয়ে এসে বলল, এটা তো আমাদের কোনো কাজে লাগে না। এটি বিক্রি করে কিনে দাও না। ঠাকুরমা মেয়েটির কথায় রাজি হয়ে ফেরিওয়ালাকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, এই থালার বদলে আমার নাতনিকে একটা গয়না দেবেন?

ফেরিওয়ালা থালাটা উলটেপালটে দেখলো। দেখেই থালাটি সোনার বলে মনে হলো। তখন সে থালার পিছনে সুঁচ দিয়ে দাগ কেটে বুঝল থালাটা সত্যিই সোনার। সঙ্গে সঙ্গে সে তাদের ঠকিয়ে জিনিসটা হাতিয়ে নেবে ঠিক করল। সে বলল, এর আবার দাম কী? সিকি পয়সায় নিলেও ঠকা হয় — এরূপ বলে সে অবহেলার ভান করে থালাটা ফেলে দিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই সেই পথ দিয়ে ফেরার পথে বোধিসত্ত্ব 'কলসি কিনবে, কলসি কিনবে' বলে ডাক দিলেন। ফেরিওয়ালার ডাক শুনে মেয়েটি ঠাকুরমার কাছে আবার গয়না কেনার বায়না ধরল।

বুড়ি ঠাকুরমা বললেন, নিজের কানেই তো শুনেছ থালাটির কোনো দাম নেই। ঘরে বেচার মতো আর কোনো জিনিস তো নেই।

মেয়েটি বলল, সেই ফেরিওয়ালা ভালো না। ওর কথা শুনে গায়ে জ্বালা ধরে যায়। এই ফেরিওয়ালার ডাক কত মিষ্টি। এ বোধ হয় থালাটা নিতে রাজি হবে। একবার দেখি না।

বুড়ি বোধিসত্ত্বকে ডেকে বসতে বললেন। তারপর থালাটা তাঁর হাতে দিলেন। বোধিসত্ত্ব দেখামাত্রই বুঝলেন থালাটা সোনার। তিনি বললেন, মা, এই থালার দাম লক্ষ টাকা। আমার কাছে এত টাকা তো নেই।

বুড়ি বললেন, একটু আগেই এক ফেরিওয়ালা এসেছিল। সে বলল, এর দাম সিকি পয়সাও নয়। বোধ হয় আপনার পুণ্য বলে থালাটা সোনার হয়ে গেছে। আমরা এটা আপনাকেই দেব। তার বদলে আপনি যা ইচ্ছে দিন। বোধিসত্ত্বের তখন নগদ পাঁচশত টাকা ও পাঁচশত টাকার জিনিসপত্র ছিল। তার থেকে তিনি মাত্র আটটি টাকা রাখলেন। তারপর সোনার থালাটা নিয়ে নদীর কূলে চলে গেলেন। ঘাটে খেয়ানৌকা ছিল। বোধিসত্ত্ব নৌকায় উঠে মাঝিকে বললেন, আমাকে নদী পার করে দাও ভাই।

এদিকে লোভী সেরিবা আবার বুড়ির বাড়িতে গেল। সে বলল, থালাটা দাও তো। ফিরে যেতে যেতে ভাবলাম থালাটার বদলে কিছু না দিলে ভালো দেখায় না। সেজন্য আবার এলাম। বুড়ি বললেন, সে কী কথা? তুমি না বললে ওটার দাম সিকি পয়সাও হবে না। এইমাত্র একজন সাধু ফেরিওয়ালা এসেছিলেন। বোধ হয় তিনি তোমার মনিব হবেন। তিনি সেটা হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেছেন।

বুড়ির কথা শোনা মাত্রই লোভী ফেরিওয়ালার মাথা ঘুরে গেল। সে তখন পাগলের মতো লাফালাফি শুরু করল। জিনিসপত্র, টাকাপয়সা যা ছিল ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর, হায়! আমার সর্বনাশ হয়েছে, সেরিবান ছলনা করে আমার লক্ষ টাকার সোনার থালাটা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। বলতে বলতে সে বোধিসত্ত্বকে ধরার জন্য নদীতীরের দিকে ছুটল। নৌকা তখন মাঝনদীতে চলে গেছে। সেরিবা পাগলের মতো চিৎকার করে মাঝিকে বলতে লাগল, নৌকা ফেরাও, নৌকা ফেরাও। কিন্তু বোধিসত্ত্বের নিষেধ শুনে মাঝি নৌকা ফেরাল না।

মাঝি বোধিসত্ত্বকে নিয়ে নদীর অন্য কূলে চলল। লোভী সেরিবা সেই দৃশ্য ও সোনার থালার শোক সহ্য করতে পারল না। হতাশা ও রাগে তার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেল। রক্তবমি করে সে মারা গেলো।

লোভী ফেরিওয়ালা মাঝিকে নৌকা ফেরাতে বলছে

বোধিসত্ত্ব দানধর্ম ও সৎ কাজ করে সুকর্মফল ভোগ করে পরলোকে চলে গেলেন।

উপদেশ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

অনুশীলনমূলক কাজ

ফেরিওয়ালারূপী বোধিসত্ত্বের নাম কী ছিল?

সোনার থালা সম্পর্কে বোধিসত্ত্ব বুড়িকে কী বললেন?

পাঠ : ৩

জনসন্ধ জাতক

অনেক অনেক দিন আগের কথা। সে-সময়ে বারানসিতে ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করতেন। তখন বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্ত নামক রাজার পাটরানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয়েছিল জনসন্ধ। তিনি বড় হয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশীলা গমন করেন। সকল শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে বারানসিতে ফিরে আসেন। তিনি যেদিন ফিরে এসেছিলেন সেদিনই রাজা ব্রহ্মদত্ত ছেলের সফলতায় কারাগার থেকে সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেন। তারপর তাঁকে উপরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। তাঁর শাসনে প্রজাগণ সুখেই কালযাপন করতে থাকেন।

অভিষেকের কয়েক বছর পর তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। প্রজারা বোধিসত্ত্বকে রাজা নির্বাচন করেন। তিনি নগরের চার দ্বারে, মাঝখানে ও প্রাসাদের নিকটে ছয়টি দানশালা স্থাপন করে দৈনিক ছয় লক্ষ মুদ্রা দান দিতেন। এ মহাদান দেখে জম্বুদ্বীপবাসী বিস্মিত হল। তাঁর শাসনগুণে প্রজারা সন্তুষ্ট হলো। চুরি ডাকাতি বন্ধ হলো। কোথাও বিবাদের লেশমাত্র ছিল না। কারাগার শূন্য হয়ে গেল।

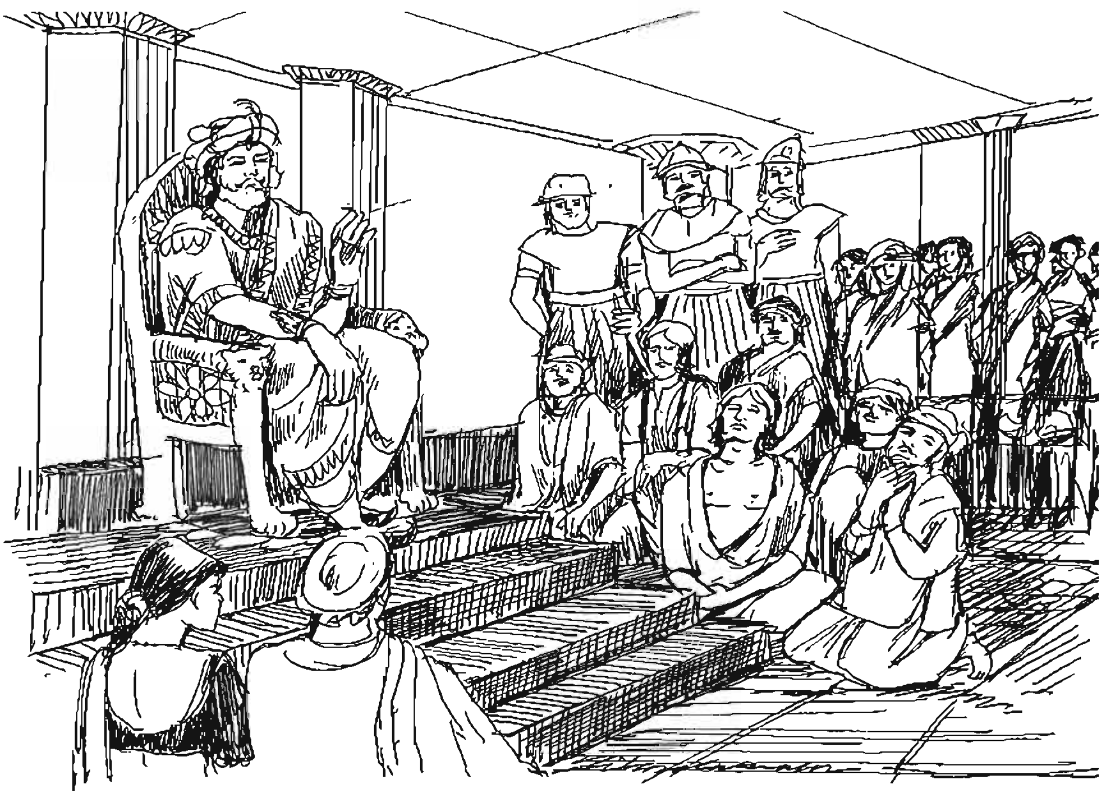

জনসন্ধ রাজা প্রজাদের ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন

২০২১

বোধিসত্ত্ব নিজে পঞ্চশীল রক্ষা করতেন। যথারীতি উপোসথ পালন করতেন। যথাধর্ম রাজ্যশাসনে মনোযোগী ছিলেন। সকলকে ধর্মপথে চলতে, সাধুভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে সর্বদা উপদেশ দিতেন।

একদিন রাজা জনসন্ধ পূর্ণিমার পঞ্চদশীয় উপসোথ দিনে উপোসথ ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি ভাবলেন, সমস্ত লোকের যাতে সুখ শান্তি মঙ্গল বর্ধিত হয়, যাতে তারা অপ্রমত্তভাবে চলে আমি তাদেরকে সেরূপ উপদেশ দেব। তিনি ভেরি বাজিয়ে অন্তঃপুর ও নগরবাসীকে সমবেত করালেন। তিনি রাজাঙ্গনে অলংকৃত রাজপালঙ্কে উপবেশন করে নগরবাসীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, নগরবাসীগণ, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর :

১. বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা কর।

২. যৌবনে ধন উপার্জন কর।

৩. কুটিলকর্ম ও কুপ্রবৃত্তি পরিহার কর।

৪. নিষ্ঠুর ও ক্রোধপরায়ণ হয়ো না।

৫. মাতাপিতার সেবায় অবহেলা করো না।

৬. গুরুর নিকট শিক্ষা কর।

৭. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও সাধুসজ্জনকে সম্মান প্রদর্শন কর।

৮. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাক।

৯. কৃপণতা পরিহার করে খাদ্যভোজ্য ও পানীয় দান কর।

১০. অন্য পুরুষ বা মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরদার লঙ্ঘন করো না। অপ্রমত্ত হও। দশবিধ কর্তব্য সম্পাদন কর।

রাজার উপরোক্ত দশটি উপদেশ পরবর্তীকালে 'দশরাজধর্ম' বা 'দশবিধ কর্তব্য' নামে পরিচিতি লাভ করে। রাজা সৎ উপদেশ দানের পাশাপাশি নিজেও সৎ জীবনযাপন করতেন এবং ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

রাজার উপদেশ শুনে জনগণও ধর্ম ও ন্যায়ের সঙ্গে জীবনযাপন করে সুখে বসবাস করতে থাকেন।

উপদেশ : রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হন।

অনুশীলনমূলক কাজ

জনসন্ধ কে ছিলেন?

দশরাজধর্ম বা দশবিধ কর্তব্যগুলো কী কী লেখ।

পাঠ : ৪

সুখবিহারী জাতক

পুরাকালে বারানসি ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঘর সংসার খুব দুঃখময়, গৃহত্যাগ বরং সুখকর - এই ভেবে তিনি হিমালয়ে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি ধ্যান ও আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন। তাঁর পাঁচশত তপস্বী শিষ্য ছিল।

একবার বর্ষাকালে বোধিসত্ত্ব শিষ্যসহ হিমালয়ে গিয়ে পৌঁছেন। সেখান থেকে নগর ও জনপদে ভিক্ষা করতে করতে বারানসিতে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি রাজার উদ্যানে অতিথি হয়ে বর্ষার চার মাস অতিবাহিত করেন। তারপর তিনি বিদায় নেওয়ার জন্য রাজার কাছে গেলেন।

রাজা বললেন, আপনি বুড়ো হয়েছেন। এই বয়সে আপনি হিমালয়ে ফিরে যাবেন কেন? শিষ্যদের হিমালয়ের আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি এখানে থাকুন।

রাজার অনুরোধে তিনি রাজি হলেন। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে বললেন, তোমার ওপর পাঁচশো শিষ্যের দেখা শোনার ভার দিলাম। তুমি তাদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যাও। আমি এখানে থাকব।

বোধিসত্ত্বের এই জ্যেষ্ঠ শিষ্য আগে রাজা ছিলেন। রাজত্ব ছেড়ে এসে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। ধ্যানসাধনা করে তিনি আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন। তিনি গুরুর আদেশ পেয়ে শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যান। সেখানে তপস্বীদের সঙ্গে থাকতে থাকতে তিনি একদিন গুরুদেবকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা এখানে ভালোভাবে থেকো। আমি একবার গুরুদেবকে বন্দনা করে আসি।

এই বলে তিনি বারানসিতে গিয়ে গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হন। গুরুদেবকে বন্দনা করে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তারপর পাশে একখানা মাদুর পেতে শুয়ে পড়েন। ঠিক এ-সময় তপস্বীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজাও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তপস্বীকে বন্দনা করে এক পাশে উপবেশন করলেন।

তপস্বী ধ্যান-সমাধির সুখে বিভোর

নবাগত তপস্বী রাজাকে দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠলেন না। আয়েশ করে শুয়ে থেকে তিনি বলতে লাগলেন, আহা কী সুখ, আহা কী সুখ! রাজা ভাবলেন তপস্বী বোধ হয় তাঁকে অবজ্ঞা করছেন। তা না হলে এভাবে আহা কী সুখ, আহা কী সুখ বলছেন কেন?

বোধিসত্ত্ব বললেন, মহারাজ, এই তপস্বী আগে আপনার মতো রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্বী হয়ে এখন যে-সুখ পেয়েছেন রাজ্য-সুখ ভোগ করার সময় তা পাননি। রাজসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান-সমাধির বিমল সুখে তিনি এখন বিভোর। সেজন্যই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এরকম বলছেন– এরূপ বলে বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য এই গাথা বললেন,

রক্ষকের প্রয়োজন নাহি যার হয়,
অপরের রক্ষা হেতু বিব্রত যে নয়,
কামনা-অতীত সেই পুরুষ-প্রবর,
অপার সুখের স্বাদ পায় নিরন্তর।

অর্থাৎ যাঁর মধ্যে কামনা-বাসনা নেই তিনিই প্রকৃত সুখী। তিনি কারো ছায়ায় নিজেকে রক্ষা করার কথা ভাবেন না। নিজের জন্য কিছু করার কথা তিনি চিন্তা করেন না।

এই ধর্ম উপদেশ শুনে রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রণাম নিবেদন করে প্রাসাদে চলে গেলেন। তপস্বীও বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করে হিমালয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। বোধিসত্ত্ব বারানসিতে থেকে গেলেন। তিনি পূর্ণ বয়সে পূর্ণ জ্ঞানে দেহত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

উপদেশ : ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ।

অনুশীলনমূলক কাজ

বোধিসত্ত্ব কেন হিমালয়ে চলে যান?

রাজা কেন তপস্বীকে দেখে রেগে গেলেন?

অনুশীলনী

শূণ্যস্থান পূরণ কর

১. তিনি হাজার হাজার শুক পাখির ------- ছিলেন।
২. শ্রেষ্ঠী সেই------ থালায় ভাত খেতেন।
৩. বোধিসত্ত্ব নিজ------- রক্ষা করতেন।
৪. ধ্যানসাধনা করে তিনি----------- ধ্যানফলের অধিকারী হন।
৫. যাঁর মধ্যে ------- ------ নেই তিনিই প্রকৃত সুখী। ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শুক সন্তান আমের রস খেতে কোথায় যেত ?
২. বুড়ি ঠাকুরমার সোনার থালার দাম কত ?
৩. লোভী ফেরিওয়ালার লোভের পরিণতি কী হলো ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বোধিসত্ত্ব শুক সন্তানকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন এবং কেন ?
২. 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কথাটি সেরিবানিজ জাতক অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর।
৩. দশরাজধর্মের গুরুত্ব বাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সুখবিহারী জাতকে বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন ?

ক. গভীর বনে খ. হিমালয়ে
গ. নদীর তীরে ঘ. বৌদ্ধবিহারে

২। তপস্বী : আহা কী সুখ ! — এ কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

ক. রাজাকে অবজ্ঞা করার
খ. রাজ্যসুখ ভোগ করার
গ. ধ্যান সমাধির সুখে বিভোর হওয়ার
ঘ. রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সীমান্ত বড়ুয়া পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতা দুইটি গার্মেন্টস শিল্পের মালিক। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি গার্মেন্টস দুইটির মালিক হন এবং নিয়মনীতি পালনে সক্রিয় ছিলেন। তিনি কর্মচারীদের সম্মান করতেন এবং শীল পালনে ও সৎভাবে স্ব-স্ব কাজ সম্পাদনের উপদেশ দিতেন।

৩। সীমান্ত বড়ুয়ার সাথে জাতকে কোন রাজার চরিত্রের মিল পাওয়া যায় ?

ক. জনসন্ধ খ. বেস্‌সান্তর
গ. শিবি ঘ. ইন্দ্র

৪। সীমান্ত বড়ুয়ার উপদেশ পালনে কর্মচারীদের জীবন হতে পারে —

i. সুখকর

ii. শান্তিপূর্ণ

iii. মঙ্গলময়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সৌরভ চাকমা বৃদ্ধ মা-বাবার দেখাশুনা ও সেবাশুশ্রুষা করতেন। বন থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করে পরিবারে ভরণপোষণ করতেন। একদিন বাবা বললেন, "লোভের বশবর্তী হয়ে তুমি গভীর বনে যাবে না, সেখানে গেলে কেউ জীবন নিয়ে ফিরে আসে না।" তবুও প্রচুর কাঠ সংগ্রহের আশায় সে গভীর বনে প্রবেশ করলে বিষধর সাপের কামড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

ক. জাতক কী ?

খ. রাজা ব্রহ্মদত্ত সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেন কেন ?

গ. সৌরভ চাকমার সাথে জাতকে কার চরিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সৌরভের বাবার উপদেশ যুক্তিসংগত, কথাটি জাতকের উপদেশের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। পুরাকালে বারানসিরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বণিক হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। হঠাৎ বণিকের মৃত্যু হওয়াতে তাঁর পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্ব সুবর্ণ হংস হয়ে জন্ম নেন। বোধিসত্ত্ব তাঁর পূর্ব জন্মের পরিবারের অসহায়ত্বের কথা জানতে পেরে একটি করে সোনার পালক বণিকের স্ত্রীর নিকট পৌঁছে দেন, বণিকের স্ত্রী তা বিক্রি করে সংসার চালাত। কিন্তু স্ত্রী ছিল লোভী। একসাথে সব পালক নিতে গিয়ে সুবর্ণ হংসকে মেরে ফেলল। তখন সে হায়! হায়! করতে লাগল।

ক. সুখ বিহারী জাতকের উপদেশ কী ?

খ. জাতকের পঠন-পাঠন আবশ্যক কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. বণিকের স্ত্রীর সাথে জাতকে কার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "বণিকের স্ত্রীর শেষ পরিণতি জাতকের সেরিবা ফেরিওয়ালার সাথে সম্পৃক্ত" – এ কথাটির সাথে তুমি কি একমত ? উত্তরের স্বপক্ষে মতামত দাও।

দশম অধ্যায়

চরিতমালা

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে অনেক রাজা, মন্ত্রী, শ্রেষ্ঠী, উপাসক-উপাসিকা, ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের কর্ম ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁরা এখনও অমর হয়ে আছেন। বৌদ্ধসাহিত্যে এসব মহান ব্যক্তির জীবনচরিত পাওয়া যায়। তাঁদের জীবনাদর্শন অনুকরণীয়, যা অধ্যয়ন করে নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠন করা যায়। এ অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন, বুদ্ধশিষ্যা পূর্ণিকা থেরী, বিশিষ্ট উপাসিকা বিশাখা, রাজা প্রসেনজিত, এবং বাঙালির কুলগৌরব ভিক্ষু শীলভদ্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

* বৌদ্ধ মনীষীদের পরিচয় দিতে পারর ;
* থের–থেরী ও বিশিষ্ট মনীষীদের জীবনী পাঠ করে তাঁদের আদর্শ ও জীবন চরিত ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন

বুদ্ধ-প্রবর্তিত সঙ্ঘে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের অবস্থান ছিল শীর্ষে। তাঁরা ছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক। শ্রাবক শব্দের অর্থ হলো শিষ্য বা যিনি ধর্মীয় বিষয় শ্রবণ-ধারণ-পালন করেন। অতএব, অগ্রশ্রাবক হলো শিষ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ, ধারণ ও পালনে বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন অগ্রগণ্য ছিলেন। সারিপুত্র জ্ঞানে এবং মৌদ্গল্যায়ন ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ধর্মসেনাপতি নামেও পরিচিত ছিলেন। ধর্ম দেশনার সময় সারিপুত্র বুদ্ধের ডানদিকে মৌদ্গল্যায়ন বাম দিকে বসতেন। তাই তাঁদের বুদ্ধের দক্ষিণ ও বাম হস্ত হিসেবে অভিহিত করা হতো।

সারিপুত্রের গৃহী নাম উপতিষ্য। সারি ব্রাহ্মণীর পুত্র ছিলেন বলে তাঁকে সারিপুত্র বলা হতো। তিনি নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত উপতিষ্য গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো তথ্যমতে, তিনি নালক নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপতিষ্য নামেও পরিচিত ছিলেন। সম্ভবত এটি ছিল তাঁর প্রকৃত নাম। কিন্তু পালি সাহিত্যে তাঁকে এ-নামে অভিহিত করতে তেমন একটা দেখা যায় না। গ্রামের নামের সাথে ব্যক্তির নামের সাদৃশ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। কিংবা তাঁদের বংশের নামেই গ্রামটি পরিচিত ছিল। তাঁর পিতার নাম জানা যায় না। তবে তিনি একজন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। সারিপুত্রের তিন ভাই ও তিন বোন ছিলেন। ভাইদের নাম ছিল চুন্দ, উপসেন এবং রেবত। বোনদের নাম ছিল চালা, উপচালা এবং শিশুপচালা। তাঁর সকল ভাই-বোন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হন। সারিপুত্র খুবই প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন।

অপরদিকে, মোগ্গলী ব্রাহ্মণীর পুত্র ছিলেন বলে মৌদ্গল্যায়নকে মোগ্গলীপুত্র বলা হতো। তিনি সারিপুত্রের জন্মদিনে রাজগৃহের কোলিত নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিত্ব। সম্ভবত তাঁর বংশের নামে গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছিল। গ্রামের ঐতিহ্যসম্পন্ন কুল বা বংশের পুত্র ছিলেন বলে তাঁকে কোলিত নামেও ডাকা হতো।

সারিপুত্রের পরিবারের সঙ্গে মৌদ্গল্যায়নের পরিবারের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক ছিল। ফলে তাঁরা দুজনেই ছেলেবেলা থেকে পরম বন্ধু ছিলেন। দুজনে বাস করতেন পাশাপাশি দুটি গ্রামে। তাঁরা প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন।

একদিন দুই বন্ধু একত্রে একটি নাটক দেখতে যান। নাটক দেখে তাঁদের মনে বৈরাগ্য ভাব জাগ্রত হয়। তাঁরা সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর গৃহত্যাগ করে তাঁরা সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্রের শিষ্যত্ব বরণ করেন। সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র ছিলেন একজন পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ। অল্প দিনের মধ্যে তাঁরা গুরুর কাছ থেকে সব বিদ্যা শিখে নেন। তাঁরা গুরুকে জিজ্ঞেস করেন, আচার্য, এতে তো পরম মুক্তির কোনো সন্ধান নেই। আমরা এমন কিছু লাভ করতে চাই, যা লাভ করলে বারবার জন্ম দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করতে হবে না। গুরু সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব থাকেন। তিনি ছিলেন মূলত 'বিক্ষেপবাদী' বা 'সংশয়বাদী'। এ মতবাদীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না, সর্বদা ইতস্তত অবস্থায় থাকেন। অতঃপর, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। কিন্তু কারো নিকট সন্তোষজনক উত্তর ও মুক্তিপথের সন্ধান পেলেন না। তারপর তাঁরা দুজন দুই পথে যাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রত্যাশিত পথপ্রদর্শক গুরুর সন্ধান পেলে একে অপরকে জানাবেন– এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দুজন দুই দিকে যাত্রা করেন।

যাত্রার কিছুদিন পর সারিপুত্র রাজগৃহে বিচরণ করছিলেন। সেখানে একদিন বুদ্ধের শিষ্য অশ্বজিৎ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করছিলেন। এমন সময় অশ্বজিৎ-এর সঙ্গে সারিপুত্রের দেখা হয়। অশ্বজিৎ-এর সৌম্য চেহারা দেখে সারিপুত্র মুগ্ধ হন। তিনি অশ্বজিৎকে জিজ্ঞেস করেন, ভন্তে, আপনি কার শিষ্য? আপনার শাস্তা কে? তিনি কোন বাদী? অশ্বজিৎ বলেন, শাক্যবংশীয় মহাশ্রমণ গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধ আমার গুরু। সারিপুত্র তখন বুদ্ধের ধর্মমত জানতে চান। তখন অশ্বজিৎ তাঁকে বুদ্ধভাষিত একটি গাথা বলেন। গাথাটির মর্মবাণী হলো : পৃথিবীর সকল কিছুর উৎপত্তির সাথে কারণ নিহিত থাকে। কারণ ছাড়া কোনো কিছুই উৎপন্ন হয় না। বুদ্ধ বলেছেন, সেই কারণেরও নিরোধ আছে। পরম নির্বাণ লাভের মাধ্যমেই এই শান্তি অর্জিত হয়। এটিই বুদ্ধের মতবাদ। অতএব বুদ্ধ নির্বাণবাদী। গাথাটি শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। অতপর সারিপুত্র গিয়ে মৌদ্গল্যায়নকে বিষয়টি জ্ঞাত করেন। সারিপুত্রের কাছে মৌদ্গল্যায়ন গাথাটি শ্রবণ করে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। অতঃপর তাঁরা বুদ্ধের কাছে যাওয়ার জন্য স্থির করেন। সারিপুত্র কৃতজ্ঞতাস্বরূপ গুরু সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্রকেও বুদ্ধের কাছে নিয়ে যেতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু অনেক অনুনয় করার পরও তিনি বুদ্ধের কাছে যেতে রাজি হলেন না। তখন সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্রের পাঁচশত শিষ্যসহ বুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।এতে সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হলেন। সে-সময় বুদ্ধ সারনাথে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' দেশনা করে রাজগৃহের বেণুবন আরামে সশিষ্য বসবাস করছিলেন।

২০২৩

সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন অনুগামীদের নিয়ে রাজগৃহে বুদ্ধের সমীপে পৌঁছলেন। এ সময় বুদ্ধ শিষ্যদের ধর্মদেশনা করছিলেন। বুদ্ধ দূর থেকে তাঁদের আসতে দেখেন এবং দিব্য জ্ঞানে তাঁদের অভিলাষ জ্ঞাত হলেন। বুদ্ধ তাঁদের ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষিত করলেন। সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন ব্যতীত অনুগামীগণ দীক্ষাস্থলেই অর্হত্ব ফল লাভ করলেন। দীক্ষিত হওয়ার সাত দিনে মৌদগল্যায়ন এবং পনেরো দিনে সারিপুত্র অর্হত্ব ফলে উন্নীত হন। দীক্ষার দিন ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সমাবেশে বুদ্ধ সারিপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নকে অগ্রশ্রাবক হিসেবে ঘোষণা করে পাতিমোক্ষ দেশনা করেন। এই পদ লাভের জন্য তাঁদেরও জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা ছিল। বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে আশিজন মহাশ্রাবক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এ দুজন ছিলেন অগ্রশ্রাবক।

সারিপুত্র ছিলেন মহাপ্রজ্ঞাবান। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণগুলো তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারতেন। সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ হলো : "মানুষ মরণশীল। যে-কোনো সময় মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তাই শীলাদি ধর্ম পরিপূর্ণ কর। যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ কর। দুঃখে পতিত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়ো না। শত্রুর ভয়ে নগরের ভিতর-বাহির যেমন সুরক্ষিত করা হয়, তেমনি নিজেকে সুরক্ষিত করে সর্বপ্রকার পাপ হতে মুক্ত রাখো। যারা শীলাদি পালন করে না, যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করে না, তারা নরকে পতিত হয়ে শোক করে থাকে।"

মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন ঋদ্ধিশক্তিতে অদ্বিতীয়। প্রজ্ঞায় সারিপুত্রের পরে ছিল তাঁর স্থান। এই ঋদ্ধিশক্তিই ছিল তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তির উৎস। ঋদ্ধিবলেই তিনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার করতেন। এমনকি নরকে গিয়ে নারকীয় দুঃখ দেখে এসে অন্যদের কাছে উপদেশ দিতেন। এজন্য তার দেশনা ছিল সবসময় চিত্তগ্রাহী। তাঁর দেশনায় নতুন নতুন বিষয় যেমন উপস্থাপিত হতো তেমনি পরিবেশন করা হতো সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়।

অর্হত্ব ফলে উন্নীত হয়ে মৌদ্‌গল্যায়ন তাঁর অনুগামী ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে গাথায় তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। এতে তাঁর জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতাও নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ভাষিত কয়েকটি গাথার সারমর্ম এখানে তুলে ধরা হলো : "এ দেহ অশুচি, দুগন্ধপূর্ণ, বিষ্ঠা ও কৃমিকুলের আধার। এ দেহের প্রতি কেন মমতা করছ ? শরীরের নয় দ্বার দিয়ে দিবারাত অশুচি নির্গত হচ্ছে। বিষ্ঠা দেখে যেমন সবাই এড়িয়ে চলে, তেমনি ভিক্ষুগণ এই অশুচিপূর্ণ দেহকে বর্জন করে।"

সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন এই দুই অগ্রশ্রাবক বুদ্ধের পূর্বে পরিনির্বাণ লাভ করেন। সারিপুত্রের পনেরো দিন পর মৌদ্‌গল্যায়ন পরিনির্বাণ লাভ করেন। অর্হত্ব ফলে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে তাঁরা তাঁদের মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই পরিনির্বাণের পূর্বে যথাসময়ে তাঁরা বুদ্ধকে বন্দনা করে যথাপোযুক্ত স্থানে পরিনির্বাণের অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। সারিপুত্র থের নির্বাণপ্রাপ্ত হন নিজ জন্মস্থানে মাতৃগৃহে। মৌদ্‌গল্যায়ন থের পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলে কালশৈল পর্বতে ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করেন। কারণ অতীতজন্মে তিনি তাঁর স্ত্রীর প্ররোচনায় বয়োবৃদ্ধ অন্ধ পিতামাতাকে গভীর বনে জন্তু–জানোয়ারের সামনে মৃত্যুর মুখে ফেলে এসেছিলেন। পরিণতিতে তাঁকেও এভাবে মৃত্যুবরণ করতে হলো। মৌদ্‌গল্যায়নের পবিত্র দেহধাতু বুদ্ধের নির্দেশে বেণুবন বিহারের পূর্বদ্বারে রাখা হয়। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক তথাগত বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে সারিপুত্রের দেহভস্মের ওপর শ্রাবস্তীতে এক স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। এই দুই অগ্রশ্রাবক প্রাঞ্জল ভাষায় বুদ্ধবাণী ব্যাখ্যা করতে পারতেন। মহৎ কর্মের জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁরা অমর হয়ে আছেন।

তথাগত বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের জীবন-চরিত পাঠে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, একাগ্রতা ও অধ্যাবসায় থাকলে অবশ্যই মানুষ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে পারে এবং মানুষের জীবনের কোনো কর্মই বৃথা যায় না। ভালো বা মন্দ কর্মের জন্য যথোপযুক্ত ফল রয়েছে। যেমন অতীত কর্মের জন্য মৌদ্গল্যায়নকে ঘাতকের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তাই গোপনে বা কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কখনোই কোনো মন্দ কাজ করা উচিত নয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন প্রথমে কার শিষ্য ছিলেন?

সঞ্চয় বেলট্ঠীপুত্র কোন মতবাদী ছিলেন?

সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ কী ছিল?

মৌদ্গল্যায়ন ভাষিত গাথাগুলোর মর্মকথা লেখ।

পাঠ : ২

বিশাখা

বুদ্ধের সময় অঙ্গরাজ্যের ভদ্দিয় নগরে উচ্চবংশজাত ধনবান এক উপাসক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী। ধনঞ্জয় নামে তাঁর এক পুত্র ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সুমনাদেবী। তাঁরা অত্যন্ত ধার্মিক এবং দান ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। তাঁদেরই কোল আলো করে জন্ম নিয়েছিলেন বিশাখা। ছোটকাল থেকে বিশাখা অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। দান ও বিবিধ কল্যাণকর্মের জন্য তাঁর খুবই সুখ্যাতি ছিল। দানকর্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে সেবা করার জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

এক সময় সেল নামক এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর অনুগামী প্রায় তিন শতাধিক শিষ্যকে দীক্ষা প্রদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বুদ্ধ সশিষ্য ভদ্দিয় নগরে এসেছিলেন। বুদ্ধের আগমন উপলক্ষে বিশাখার পিতামহ মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী বিশাখাকে নিয়ে বুদ্ধ দর্শনে গিয়েছিলেন। তখন বিশাখার বয়স ছিল সাত বছর। বিশাখার সাথে ছিল পাঁচশত সখী, পাঁচশত পরিচারিকা এবং পাঁচশত সুসজ্জিত রথ। বিশাখার সুযোগ হয় বুদ্ধকে কাছে গিয়ে বন্দনা করার। বুদ্ধ বিশাখার জন্মান্তরে অর্জিত পুণ্যরাশি অবগত হয়ে তাঁকে ধর্ম দেশনা করেন। উপস্থিত সকলে গভীর শ্রদ্ধাচিত্তে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন। বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে পাঁচশত সখীসহ বিশাখা এবং মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী শ্রদ্ধাবণত হয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বুদ্ধকে পরদিন তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং পরদিন যথাসময়ে তিনি সশিষ্য মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হন। মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বুদ্ধকে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়ন করেন। বুদ্ধ তাঁদের ধর্ম দেশনা করেন। এতে বিশাখাসহ মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী পরিবারের সদস্যরা অপার আনন্দ অনুভব করেন। তাঁরা ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বুদ্ধকে আরও পনেরো দিনের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। বুদ্ধ তাঁদের শ্রদ্ধা ভক্তি দেখে সম্মতি প্রদান করেন। ফলে শৈশব কালেই বিশাখা বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ এবং বুদ্ধকে সেবা করার এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন।

কালক্রমে বিশাখা বিবাহযোগ্যা হয়ে ওঠেন। পিতামাতা তার বিয়ের জন্য তৎপর হলেন। সে সময় শ্রাবস্তীতে মিগার নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁর পুণ্যবর্ধন নামে এক পুত্র ছিল। পারিবারিক উদ্যোগে পুণ্যবর্ধনের সঙ্গে বিশাখার বিয়ে হয়। বিশাখার বাবা বিশাখাকে বহু দাসদাসী, রথ ও মহামূল্য মণিমুক্তা উপহার দিয়ে শ্বশুর বাড়িতে পাঠান। শ্বশুরালয়ে পরস্পর শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাসের জন্য বিশাখার পিতা বিশাখাকে দশটি উপদেশ প্রদান করেন। এই দশটি উপদেশ সর্বজনীন উপদেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়। এ-দশটি উপদেশ হলো :

১. ঘরের আগুন বাহিরে নিও না। অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ির কারো দোষ দেখলে তা বাইরের কাউকে বলবে না।

২. বাইরের আগুন ঘরে এনো না। অর্থাৎ প্রতিবেশী কেউ শ্বশুর বাড়ির কারো দোষের কথা বললে তা তোমার শ্বশুর বাড়ির কারো কাছে প্রকাশ করো না।

৩. যে দেয় তাকে দেবে। অর্থাৎ কেউ কিছু ধার নিয়ে ফেরত দিলে তাকে ধার দেবে।

৪. যে দেয় না তাকে দিয়ো না। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি কোনকিছু ধার নিয়ে ফেরত দেয় না তাকে ধার দিয়ো না।

৫. যে দেয় অথবা না দেয় তাকেও দেবে। অর্থাৎ কোনো আত্মীয় গরিব হলে, ধার নিয়ে ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে তাকেও ধার দিয়ো।

৬. সুখে আহার করবে। অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ির গুরুজনদের খাওয়া শেষ হলে এবং অন্যান্যদের খাওয়া সম্পর্কে খবর নিয়ে তারপর নিজের আহার গ্রহণ করবে।

৭. সুখে উপবেশন করবে। অর্থাৎ এমন স্থানে বসবে যে স্থান থেকে গুরুজনদের দেখে উঠতে না হয়।

৮. সুখে শয়ন করবে। অর্থাৎ যাবতীয় গৃহকর্ম সমাধা করে গুরুজনদের শয়নের পর শয়ন করবে।

৯. অগ্নির পরিচর্যা করবে। অর্থাৎ গুরুজন ও ছোটদের সচেতনতার সাথে প্রয়োজনীয় সেবা শুশ্রূষা করবে।

১০. শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে।

বিবাহ অনুষ্ঠানসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে আজও এই উপদেশসমূহ প্রদান করা হয়। পারিবারিক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে এ উপদেশগুলোর ভূমিকা অপরিসীম।

বিশাখার শ্বশুর মিগার শ্রেষ্ঠী এ বিয়েতে সাত দিনব্যাপী উৎসব পালন করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ বিয়েতে যোগদান করেছিলেন।

বিশাখা শ্বশুরালয়ে সমস্ত কাজ নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করার চেষ্টা করতেন। এতে শ্বশুর–শ্বাশুড়িও তাঁর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু মিগার শ্রেষ্ঠী ছিলেন কিছু ভ্রান্তধারার অনুসারী সন্ন্যাসীর ভক্ত। এ সন্ন্যাসীরা বিবস্ত্র থাকতেন। মিগার শ্রেষ্ঠীর গৃহে তারা প্রায় আসতেন। একদিন গুরুপূজা উপলক্ষে মিগার শ্রেষ্ঠী

বিশাখাকে তাঁদের সামনে নিয়ে যান। বিশাখা দেখলেন গুরু সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। বিশাখা এতে বিরক্তি প্রকাশ করেন। সন্ন্যাসীরা বিশাখার ভাব বুঝতে পারেন। তাঁরা শ্রেষ্ঠীকে বললেন, এই রমণী গৌতমের শিষ্যা, একে ঘর থেকে বের করে দাও। তা না হলে তোমার সর্বনাশ হবে। এতে শ্রেষ্ঠী খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন।

একদিন মিগার শ্রেষ্ঠী মহাপালঙ্কে বসে মধুপায়েস খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক পিণ্ডাচারী বৌদ্ধভিক্ষু মিগার শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে ভিক্ষার জন্য আসেন। শ্রেষ্ঠী তাঁকে দেখেও কোনোকিছু দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। শ্বশুরের অনুমতি ছাড়া বিশাখার পক্ষেও কোনোকিছু দেওয়া সম্ভব নয়। তখন বিশাখা আগন্তুক ভিক্ষুকে বললেন, ভন্তে, আপনি অন্যত্র যান। আমার শ্বশুর বাসি খাবার খাচ্ছেন। মিগার শ্রেষ্ঠী একথা শুনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হলেন। বিশাখাকে বললেন, তুমি এ বাড়ি থেকে চলে যাও। তিনি বিশাখাকে বের করে দিতে দাসদাসীদের আদেশ দিলেন। কিন্তু বাড়ির অন্তঃপুরের সকলেই ছিল বিশাখার ভক্ত। একথা শুনে বিশাখা বললেন, আমি ক্রীতদাসী নই, আমাকে ইচ্ছা করলে তাড়িয়ে দেয়া যায় না। আমার পিতা আটজন সম্ভ্রান্ত নীতিজ্ঞলোককে সাক্ষী করেই আমাকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়েছেন। তাঁদের আহ্বান করুন। তাদের বিচারে দোষী হলে আমি চলে যাব। অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি শ্বশুরালয় ত্যাগ করব না। ক্রোধগ্রস্ত মিগার শ্রেষ্ঠী সাক্ষীদের আহ্বান করলেন। তাঁরা বিশাখাকে কেন ঐরূপ ব্যবহার করলেন তা জানতে চান। উত্তরে বিশাখা বললেন, আমার শ্বশুর 'বাসি' খাবার খাচ্ছেন বলার অর্থ এই যে, তিনি পূর্বজন্মের পুণ্যফলের প্রভাবে অর্জন করা খাবার খাচ্ছেন। নীতিজ্ঞলোকদের বিচারে বিশাখার জয় হয়।

আর একদিন রাতে বিশাখা ঘরের বাতি হাতে নিয়ে বাইরে গিয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠী এর কারণ জানতে চাইলেন। বিশাখা বললেন, ঘোড়ার বাচ্চা প্রসবের খবর পেয়ে দাসীদের নিয়ে আলো হাতে তিনি অশ্বশালায় গিয়েছিলেন। তখন শ্রেষ্ঠী বললেন, তোমার পিতা তোমাকে ঘরের আগুন বাইরে নিতে নিষেধ করেছিলেন না? তাঁর উপদেশ তুমি অমান্য করলে কেন? বিশাখা বললেন, হ্যাঁ, নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উপদেশ আমি অমান্য করিনি। সেই উপদেশ অনুসারেই আমি চলছি। ঘরের আগুন বাইরে না নেয়া বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, শ্বশুর বাড়ির কোনো কথা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ না করা। আমি নিজ গৃহের নিন্দা ও কুৎসা বাইরে প্রকাশ করি না। এসময় বিশাখা তাঁর বাবার অন্যান্য উপদেশগুলোও শ্বশুরকে ব্যাখ্যা করেন। মিগার শ্রেষ্ঠী তখন নিজের ভুল বুঝতে পারেন।

এদিকে বিশাখা বারবার অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ায় পিত্রালয়ে চলে যাবার জন্য মনস্থির করলেন। বিশাখা শ্বশুরকে বললেন, এখন আমি পিতৃগৃহে চলে যেতে প্রস্তুত। তখন মিগার শ্রেষ্ঠী নিজের দোষ স্বীকার করেন এবং বিশাখাকে পিত্রালয়ে চলে যাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বারবার অনুরোধ করতে থাকেন। শ্বশুরের এ বিনীতভাব দেখে বিশাখা বললেন, আপনি বিবস্ত্র সন্ন্যাসীদের ভক্ত। আমি ত্রিরত্নের উপাসিকা। বুদ্ধশাসনে গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলের কন্যা আমি। ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা না করে আমি থাকতে পারি না। যদি আমাকে নিজের অভিরুচি অনুযায়ী দান করতে এবং ধর্মকথা শুনতে অনুমতি দেন তাহলে আমি থাকতে পারি। মিগার শ্রেষ্ঠী তাঁর কথায় রাজি হলেন।

২০২৭

এর অল্পদিন পরে বিশাখা ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বুদ্ধকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ সশিষ্য মিগার শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে যাচ্ছেন এ খবর পেয়ে বিবস্ত্র সন্ন্যাসীরাও এসে বাড়ির বাইরে অবস্থান নেন। তাঁদের শঙ্কা মিগার শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের দীক্ষা নিলে তাঁরা দান-দক্ষিণা থেকে বঞ্চিত হবেন। এ ভয়ে তাঁরা মিগার শ্রেষ্ঠীকে ভিক্ষুদের সাথে দেখা করতে নিষেধ করেন। তাঁদের উপদেশ মতো মিগার শ্রেষ্ঠী ভিক্ষুদের দেখে নিজের কক্ষে বসে রইলেন। বিশাখা যাবতীয় দান সাজিয়ে শ্বশুরকে ডাকলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠী বিবস্ত্র সন্ন্যাসীদের কথামতো দানকাজ শেষ করতে বলেন। বিশাখা সশ্রদ্ধ চিত্তে বুদ্ধসহ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন। দানকর্ম সম্পন্ন হলে বিশাখা ধর্মকথা শুনতে শ্বশুরকে আহবান করেন। শ্রেষ্ঠী তখন ভাবলেন, এখন না গেলে খুব অভদ্রতা হবে। এরূপ চিন্তা করে তিনি যেতে উদ্যত হলেন। এ সময় বিবস্ত্র সন্ন্যাসীরা বললেন, শ্রমণ গৌতমের ধর্ম শুনলে পর্দার আড়াল থেকে শুনবে। কারণ এই সন্ন্যাসীরা মনে করতেন বুদ্ধের মায়াবী ক্ষমতা আছে। সেই মায়ার বলে মিগার শ্রেষ্ঠীকে মুগ্ধ করে তাঁর শিষ্য করে নেবেন।

সন্ন্যাসীদের নির্দেশমতো মিগার শ্রেষ্ঠী পর্দার আড়ালে গিয়ে বসলেন। বুদ্ধ বললেন, শ্রেষ্ঠী আপনি পর্দার অন্তরালে, প্রাচীরের অন্তরালে, পাহাড়ের অন্তরালে অথবা দিকচক্রবালের অন্তরালে যেখানেই বসুন না কেন, আমার শব্দ সর্বত্র ঘোষিত হবে। এই বলে মহাকারুণিক বুদ্ধ ধর্মদেশনা শুরু করলেন। প্রথমে শ্রেষ্ঠীর আগ্রহ না থাকলেও ক্রমে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। বুদ্ধের দেশনা শেষ হলে শ্রেষ্ঠী স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তারপর তিনি বুদ্ধের সামনেই পুত্রবধূ বিশাখাকে জ্ঞানদায়িনী মাতা বলে সম্বোধন করে বললেন, মা তুমি এতদিনে এই সন্তানকে উদ্ধার করলে। সেই থেকে বিশাখাকে 'মিগারমাতা' নামে অভিহিত করা হয়।

এরপর হতে মিগার শ্রেষ্ঠীর গৃহে বিশাখার উদ্যোগে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিত্য মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রেষ্ঠী নিজেও বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। বিশাখা আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে শ্রাবস্তীতে একটি বিশাল বিহার নিমার্ণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেছিলেন। এটিকে পূর্বারাম বিহার বলা হয়। এ বিহার নির্মাণ কাজে তদারকি করার জন্য বিশাখা বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক মৌদ্গল্যায়নের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। মৌদ্গল্যায়ন পাঁচশত শিষ্যসহ বিহার নির্মাণে সহায়তা করেন। কথিত আছে যে, মৌদ্গল্যায়ন নিজের ঋদ্ধিশক্তির প্রভাবে মাত্র নয় মাসে বিহার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করান। দ্বিতলবিশিষ্ট এ বিহারের কক্ষের সংখ্যা ছিল এক হাজার। প্রত্যেকটি কক্ষ বিশাখা নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিহার দান উপলক্ষে চারমাস ব্যাপী উৎসব হয়েছিল। এর জন্য বিশাখাকে আরও নয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করতে হয়েছিল। বুদ্ধ পূর্বারাম বিহারে বিভিন্ন সময়ে ছয় বর্ষাবাসব্রত পালন করেছিলেন। সে সময় বিশাখা নিত্যকর্মের মতো প্রতিদিন তিনবার খাদ্যভোজ্য, প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্য ও ধূপ ইত্যাদি নিয়ে বিহারে যেতেন। এক সময় বিশাখা বুদ্ধের কাছে আটটি বর প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তা অনুমোদন করেছিলেন, এ বর গুলো বিশাখার ত্যাগ মহিমার নতুন দিক উন্মাচিত করেছে। বরগুলো হলো :

১. বিশাখা আজীবন বুদ্ধের কাছে আগত যে কোনো অতিথি ভিক্ষুর আহার্য দান করবেন।

২. বিশাখা আজীবন ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্নানবস্ত্র প্রদান করবেন।

৩. বিশাখা আজীবন অসুস্থ ভিক্ষুর যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৪. বিশাখা আজীবন অসুস্থ ভিক্ষুদের পরিচর্যাকারীদেরও আহার্য দান করবেন।
৫. বিশাখা আজীবন বিহারের অসুস্থ ভিক্ষুদের জন্য প্রয়োজনীয় পথ্য সরবরাহ করবেন।
৬. বিশাখা আজীবন ভিক্ষুদের যাগু–অন্ন দান করবেন।
৭. বিশাখা আজীবন ভিক্ষুণীদের স্নানবস্ত্র প্রদান করবেন।

বিশাখার এ বরপ্রার্থনার মধ্যে তাঁর গভীর দানচেতনা ও উদারতার প্রকাশ ঘটেছে। এভাবে বিশাখা সানন্দে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবায় নিয়োজিত হয়ে অপরিসীম পুণ্য সঞ্চয় করেন। বিশাখার বাড়িতে প্রত্যহ পাঁচশত ভিক্ষু আহার গ্রহণ করতেন। বিশাখার দশ পুত্র ও দশ কন্যা ছিল। তাঁদের প্রত্যেকেরও দশটি করে সন্তান ছিল। এভাবে তাঁরা সবাই বলশালী ও সম্পদশালী হয়ে সুখে বাস করতেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশাখা 'মহা উপাসিকা' নামে খ্যাত হন। এই মহাউপাসিকার জীবনী হতে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, ভোগ নয়, ত্যাগই মানুষকে মহৎ ও মহান করে। তাই সকলের দান ও ত্যাগের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিশাখার পিতা বিশাখাকে কয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন?

শ্বশুরকে বিশাখা কীভাবে দীক্ষা প্রদান করেন?

বুদ্ধের নিকট বিশাখা কয়টি বর প্রার্থনা করেছিলেন? সেগুলো কী কী?

পাঠ : ৩

রাজা প্রসেনজিত

রাজা প্রসেনজিত ছিলেন কোশলের রাজা। শ্রাবস্তী ছিল কোশলের রাজধানী এবং খুবই সমৃদ্ধশালী নগরী। শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। এখানে তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতি বিজড়িত আছে। তাই শ্রাবস্তী বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থস্থান। এর বর্তমান নাম সাহেত-মাহেত। এটি বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। প্রসেনজিত ছিলেন কোশলের রাজা মহাকোশলের পুত্র এবং বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি তক্ষশিলায় লেখাপড়া করেন। লিচ্ছবি মহালি এবং মল্ল রাজপুত্র ভণ্ডুল ছিলেন তাঁর সহপাঠী। তিনি বিভিন্ন রকম বিদ্যা ও শিল্পকলা শিখে তক্ষশিলা থেকে ফিরে আসেন। পিতা মহাকোশল বিদ্যা ও শিল্পকলায় তাঁর পারদর্শিতা দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে কোশলের সিংহাসনে অধিকারী করান। রাজ্যভার গ্রহণ করে তিনি খুবই নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন। তিনি জ্ঞানী ও সাধু ব্যক্তিদের খুব ভালোবাসতেন এবং তাঁদের সঙ্গ উপভোগ করতেন। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পরপরই রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের অনুসারী হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি বুদ্ধের উপাসক হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন।

বুদ্ধের অনুসারী হলেও রাজা প্রসেনজিত অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। জানা যায় তিনি একবার মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন কিন্তু বুদ্ধের উপদেশে তিনি যজ্ঞে বলি প্রদানের জন্য সে সকল পশু যোগাড় করা হয়েছিল সে সকল পশুকে মুক্তি দেন এবং পরবর্তীকালে যজ্ঞ ও পশুবলি পরিত্যাগ করেন। তিনি প্রায় সময় বুদ্ধের নিকট গমন করতেন এবং অনেক বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করতেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সংযুক্ত নিকায়ে কোশল সংযুক্ত নামে একটি অধ্যায় আছে, সেখানে কোশলরাজ প্রসেনজিতকে উদ্দেশ্য করে বুদ্ধের অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। এক সময় বুদ্ধ তাঁকে সীমিত আহারের উপদেশ দেন। তিনি বুদ্ধের উপদেশ পালন করে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন।

মল্লিকাদেবী ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিতের স্ত্রী। তিনি এক উদ্যান পালকের কন্যা ছিলেন। কিন্তু তিনি খুবই বুদ্ধিমতি ছিলেন। রাজা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। যে-কোনো বিষয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি রানিকে জিজ্ঞাসা করলেন, রানি! তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাস? তিনি উত্তরে বললেন, পৃথিবীতে নিজের চেয়ে আপন কেউ নেই। রানি খুবই ধার্মিক ছিলেন। তাই তিনি সত্য কথা বললেন। রাজা একথা বুদ্ধকে জ্ঞাত করলে বুদ্ধ মল্লিকার কথা সত্য বলে সমর্থন করেন। বিবাহের পর মল্লিকা এক কন্যাসন্তান প্রসব করেন। কন্যাসন্তান জন্মের কারণে রাজা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে বুদ্ধ বলেন, শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্ত করে তুলতে পারলে নারীরাও পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে, সুন্দরভাবে রাজ্যশাসন করতে পারে।

রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধকে এতই শ্রদ্ধা করতেন যে, বুদ্ধের বংশের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি করার জন্য তিনি খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলেন। রাজা প্রসেনজিত সশিষ্য বুদ্ধকে একসপ্তাহের জন্য নিমন্ত্রণ করে উত্তম খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়ন করেন। সপ্তম দিবসে তিনি বুদ্ধকে প্রতিদিন তাঁর গৃহে ভোজন গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধ অপরাগতা প্রকাশ করে আনন্দকে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য বলেন। আনন্দ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ প্রতিদিন রাজার গৃহে ভোজন গ্রহণ করতে যেতেন। রাজা ব্যস্ত থাকায় তাঁদের পরিচর্যা করতে পারতেন না। ভিক্ষুসঙ্ঘ অবহেলা ভেবে ভোজন গ্রহণ হতে বিরত থাকেন। এতে রাজা প্রসেনজিত অতীব মনোকষ্ট পান। ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা ও বুদ্ধের বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা করার জন্য শাক্যজাতির কন্যা বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর তিনি শাক্যরাজের কাছে দূত প্রেরণ করেন। সে সময় শাক্যরা নিজ সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করত না। প্রসেনজিত ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজা। তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে শাক্যদের বিপদ হতে পারে ভেবে তাঁরা বিকল্প ব্যবস্থা করেন। এ সময় শাক্যদের রাজা ছিলেন মহানাম। মহানামের এক কন্যা বাসবক্ষত্রিয়া নাগমুণ্ডা দাসীর গর্ভে জন্মেছিল। তাঁকে তিনি রাজা প্রসেনজিতের সঙ্গে বিয়ে দেন। বাসবক্ষত্রিয়ার এক পুত্র হয়। তার নাম বিড়ুঢ়ভ। বিড়ুঢ়ভ মামাবাড়িতে এসে কখনো মর্যদা পেতেন না। শাক্যরা একবার বিড়ুঢ়ভকে দাসীর পুত্র বলে অপমান করে। বিড়ুঢ়ভ এতে খুব ক্ষিপ্ত হন। তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এক সময় কোশলের সেনাপতির সাহায্যে তিনি পিতা রাজা প্রসেনজিতকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজ্য ক্ষমতা দখল করেন। প্রসেনজিত শ্রাবস্তীতে পালিয়ে যান। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সেখানে মৃত্যু বরণ করেন। তারপর বিড়ুঢ়ভ কপিলাবস্তু আক্রমণ করেন এবং শাক্যদের নির্মূল করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে দেশে ফেরার সময় তিনি প্লাবনের জলে পতিত হয়ে সসৈন্যে নিহত হন।

রাজা প্রসেনজিতের সমকালীন প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মগধরাজ বিম্বিসার, উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত, কোশাম্বীরাজ উদয়ন প্রমুখ। রাজা প্রসেনজিত এবং রাজা বিম্বিসার ছিলেন পরস্পর আত্মীয়। বিম্বিসার রাজা প্রসেনজিতের বোন কোশলদেবীকে বিবাহ করেন। রাজা বিম্বিসার উপঢৌকনস্বরূপ রাজা প্রসেনজিতের কাছ হতে কাশী রাজ্য লাভ করেন। কাশী মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে মগধরাজ-বিম্বিসারের সাথে রাজা প্রসেনজিতের গড়ে ওঠে সৌহাদ্যময় সুসম্পর্ক। বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রু এ সময় রাজকার্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি এক সময় অন্যের প্ররোচনায় পিতাকে কারাবন্দি করেন এবং কারাবন্দি অবস্থায় রাজা বিম্বিসারের মৃত্যু হয়। এ খবর শুনে রাজা প্রসেনজিত ক্ষুব্ধ হয়ে কাশী রাজ্য ফিরিয়ে নেন। এ কারণে প্রসেনজিতের সঙ্গে অজাতশত্রুর কয়েকবার যুদ্ধ হয়। চতুর্থবারে তিনি অজাতশত্রুকে পরাজিত করতে সমর্থ হন এবং সিংহাসন ত্যাগ না করা পর্যন্ত বন্দি করে রাখেন। পরে তিনি নিজকন্যা বজিরাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন এবং পুনরায় কাশী রাজ্য উপঢৌকন দেন। একথা শুনে বুদ্ধ উপদেশস্বরূপ বলেন, "যে লোক জয় লাভ করে তার শত্রু বাড়ে। যে পরাজিত হয় তার মর্মবেদনা বাড়ে। কিন্তু যার জয়-পরাজয় নেই সে সর্বদা শান্তি উপভোগ করতে পারে।"

রাজা প্রসেজিতের বোন সুমনা সঙ্ঘে প্রবেশ করে ভিক্ষুণী হন এবং বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ ও অনুসরণ করে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজা প্রসেনজিত এবং তাঁর স্ত্রী মল্লিকাদেবী বুদ্ধ এবং সঙ্ঘকে দান করতে খুবই ভালোবাসতেন।

প্রসেনজিত শ্রাবস্তীর জেতবনে রাজকারাম বিহার নির্মাণ করান। তাঁর প্রধান মহিষী মল্লিকাদেবীর অনুরোধে এখানে একটি অতিথিশালা নির্মাণ করেন। এটি 'মল্লিকারাম' নামে খ্যাত হয়। এখানে বসে বুদ্ধ ধর্মদেশনা করেছিলেন। শ্রাবস্তীর অদূরে একটি গভীর বন ছিল। তার নাম ছিল অঞ্জন বন। রাজা প্রসেনজিত এখানে শিকার করতেন। বুদ্ধের শিষ্য গবম্পতি এখানে বাস করতেন। থেরী সুজাতা এখানে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণের পর হতে প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করেন।

প্রসেনজিত অত্যন্ত দানপরায়ণ ছিলেন। একবার তিনি বুদ্ধকে পাঁচশত শিষ্যসহ জেতবনে নিমন্ত্রণ করেন। তখন তিনি নগরবাসীদের ডেকে বললেন, তোমরা এসে আমার দান দেখ। নগরবাসীরা রাজার দান দেখলেন। তারপর নগরবাসীরাও সশিষ্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে রাজাকে বললেন, মহারাজ, আপনি আমাদের দান দেখুন। রাজা তাঁদের দান দেখে ভাবলেন প্রজারা আমার চেয়ে অনেক বেশি দান করেছে। আমি আবার মহাদানের ব্যবস্থা করব। এভাবে রাজা ও প্রজাদের মধ্যে দানের প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় রাজা বারবার পরাজিত হয়ে ভাবলেন, আমি প্রজাদের মতো দান কী কখনো দিতে পারব না ?

রানি মল্লিকা এই বিষয়ে জানতে পেরে একটি মহাদানের আয়োজন করেন। সেই দানানুষ্ঠানে রাজা নিজের হাতে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করলেন। এ মহাদানে প্রায় চৌদ্দ কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল। বুদ্ধকে বন্দনা করে তিনি বললেন, ভন্তে, আমার এই দানে আপনাদের ব্যবহারের যাবতীয় উপকরণ আছে। রাজা আরও বললেন, যুদ্ধ ও রাজ্যবিস্তারে আমি এখন আনন্দ লাভ করি না। আমি সুখে শান্তিতে বাকি জীবন অতিবাহিত

২০২৩

করতে চাই। উত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন দানে দ্রব্য সম্ভারের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ নয়। চিত্তের একাগ্রতা ও শ্রদ্ধা ভক্তি হলো মূল। পরিবর্তীতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার, বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা, সুশাসন এবং মহতী দানকর্মের জন্য রাজা প্রসেনজিত এবং রানি মল্লিকাদেবী বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিড়ুঢ়ভ কেন শাক্যদের নিধন করেছিলেন?

কোন কোন রাজা বুদ্ধের সমসায়িক ছিলেন?

রাজা প্রসেনজিত ও রাজা বিম্বিসারের মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল?

পাঠ : ৪

পূর্ণিকা থেরী

এই নারী জন্মজন্মান্তরের পুণ্যসঞ্চয়পূর্বক বিপস্‌সি বুদ্ধের সময় এক সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তিনি ভিক্ষুণীদের নিকট গিয়ে ধর্ম শ্রবণ করে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। তিনি সম্যকরূপে শীল পালনপূর্বক ভিক্ষুণী জীবন পালন করতে থাকেন। তিনি একাগ্রতা সহকারে ত্রিপিটক অধ্যয়নপূর্বক তাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু অভিমানজনিত কর্মফলে তিনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের গৃহের কৃতদাসের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় পূর্ণিকা। কথিত আছে যে, তাঁর জন্মের পর সেই গৃহে সন্তানসংখ্যা একশত পূর্ণ হওয়ায় তাঁর নাম রাখা হয় পূর্ণা বা পূর্ণিকা।

বুদ্ধের সিংহনাদ নামে খ্যাত উপদেশ শ্রবণ করে তিনি স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। তৎপর তিনি উদকশুদ্ধি এক ব্রাহ্মণকে যুক্তি দ্বারা স্বমতে আনতে সমর্থ হন। এতে প্রভু তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। মুক্তি পেয়ে তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। ঘটনাটি এরূপ-দাসী জীবনে ভোর বেলা নদী থেকে জল আহরণ করা ছিল পূর্ণিকার নিত্যকর্ম। প্রভুর দণ্ড ও কটুবাক্যের ভয়ে তিনি শীতের ভোরেও নদীতে নেমে জল আহরণ করতেন।

তিনি যে নদীতে জল আনতে যেতেন সে নদীতে হাড়কাঁপানো শীতের ভোরে পাপমুক্ত হওয়ার জন্য এক উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণ স্নান করতেন। উদকশুদ্ধি হলো জলে ভিজে জীবন শুদ্ধ করার ব্রত। একদিন পূর্ণিকা ব্রাহ্মণকে শীতের ভোরে নদীর জলে ডুবে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রাহ্মণ আমি প্রভুর ভয়ে শীতের ভোরে নদীতে নেমে জল আহরণ করি। আপনি কিসের ভয়ে হাড় কাঁপানো শীতের ভোরে স্নান করছেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "পূর্ণিকা ! আমি পাপকর্মের ফল ধৌত করার ব্রত পালন করছি। বার্ধক্য বা যৌবনে যে পাপ কর্ম করে সে স্নানশুদ্ধি দ্বারা ঐ পাপ হতে মুক্ত হয়।"

পূর্ণিকা বললেন, "স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপ হতে মুক্ত হয় এরূপ আপনাকে কে বলেছেন? এটি মূর্খ কর্তৃক মূর্খের উপদেশ। যদি তা হয় তাহলে নদীতে যেসব কচ্ছপ, ব্যাঙ, সাপ, কুমির ও জলচর প্রাণী আছে তাদের স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত। এরূপ তাহলে হত্যাকারী, চোর ও অকুশল কর্ম সম্পাদনকারীও স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপমুক্ত হবে। তাছাড়া নদী যদি পূর্বকৃত পাপ ধৌত করতে পারে তাহলে পুণ্যও ধৌত হয়ে যাবে। হে উদকশুদ্ধিক দেহ ধৌত না করে আগে মনের ক্লেশসমূহ ধৌত করুন। প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো পাপকর্ম করবেন না। যদি পাপকর্ম করে থাকেন, তাহলে দুঃখ হতে মুক্তির উপায় নেই। পলায়ন করেও মুক্তি পাবেন না। যদি দুঃখের ভয় থাকে, যদি দুঃখ আপনার অপ্রিয় হয়, তাহলে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করুন, শীল পালন করুন'। এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে পূর্ণিকা স্নানশুদ্ধির অসারতা প্রমাণ করে ব্রাহ্মণকে স্বমতে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পূর্ণিকা জীবনী পাঠে ধারণা করা যায় যে, একজন সামান্য ক্রীতদাসীও যে সৎ চেতনা ও কুশলকর্মের প্রভাবে জগতে খ্যাতি লাভ করতে পারে। অধ্যাবসায় ও সাধনার বলে নারীরাও অর্হত্ব লাভ করতে পারেন।

অনুশীলনীয় কাজ

পূর্ণিকা উদকশুদ্ধি ব্রাহ্মণকে কীভাবে স্বমতে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন লেখ

পূর্ণিকার যুক্তি কী তুমি সমর্থন কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

পাঠ : ৫

ভিক্ষু শীলভদ্র

শীলভদ্র ছিলেন বঙ্গের আদি গৌরব। কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বহু উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। যেমন : শাস্ত্রগুরু, ধর্মরত্ন ও জ্ঞানকর ইত্যাদি। শীলভদ্রের জন্ম ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চান্দিনা অঞ্চলের তদানীন্তন ভদ্ররাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জানা যায় যে, তাঁর গৃহী নাম ছিল দন্তভদ্র। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেই তিনি শীলভদ্র নামে খ্যাত হন।

জ্ঞানার্জনে শীলভদ্র ছিলেন আপোসহীন। তিনি অল্প বয়সেই বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, সাংখ দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শৈশবকাল থেকেই জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন। রাজকীয় সম্মান ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সত্যানুসন্ধানী হয়ে ভারতবর্ষ পরিক্রমায় বের হন। প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। এসময় তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধবিহার পরিদর্শন করেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। এভাবে এক সময় তিনি পৌঁছেন নালন্দায়। নালন্দা ছিল সে সময়ের খুব উচ্চ মানের বিশ্ববিদ্যালয়। বৌদ্ধবিহারকে কেন্দ্র করেই এই বিশ্ববিদ্যলয় গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধবিহারকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল। শীলভদ্রের সময় নালন্দায় দশ হাজার শিক্ষার্থী ছিল এবং দেড় হাজার শিক্ষক ছিলেন। তখন নালন্দা মহাবিহারের

অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য ধর্মপাল। তাঁর কাছেই শীলভদ্র বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এখানেই বৌদ্ধধর্মীয় রীতিতে তিনি উপসম্পদা গ্রহণ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। তারপর গভীর সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম অধিগত করেন এবং শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রদানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। শীলভদ্র আচার্যের কাছ থেকে ধর্ম-দর্শনের নিগূঢ়তত্ত্বের নির্যাসটুকু নিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, তত্ত্বের গভীরে গিয়ে ধ্রুব সত্যে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি প্রশ্ন করে যেতেন। এভাবে তিনি জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত ও স্বচ্ছ করেন এবং বহু বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

শীলভদ্র এক খ্যাতিমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে খুব প্রশংসা অর্জন করেন। তখন ভারতবর্ষে এরূপ তর্কযুদ্ধের প্রচলন ছিল। রাজা মহারাজারাও নানাভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত হতেন। কার রাজ্যে কত বড় পণ্ডিত বসবাস করেন এটি তাঁদের গৌরবের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো। তাই রাজা মহারাজারাও এরূপ তর্কযুদ্ধ আয়োজনে আগ্রহী হতেন। শীলভদ্র নালন্দায় অবস্থানকালে এরূপ এক ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ ভারতের এক পণ্ডিত মগধরাজ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর সমকক্ষ তাত্ত্বিক পণ্ডিত নেই বলে দাবি করতে থাকেন এবং নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকেন। তিনি ধর্ম বিষয়ক তর্কযুদ্ধে মগধের পণ্ডিতদের আহ্বান করেন। একথা শুনে মগধরাজ আচার্য ধর্মপালের কাছে দূত পাঠিয়ে জানতে চাইলেন তিনি এই তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে রাজি আছেন কি না? আচার্য ধর্মপাল তাঁর সম্মতি জানিয়ে সাথে সাথেই মগধে যেতে প্রস্তুতি নিলেন। তাঁর শিষ্য শীলভদ্র তখন নালন্দাতেই ছিলেন। তিনি আচার্যকে বিনীত অনুরোধ করে বলেন, “এই তর্কযুদ্ধে আমাকে যাবার অনুমতি দিন”। শীলভদ্রের বয়স তখন মাত্র ত্রিশ বছর। আচার্য ধর্মপাল অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি ইতোমধ্যে শীলভদ্রের তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা শুনেছেন। তাই শীলভদ্রের উপর তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল। তিনি শীলভদ্রকে অনুমতি দিলেন। এসময় অনেক নবীন শিষ আচার্যের এই সিদ্ধান্তে বিচলিত হন। তখন তিনি উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “আমি নিশ্চিত যে শীলভদ্র এই তাত্ত্বিক পণ্ডিতকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে।” এই ধর্মসভায় বহু লোকের সমাগম হলো। প্রজ্ঞাপ্রসূত সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের মাধ্যমে শীলভদ্র তাত্ত্বিক পণ্ডিতকে পরাজিত করলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। মগধরাজ সন্তুষ্ট হয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ একটি নগরের রাজস্ব স্থায়ী বৃত্তিরূপে তাঁকে প্রদান করেন। কিন্তু শীলভদ্র এটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুর পরিধেয় ত্রিচীবরই যথেষ্ট। পরে রাজার বিশেষ অনুরোধে তিনি সেই নগর গ্রহণ করে সেখানে একটি সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহারের নামকরণ করা হয় ‘শীলভদ্র সংঘারাম বিহার’। সংঘারামের সকল ভিক্ষু–শ্রমণ মহাস্থবির শীলভদ্রের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধায় তাঁকে ‘স্বদ্ধর্ম ভাণ্ডার’ বলে সম্ভাষণ করতেন।

প্রকৃতপক্ষে মহাস্থবির শীলভদ্রের সমসাময়িককালে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ আচার্য। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও পণ্ডিত হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। শীলভদ্রই প্রথম বাঙালি যিনি নালন্দা মহাবিহারে এই খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। সে গৌরবে আজও বাঙালিরা গর্ববোধ করে।

শিক্ষাসমাপ্তির পর তিনি নালন্দা মহাবিহারে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। আচার্য ধর্মপালের নির্বাণ লাভের পর সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে নালন্দার আচার্যপদে অধিষ্ঠিত করা হয়। ৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ১২৫ বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

শীলভদ্র কার নিকট এবং কোথায় বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেন?

শীলভদ্রকে কেন একটি নগরের রাজস্ব স্থায়ীবৃত্তি রূপে দেয়া হয়েছিল?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. অশ্বজি'র সৌম্য চেহারা দেখে -------- মুগ্ধ হন।

২. মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন ঋদ্ধিশক্তিতে --------।

৩. দেহ ধৌত না করে আগে মনের -------- ধৌত করুন।

৪. বিশাখার পিতা বিশাখাকে -------- উপদেশ প্রদান করেন।

৫. -------- প্রথম বাঙালি যিনি নালন্দা মহাবিহারে এই খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সঞ্জয় বেলট্‌ঠীপুত্র কোন মতবাদী ছিলেন?

২. বিশাখা কার কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন এবং কয়টি?

৩. পূর্ণিকাকে কেন দাসী কর্ম থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল?

৪. শীলভদ্রকে নিয়ে কেন আমরা গর্ব করি?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন কীভাবে বুদ্ধের অগ্রশ্রাবকের পদ লাভ করেছিলেন বর্ণনা কর।

২. পারিবারিক শান্তি সংরক্ষণে বিশাখার পিতার প্রদত্ত দশটি উপদেশের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।

৩. বৌদ্ধধর্মের প্রসারে রাজা প্রসেনজিতের অবদান লিপিবদ্ধ কর।

৪. পূর্ণিকা কীভাবে দাসী থেকে ভিক্ষুণী হলেন বিস্তারিত লেখ।

৫. শীলভদ্রের জীবন ও কর্ম বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মৌদ্‌গল্যায়ন কিসে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ?

ক. জাগতিক জ্ঞানে   খ. পরমার্থ জ্ঞানে

গ. ঋদ্ধি শক্তিতে   ঘ. দৈহিক শক্তিতে

২। রাজা প্রসেনজিত শাক্যকন্যাকে বিবাহের উদ্দেশ্য –

i. ভিক্ষুসঙ্ঘ ভোজনালয়ে আহার গ্রহণে বিরত থাকেন বলে

ii. কাশী রাজ্য লাভের আশায়

iii. বুদ্ধের বংশের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. i ও ii

গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

পাপিয়া তঞ্চঙ্গ্যা একজন ধার্মিক মহিলা। আর্থিক অনটনের কারণে তিনি পরের বাসায় গৃহকর্ম করেন। একদিন তিনি একজন কুসংস্কাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে যুক্তি দিয়ে তার কাজের অসারতা প্রমাণ করে, স্বধর্মে দীক্ষিত করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

৩। উল্লিখিত ঘটনাটির চরিতমালার কোন থেরীর সাথে সম্পৃক্ত ?

ক. পূর্ণিকা   খ. উৎপলবর্ণা

গ. পটাচারা   ঘ. ক্ষেমা

৪। পাপিয়া উক্ত কর্ম সম্পাদন করার ফলে–

i. প্রশংসা লাভ করবেন

ii. সুগতি লাভ করবেন

iii. অর্হত্ব ফলে অধিষ্ঠিত হবেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. ii ও iii

গ. i ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

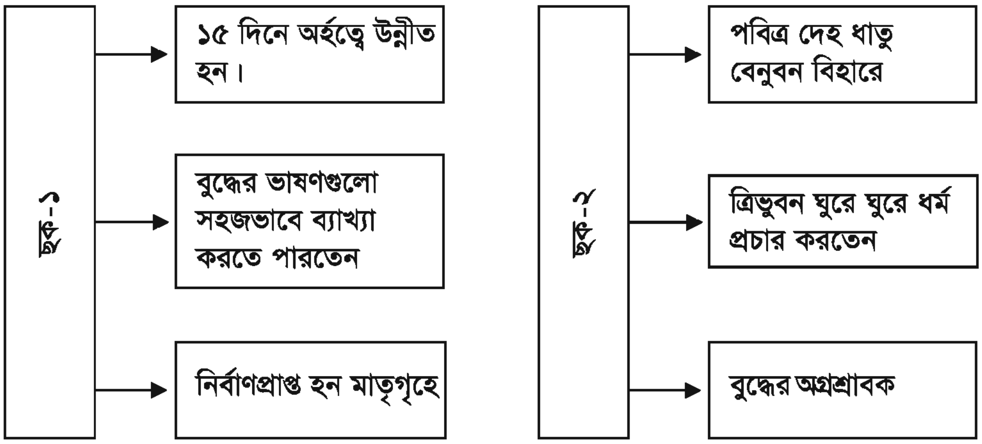

ক. শীলভদ্রের জন্ম কত খ্রিষ্টাব্দে ?

খ. পূর্ণিকাকে কেন দাসীকর্ম থেকে মুক্তি দেওয়া হলো ?

গ. ছক-১ এ বর্ণিত বিষয়াবলির সাথে বুদ্ধের কোন শিষ্যের মিল রয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক হিসেবে ছক-২-এ বর্ণিত ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে যে অবদান রাখেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। **ঘটনা-১**

রুপেন বড়ুয়া শৈশব থেকেই জ্ঞানার্জনের জন্য আগ্রহী ছিলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে তাঁর নাম রাখা হয় ধর্মমিত্র। তিনি গভীর সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানের বহু বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। এছাড়াও শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রদানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সকলে তাকে সদ্ধর্মের ভাণ্ডার বলে সম্ভাষণ করেন।

ঘটনা-২

বৃন্তা বড়ুয়া প্রতিদিন বিহারে গিয়ে ত্রিরত্নের সেবা ও পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর তাঁর পিতার দেয়া উপদেশ সাংসারিক জীবনে প্রতিফলিত করেন।

ক. শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম কী ?

খ. মৌদ্‌গল্যায়নকে কেন কালশৈল পর্বতে ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হতে হয়েছিল ? ব্যাখ্যা কর।

গ. ঘটনা-১- এ বর্ণিত কাহিনীটি চরিতমালার কোন চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২- এ বর্ণিত বৃন্তা বড়ুয়ার কর্মাকাণ্ডের প্রভাবে জন্ম-জন্মান্তরে সুগতি লাভ হবে– একথার সাথে তুমি কি একমত ? যুক্তি প্রদর্শন কর।

একাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হয় ভারতবর্ষে। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব কালে বেশিরভাগ মানুষই ভ্রান্ত ধারণা ও অন্ধ বিশ্বাসী ছিলেন। তারা বিশ্বাস করতো যে কোনো ধরণের দুর্যোগ-দুর্ঘটনা অদৃশ্য দৈবশক্তির প্রভাবে সংঘটিত হতো। ফলে অদৃশ্য শক্তির প্রতি নিজেকে সমর্পন করেই মানুষ শান্তি ও নিরুপদ্রব থাকার চেষ্টা করতো এবং অদৃশ্য শক্তির সন্তুষ্টির জন্য আয়োজন করতো নানা রকম পূজা-অর্চনা ও আচার-অনুষ্ঠান। যাগ-যজ্ঞ ও পশুবলি ছিল এসব পূজাচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সকল সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য এগুলোই ছিল ধর্মাচার। বুদ্ধ সেই অদৃশ্য শক্তির আরাধনার চেয়ে নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হওয়ার উপদেশ প্রদান করেন। তিনি সেসব আচার-অনুষ্ঠান দুঃখ মুক্তির সঠিক পথ নয় বলে পরিত্যাগ করতে বলেন এবং দুঃখ হতে মুক্তির জন্য পথ নির্দেশ করেন। তাঁর এই অমিয়বাণীর আহ্বানে সাধারণ মানুষ থেকে রাজা মহারাজা সকলেই আকৃষ্ট হলেন। তাঁরা বুঝলেন দুঃখ যেমন আছে, দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে। এ সত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ নব চেতনায় উদ্ভাসিত হলো। এভাবে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের যাত্রা শুরু হয়। কালক্রমে তা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের এরূপ ক্রমবিকাশের ধারাই হলো বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

* প্রাক বুদ্ধ যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
* বুদ্ধের সমকালীন ষোড়শ মহাজনপদের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
* বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে মৌর্য, কুষাণ ও পাল রাজাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
* বাংলাদেশের প্রাক-আধুনিকযুগসহ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দিতে পারব।

পাঠ : ১

প্রাক বুদ্ধযুগের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

প্রাচীন ভারতবর্ষে বুদ্ধের আবির্ভাব। ভারতবর্ষে নানা যুগে নানা মনীষীর জন্ম হয়েছে। সামাজিক রীতি নীতিও প্রবাহিত হয়েছে নানা আঙ্গিকে। প্রাক বুদ্ধ যুগে ভারতবর্ষে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ছিল। তখন ভারতবর্ষ অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজারা জনগণের কাছ থেকে ফসল, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি কর হিসেবে গ্রহণ করতো। সাধারণ মানুষ পল্লী অঞ্চলে বসবাস করতো। রাজা, রাজ কর্মচারী ও ধনীরা সুরক্ষিত নগরে বসবাস করতেন। তাঁরা শিকার, অস্ত্রচালনা, নাচ-গান প্রভৃতি করে আমোদ প্রমোদ করতেন। সমাজে নানা রকম পেশা প্রচলিত থাকলেও অধিকাংশ লোকই কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। গৃহ নির্মাণে বাঁশ ও কাঠের পাশাপাশি ইট প্রস্তরও ব্যবহার হতো। উৎসবের সময় নাচ-গান এবং নানা রকম পিঠা তৈরি করা হতো। নারী পুরুষ লৌহনির্মিত অলংকার পরিধান করতো। সমাজে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ধনীরা অর্থের বিনিময়ে দাস ক্রয় করতেন।

যুদ্ধ-বন্দী ও দণ্ডিত অপরাধীদের দাসে পরিণত করা হতো। আবার অনেকে জন্মসূত্রেও দাস হতো। সমাজে বহুবিবাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতো।

সমাজে চার প্রকার বর্ণ প্রথা প্রচলিত ছিল। যথা:, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তখন ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞ করে ব্রহ্মা ও অন্য দেবতাদের উপাসনা করতেন। কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল পূজা-উপাসনায় স্বর্গসুখ লাভ হয়। ব্রহ্মাকে গণ্য করা হতো সৃষ্টিকর্তা রূপে। ব্রহ্মা নিজ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাই ব্রহ্মাকে কেন্দ্র করেই ছিল মানুষের ধর্ম, কর্ম ও চিন্তা-চেতনা। ব্রাহ্মণেরা প্রচার করতেন যে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, হাত থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য আর পা থেকে শূদ্রদের জন্ম হয়। সমাজে ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করতেন এবং তাঁদের আধিপত্য ছিল সবচেয়ে বেশি। রাজারা তাঁদের বিশেষ সমীহ করতেন। তাঁদের অবস্থান ছিল শীর্ষে। তাঁরা নিজেদেরকে দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে প্রচার করতেন। পূজা অর্চনা ও উপদেশ দেয়া ছিল ব্রাহ্মণদের প্রধান কাজ। ক্ষত্রিয়রা ছিলেন যোদ্ধা। দেশের শাসনভার তাঁদের হাতে ন্যস্ত থাকতো। বৈশ্যরা ছিলেন বণিক। ব্যবসা বাণিজ্য ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। শূদ্ররা ছিলেন শ্রমজীবী মানুষ। তাঁরা অপরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সমাজে তাদের অবস্থান ছিল সর্বনিম্নে।

সে সময় যাগযজ্ঞ, পশুবলি, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি ছিল ধর্মাচারের প্রধান অঙ্গ। তাছাড়া, বনাচরণ, নির্জনবাস, শারীরিক কৃচ্ছ্রতা সাধন প্রভৃতি সাধন প্রণালিও বর্তমান ছিল। পশুরক্তে দেব-দেবীকে তুষ্ট করাই ছিল ধর্মাচারের অন্যতম প্রচলিত রীতি। কারণ তখন বিশ্বাস করা হতো যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধন, স্বাস্থ্য এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ হয়। নানা রকম মন্ত্র, তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতিও প্রচলিত ছিল। মানুষ বিপদ ও রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এসব ধর্মাচারের আশ্রয় গ্রহণ করতো। কিন্তু এসব ধর্মাচার সকল মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারতো না। কারণ তারা উপলব্ধি করল যে, যাগযজ্ঞ, পশুবলি ইত্যাদি দ্বারা চিরস্থায়ী কল্যাণ আসে না। তারা অন্যপথে মুক্তির সন্ধান করতে থাকে। ফলে বিভিন্ন ধর্মমতের উদ্ভব হয়। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা এসব ধর্মমত প্রচার করতেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

প্রাক বুদ্ধযুগের চার প্রকার বর্ণপ্রথা সম্পর্কে ধারণা দাও

প্রাক বুদ্ধ যুগের ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা কর

পাঠ : ২

গৌতম বুদ্ধের সময় ধর্মীয় অবস্থা

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে। এ সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মসহ তেষট্টি প্রকার ধর্মীয় মতবাদ প্রচলিত ছিল। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকের দীর্ঘ নিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে এ তথ্য বর্ণিত আছে। ভিক্ষুসঙ্ঘ ছাড়াও এ সময় ছয়টি বৃহৎ শ্রমণসঙ্ঘ ছিল। এই ছয়টি সঙ্ঘের প্রধান ছিলেন : পূরণ কশ্যপ, মক্‌খলী গোসাল, অজিত কেশকম্বলি, পকুদ কচ্চায়ন, নিগণ্ঠ নাথপুত্র এবং সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্র। এঁরা ষড়তীর্থঙ্কর নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁদের অসংখ্য অনুসারী ছিলেন।

বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর সাথে বুদ্ধের কিছু বিষয়ে পার্থক্য ছিল। মহাবীরের প্রধান বিচরণক্ষেত্র ছিল রাজগৃহ। কিন্তু তাঁর সাথে বুদ্ধের কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। বুদ্ধের ন্যায় মহাবীরও অহিংসা বাণী প্রচার করেছেন।

এগুলো ছাড়াও বুদ্ধের সময় বনাচরণ, কৃচ্ছ্রতা সাধন, শারীরিক নিগ্রহ, যাগ-যজ্ঞ, নানা রকম মন্ত্র, তন্ত্র, ঝাড়, ফুঁক প্রভৃতিও প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ তাঁর সমকালীন প্রচলিত ধর্মমতসমূহ দুঃখমুক্তির সঠিক পথ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। প্রাক বৌদ্ধযুগীয় মতবাদসমূহে যেখানে কর্ম ও কর্মফলকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং মানুষকে নিয়তি বা অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সেখানে বুদ্ধ কর্মবাদ উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, মানুষ কর্মের অধীন। যে যেরূপ কর্ম করবে সে সেরূপ কর্মফল ভোগ করবে।

বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ষোলটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলোর প্রত্যেকটিকে 'মহাজনপদ' বলা হতো। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এগুলো 'ষোড়শ মহাজনপদ' নামে খ্যাত। এ মহাজনপদের অনেকগুলোতে বুদ্ধ পরিভ্রমণ করে ধর্ম প্রচার করেছেন। জনপদগুলোর অনেক স্থানে বুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি বিজড়িত থাকায় সেগুলো তীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধের সমকালীন ছয়টি শ্রমণসঙ্ঘের প্রধান কে কে ছিলেন?

পাঠ-৩
বদ্ধযুগে ষোড়শ মহাজনপদের অবস্থা

গৌতম বুদ্ধের সময় ষোলটি রাজ্যের সবগুলোই খুব ইতিহাস প্রসিদ্ধ ছিল না। এতে অনেক রাজ্য অন্য রাজ্যের আগ্রাসনের কারণে নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছিল। তারপরও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ষোড়শ মহাজনপদ বা ষোলটি রাজ্য হলো -

১. অঙ্গ ২. মগধ ৩. কাসী ৪. কোশল ৫. বজ্জি ৬. মল্ল ৭. চেতী ৮. বংস ৯. কুরু ১০. পঞ্চাল ১১. মৎস্য ১২. সূরসেন ১৩. অশ্মক ১৪. অবন্তী ১৫. গান্ধার এবং ১৬. কম্বোজ।

নিম্নে এই ষোলটি মহাজনপদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো :

১। অঙ্গ

অঙ্গ রাজ্যটি ছিল মগধের পূর্বদিকে। মগধ রাজ্য ও অঙ্গ রাজ্যে সীমানা বিভক্ত হয়েছিল চম্পা নদীর মাধ্যমে। চম্পা নদী এ দুই রাজ্যকে পৃথক করে রেখেছিল। এ নদী ছিল মগধের অন্তর্গত। অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পা নগরী। মহারাজ দিসম্পতির মন্ত্রী মহাগোবিন্দ এ নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। চম্পা নদী ও গঙ্গা নদী সংগম স্থলস্থ উপকূলীয় অঞ্চলে চম্পা নগরী অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের সময় ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা অঙ্গে রাজত্ব করতেন। রানি গগ্গরা অত্যন্ত বুদ্ধভক্ত ছিলেন। তিনি চম্পা নগরীতে একটি বিশাল দিঘি খনন করিয়েছিলেন। এই দিঘির পাড়ে বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। সূত্রপিটক পাঠে জানা যায় গৌতমবুদ্ধ এখানে আটবার এসেছিলেন। মগধের যুবরাজ বিম্বিসার রাজা

ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করে অঙ্গ অধিকার করেন। সে সময় এ রাজ্য মগধের সাথে একত্রিত হয়ে অঙ্গ–মগধ নামে পরিচিতি লাভ করে।

২। মগধ

বর্তমান ভারতের পাটনা ও গয়া জেলার স্থলেই ছিল মগধ রাজ্য। এর উত্তরে গঙ্গা এবং পশ্চিমে শোন নদী, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের শাখা এবং পূর্বে ছিল চম্পা নদী। গয়ার নিকটস্থ প্রাচীন রাজগৃহ ছিল মগধের রাজধানী। রাজগৃহে গৌতম বুদ্ধ বহুবার ধর্মদেশনা করেছিলেন বলে জানা যায়। এখানে বুদ্ধ কয়েকবার বর্ষাবাসব্রত যাপন করেছিলেন। বুদ্ধের সময় মগধের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। তিনি বুদ্ধের গৃহী শিষ্য ছিলেন। রাজগৃহের বেলুবন উদ্যানটি তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য দান করেছিলেন। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের কল্যাণে আরও অনেক মহৎ কাজ করেছিলেন। ত্রিপিটকের বিভিন্ন সূত্রে রাজা বিম্বিসারের নাম উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধের জীবিতকালেই যুবরাজ অজাতশত্রু অন্যের প্ররোচনায় পিতা বিম্বিসারকে বন্দী করে সিংহাসন দখল করেন। তিনি প্রথম জীবনে বুদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং অনুতপ্ত হয়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। তিনিও বুদ্ধের গৃহী শিষ্য হয়েছিলেন। অজাতশত্রু মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তর করেছিলেন। সেসময় জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান হিসেবে পাটলিপুত্রের সুখ্যাতি ছিল।

৩। কাসী

প্রাচীন ভারতে কাসী এক উন্নত ও সম্পদশালী রাজ্য ছিল। শিক্ষা ও শিল্পকলার উন্নতিতে কাসী রাজ্যের খুব খ্যাতি ছিল। কাসীর রাজধানী ছিল বারানসি। এটি ছিল সে সময়ের এক প্রসিদ্ধ নগরী। বারানসিস্থ সারনাথের ঋষিপতনের মৃগধাবে বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। বারানসির বিভিন্ন স্থানে বুদ্ধ দশবার ধর্মদেশনা করেছিলেন। বুদ্ধ প্রথম বর্ষাবাসব্রত এখানেই পালন করেছিলেন। এ রাজ্যের অনেক রাজাকেই ব্রহ্মদত্ত নামে অভিহিত করা হতো। বুদ্ধের সময়ে এ রাজ্য কোশলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাসী-কোশল নামে খ্যাত হয়।

৪। কোশল

কোশল ছিল একটি নদী বেষ্টিত রাজ্য। এর পশ্চিমে সুমতি নদী, দক্ষিণে সর্পিকা বা স্যান্দিকা নদী, পূর্বে সদানীরা নদী ও উত্তরে ছিল নেপালের পার্বত্য অঞ্চল। কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী। পালি ভাষার উচ্চারণে এটি সাবত্থী। এখানে সবত্থ নামক এক ঋষি ছিলেন। অনেকের মতে তাঁর জন্মস্থান হিসেবে এটিকে সাবত্থী বলা হয়। আবার অনেকের মতে এ শহরে সবকিছু পাওয়া যায় বলে এটিকে শ্রাবস্তী বলা হয়। এটি অচিরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অচিরাবতীর বর্তমান নাম রাপ্তী নদী। বুদ্ধের সময় রাজা প্রসেনজিত এখানে রাজত্ব করতেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। বুদ্ধের অনুসারী এক প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠী কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীতে বাস করতেন। তাঁরা হলেন অনাথপিণ্ডিক ও বিশাখা। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক জেতবন বিহার এবং মহাউপাসিকা বিশাখা পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেছিলেন। শ্রাবস্তীতে বুদ্ধ ২৫ বর্ষাবাসব্রত পালন করেছিলেন। বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ নগরী অযোধ্যা ও সাকেত কোশলের অন্তর্গত ছিল।

৫। বজ্জি

গঙ্গার উত্তরে নেপালের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ রাজ্য। এর পশ্চিমে ছিল গণ্ডক নদী এবং পূর্ব দিকে ছিল কোসী ও মহানন্দা নদী। রাজধানী ছিল বৈশালী। বুদ্ধের সময় বৈশালী ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী নগরী। বজ্জিরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল জাতি ছিল। তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সকল কাজ সমাধা করতেন। বুদ্ধ বজ্জিদের এ রূপ আচরণের প্রশংসা করেছেন।

বজ্জি রাজ্যের রাজধানী বৈশালীতে এক সময় মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও ভূত প্রেতের ভয়ে সকলে দিশাহারা হয়ে পড়ে। স্বয়ং রাজা এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছিলেন না। তখন নিরূপায় হয়ে সকলে সর্বসত্তার হিতাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধকে স্বশিষ্য নিমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ বজ্জি রাজ্যবাসীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বজ্জিরাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল চিত্তে উপযুক্ত মর্যাদায় বুদ্ধকে স্বরাজ্যে আনয়নের ব্যবস্থা করেন। বুদ্ধের আগমনে এ রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টি হয়। এতে জলপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এতে পচা শবাদিসহ নোংরা গন্ধ আবর্জনাদি বিনাশ হয়। এ সময় তথাগত বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে বৈশালীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে 'রতন সূত্র' পাঠের আদেশ দেন। সূত্র পাঠের পর উক্ত ত্রিবিধ ভয় উপশম হয়। বুদ্ধের এ আগমণ উপলক্ষে বৈশালীর বিভিন্ন জায়গায় চৈত্য নির্মাণ করা হয়। পরে বুদ্ধ বজ্জিবাসীর উদ্দেশ্যে 'সপ্ত অপরিহানীয়' নামে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিজনক ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধ তাঁর শেষ বর্ষাবাসব্রত বৈশালীতে পালন করেছিলেন।

৬। মল্ল

মল্ল রাজ্য ছিল বজ্জি রাজ্যের পূর্বে ও কোশল রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত। মল্ল রাজ্যের মধ্য দিয়ে বুদ্ধ বহুবার যাতায়াত করেছেন। মগধ ও কোশলে যাওয়ার রাস্তা মল্ল রাজ্যের ভিতর দিয়ে ছিল। মল্লদের রাজধানী ছিল কুশিনারা। এটিকে কুশনগরও বলা হয়। এর অবস্থান ছিল হিরণ্যবতী নদীর তীরে। এই নদীর বর্তমান নাম শোন নদী। কুশিনারার শালবনে গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর এখানে তাঁর যে দেহাবশেষ ছিল তা দ্রোন ব্রাহ্মণের মাধ্যমে আটজন ভাগ করে নিয়ে সেগুলোর উপর চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে সম্রাট অশোক এখানে বুদ্ধের বিশাল পরিনির্বাণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৭। চেতি

চেতি বা চেদী রাজ্যের অবস্থান ছিল যমুনার তীরবর্তী অঞ্চলে কুরু রাজ্যের পাশে। চেতির রাজধানী ছিল সোত্থিবতী বা স্বস্তিবতী। এটি বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত। বেসসন্তর জাতকে বর্ণিত 'শিবি' এই চেতি রাজ্য সংলগ্ন ছিল। বুদ্ধ চেতি রাজ্যে একবার ধর্মদেশনা করেছিলেন। কাসী রাজ্যের সঙ্গে চেতি রাজ্যের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। চেতি রাজ্যের সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের জীবনের কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

৮। বংস

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বংস রাজ্য অবস্থিত ছিল। এলাহাবাদের কাছে কৌশাম্বী বা আধুনিক কোসম ছিল এর রাজধানী। বুদ্ধের সময় এখানে উদয়ন নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি অত্যন্ত আরামপ্রিয় ও বিলাসী ছিলেন। তিনি হাতি ধরার মন্ত্র জানতেন। তিনি পিণ্ডল ভারদ্বাজ নামের এক ভিক্ষুর মাধ্যমে বুদ্ধের গৃহী শিষ্য হয়েছিলেন। রাজা উদয়নের প্রধান রানি শ্যামাবতী ও তার প্রধান সেবিকা খুজ্জত্তরা দু'জনই বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন। কৌশাম্বীর এই উদ্যানে রানি শ্যামাবতী একটি বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন। এ বিহারের নাম ঘোষিতারাম। এখানে রাজা উদয়ন বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবশত বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই রক্তচন্দন কাঠ দ্বারা একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৯। কুরু

কুরু রাজ্যের রাজধানী ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। এটি বর্তমান দিল্লির নিকটবর্তী ইন্দ্রপ্রস্থ অঞ্চল। বুদ্ধের সময় পৌরব্য নামের এক রাজা রাজত্ব করতেন। বুদ্ধ কুরু জনপদ অনেকবার পরিভ্রমণ করেছিলেন। এখানে বুদ্ধ চার বার ধর্মদেশনা করেছিলেন বলে জানা যায়। কুরুর বিশিষ্ট ধনী যুবক রাষ্ট্রপাল বুদ্ধের কাছে ভিক্ষুত্বে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

১০। পঞ্চাল

রোহিলাখণ্ড এবং মধ্য দোয়ারের একাংশ নিয়ে পঞ্চাল গঠিত। গঙ্গা নদী এই রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল। একটি ছিল উত্তর পঞ্চাল অন্যটি দক্ষিণ পঞ্চাল। উত্তর পঞ্চালের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র বা ছত্রবতী। এটি বর্তমানে রামনগর নামে পরিচিত। দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য। বুদ্ধের সময়ে এ রাজ্যের খুব বেশি প্রভাব ছিল বলে অনুমিত হয়না। এ রাজ্যের জনসাধারণ ও নগর সম্পর্কে বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

১১। মৎস্য

চেতি রাজ্যের পার্শ্বস্থ চম্বলের পার্বত্য অঞ্চল ও সরস্বতী নদীর তীরবর্তী বনাঞ্চল নিয়ে মৎস্য রাজ্য বা জনপদ গঠিত। এর মধ্যস্থলে ছিল রাজধানীর মর্যাদা সম্পন্ন 'বিরাট নগর'। এটি হলো বর্তমান জয়পুরের বৈরাট। বুদ্ধ এই রাজ্য কয়েকবার ভ্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায়। বৈরাট নগরে সম্রাট অশোকের কয়েকটি বিখ্যাত শিলালিপি পাওয়া গেছে।

১২। সুরসেন

এটি যমুনার তীরবর্তী একটি রাজ্য। এর রাজধানী ছিল মথুরা। বুদ্ধের সময় এখানে রাজত্ব করতেন রাজা অবন্তীপুত্র। তিনি বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্চায়নের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বুদ্ধের অন্যতম উপাসক ছিলেন। এ রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় মথুরা অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ সাধিত হয়েছিল।

১৩। অশ্মক

অশ্মক বা অস্‌সক রাজ্য ছিল গোদাবরী নদীর কূলবর্তী অঞ্চলে। রাজধানী ছিল পোটলি, পোটন বা পোদন। এ রাজ্যের রাজা ছিলেন অস্‌সক। তার সম্পর্কে তেমন বেশি জানা যায় না। এখানে বাবরি নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি সশিষ্য বুদ্ধের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

১৪। অবন্তী

নর্মদা উপত্যকার মান্ধাতা থেকে মহেশ্বর ও পাশ্ববর্তী কয়েকটি জেলা নিয়েই গঠিত হয়েছিল অবন্তী রাজ্য। রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। বুদ্ধের সময়ে এখানে রাজা ছিলেন চণ্ডপ্রদ্যোত। বুদ্ধ অবন্তী রাজ্যে এসেছিলেন কতবার সে তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অবন্তী রাজার পুরোহিত পুত্র মহাকচ্চায়ন বুদ্ধের একজন খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন।

১৫। গান্ধার

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিল্প সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র হিসেবে গান্ধার রাজ্যের সুখ্যাতি ছিল। গান্ধারের রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। বুদ্ধের সময় এখানে পুক্কুস্‌সাতি নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি শেষ বয়সে রাজ্য ছেড়ে পায়ে হেঁটে রাজগৃহে গিয়ে বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন। গান্ধারের রাজধানী তক্ষশীলা ছিল বিবিধ বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক এখানেই চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতবর্ষের অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। তক্ষশীলা বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত।

১৬। কম্বোজ

বর্তমান কালের ভারত পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমে গান্ধারের নিকটবর্তী স্থানে কম্বোজ রাজ্য অবস্থিত ছিল। কম্বোজের রাজধানী হিসেবে দুটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলো হলো দ্বারকা ও রাজপুর। কম্বোজ রাজ্যে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। এ রাজ্যে চন্দ্রবর্মন ও সুদক্ষিণ নামের দু'জন রাজার কথা জানা যায়। বুদ্ধের সময় এ রাজ্যে কোন্ রাজা রাজত্ব করতেন তা জানা যায় না। এ রাজ্যে কুক্কুটবতী নামের এক নগরী ছিল। সে নগরীর শাসনকর্তা ছিলেন মহাকপ্পিন। তাঁকেও রাজা নামে আখ্যায়িত করা হতো। রাজা মহাকপ্পিন বুদ্ধবাণীর গুণ মহিমা উপলব্ধি করে সপারিষদ মধ্যদেশের চন্দ্রভাগা নদীর তীরে বুদ্ধের কাছে গিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ
ষোড়শ মহাজনপদের প্রত্যেকটির রাজা ও রাজধানীর নামের একটি তালিকা তৈরি কর

পাঠ : ৪

বিভিন্ন রাজাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবদান

বুদ্ধের সমকালীন রাজাদের মধ্যে যাঁরা বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে নানাবিধ অবদান রেখে খ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন রাজা বিম্বিসার। তিনি মগধ রাজ্যের রাজা ছিলেন। তাঁর সাথে সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বেও একবার সাক্ষাৎ হয়। তখন সিদ্ধার্থ গৌতম সন্ন্যাস ব্রত পালনের মাধ্যমে দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণ করে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করছিলেন। রাজা বিম্বিসার সিদ্ধার্থ গৌতমের সুন্দর সুগঠিত দেহাবয়ব দেখে তাঁকে সেনাপতির পদ দিতে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। উত্তরে সিদ্ধার্থ গৌতম বলেছিলেন, আমি কোশল রাজ্যের অন্তর্গত শাক্যগণের রাজ্য কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য আমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছি। তখন রাজা বিম্বিসার বলেছিলেন বুদ্ধত্ব লাভ করলে তিনি তাঁর শরণাগত হবেন। সত্যিই বুদ্ধত্ব লাভের পর রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের শরণাগত হন। তিনি বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদানের জন্য রাজ্যে আদেশ জারি করেছিলেন। ফলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার বেড়ে যায়। এ কারণে অনেকে সুবিধা লাভের জন্য ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করেছিলেন। রাজা বিম্বিসার বিষয়টি বুদ্ধের কাছে জানালেন। এ পরিস্থিতিতে বুদ্ধ রাজভৃত্য, চোর–ডাকাত, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ও ঋণী ব্যক্তিদের প্রব্রজ্যা না দেওয়ার আদেশ দেন। রাজা বিম্বিসারের অনুরোধে বুদ্ধ অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে ভিক্ষুদের জন্য উপোসথ ও ধর্মালোচনা, গৃহীদের জন্য অষ্টশীল, পঞ্চশীল পালনের বিধান প্রবর্তন করেন।

মহাবর্গ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, পিলিন্দবৎস স্থবির এক সময় রাজগৃহে পাহাড় পরিষ্কার করছিলেন। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধশিষ্য পিলিন্দবৎস স্থবিরকে এরূপ কাজ করতে দেখে জিজ্ঞেস করে জানলেন ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য স্থান প্রস্তুত করছেন। রাজা বিম্বিসার বললেন তথাগত বুদ্ধ সম্মতি দিলে তিনি এর ব্যবস্থা করবেন। বুদ্ধের সম্মতি যথাসময়ে পাওয়া গেল। কিন্তু রাজা এ প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়েছিলেন। অনেকদিন পরে হঠাৎ বিষয়টি তাঁর স্মরণ হলো। তখন প্রধান অমাত্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভিক্ষুদের জন্য আমি বাসস্থান তৈরি করে দেব বলেছিলাম, সে কাজ কি সম্পন্ন করা হয়েছিল?' উত্তরে অমাত্য বলল-না। তখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন, প্রতিশ্রুতির পর কত রাত অতিবাহিত হলো? অমাত্য গণনা করে বললেন পাঁচশো' রাত্রি। তখন রাজা ভিক্ষুদের জন্য পাঁচশ'টি আরাম নির্মাণ করে দিতে আদেশ দিলেন। কালক্রমে রাজগৃহের এ স্থানটি 'পিলিন্দবৎস গ্রাম' নামে খ্যাত হয়।

বিম্বিসারের পর তাঁর পুত্র অজাতশত্রু মগধের রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি দেবদত্তের প্ররোচনায় প্রথমে বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর অনুতপ্ত হয়ে তিনি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন। তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাস পর প্রথম বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতি রাজা অজাতশত্রু পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী সংকলন করা হয়েছিল। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে রাজা অজাতশত্রুর নাম অমর হয়ে আছে।

পরবর্তিতে তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশ' বছর পরে মগধের রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতি ও প্রায় দুইশো' আঠার বছর পরে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত হয় তৃতীয় বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতি। বুদ্ধের বাণী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গ্রন্থায়ণ করার ক্ষেত্রে এ মহাসঙ্গীতিগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে এই বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতিগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মহাসঙ্গীতি আয়োজন করা কখনোই সম্ভব ছিল না। সঙ্গীতি আয়োজনের ক্ষেত্রে রাজাদের অবদান বৌদ্ধধর্মের অনুসারীগণ এখনো শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করে।
এ ছাড়া অন্যান্য রাজাদের মধ্যে কোশলের রাজা প্রসেনজিত ও উজ্জয়িনির রাজা প্রদ্যোত বুদ্ধের উপাসক ছিলেন। তাঁরা রাজা বিম্বিসারের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁরা সে সময় নানাভাবে বুদ্ধের ধর্ম দর্শন বিকাশে সশ্রদ্ধ চিত্তে সহায়তা দিয়েছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ
বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাকারী রাজাদের একটি নামের তালিকা তৈরি করো

পাঠ : ৫
মৌর্য যুগ

চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের পরিচয়

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মৌর্য বংশের প্রথম রাজা। তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মৌর্যরা ছিল সূর্যবংশীয়। সূর্যবংশীয় রাজকুমার মান্ধ্যাতৃ থেকে মৌর্যবংশের উদ্ভব। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মৌর্যরা এক গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী ছিল। পূর্ব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তারাও মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন মগধের রাজা ছিল নন্দবংশীয়। এ সময় চন্দ্রগুপ্ত তক্ষশীলার এক খ্যাতিমান ব্রাহ্মণের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তার নাম কোটিল্য, যিনি চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত। তার সহায়তায় নন্দ বংশের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন লাভ করেন। রাজা চন্দ্রগুপ্ত যেমন সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন তেমনি সুদক্ষ শাসকও ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী কোটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রের নীতিসমূহ তিনি বিশেষভাবে অনুসরণ করতেন।

গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর ভারত উপমহাদেশ থেকে গ্রিক শাসন উচ্ছেদের প্রথম উদ্যোগ নেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনি গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গ্রিকদের পরাজিত করে বহু রাজ্য তিনি অধিকার করেন। এ সময় আলেকজান্ডারের অনুগামী সেলুকাসের সাথে তাঁর প্রথমে দ্বন্দ্ব ও মৈত্রী সম্পর্ক হয়। মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য সেলুকাস মেঘাস্থিনিস নামক একজন দূত চন্দ্রগুপ্তের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে কান্দাহার, কাবুল, হিরাট ও বেলুচিস্থান হস্তান্তর করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেলুকাসকে পাঁচশ হাতি উপহার দিয়েছিলেন। এ ঐতিহাসিক বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তিতে মেগাস্থিনিস একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির নাম হলো 'ইন্ডিকা'। এই মূল গ্রন্থটি এখন পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় শতাব্দীর খ্যাতিমান জীবনীকার প্লুটার্ক, জাস্টিন ও ঐতিহাসিক বিষয়ের গ্রন্থ প্রণেতা এ্যারিবিয়ান তাদের রচনায় ইন্ডিকা গ্রন্থের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন জৈন ধর্মের অনুসারী। তিনি চব্বিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। কথিত আছে, এক সময় রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে রাজা চন্দ্রগুপ্ত নিজ পুত্রের হাতে সিংহাসনের ভার তুলে দিয়ে তিনি মহীশূরে চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্রের নাম বিন্দুসার। তিনি চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। কোটিল্য বিন্দুসারের রাজত্বকালেও কিছুদিন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিন্দুসার রাজ্য বিস্তারের নেশায় যুদ্ধাস্ত্র হাতে তুলে নেননি। তিনি পিতার ন্যায় গ্রিকদের সাথে সম্প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। বিন্দুসার শান্তিকামী ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি রাজ্য বিস্তারের নেশায় যুদ্ধাস্ত্র হাতে তুলে নেননি। বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশীলায় একবার প্রজা বিদ্রোহ হয়েছিল। রাজা বিন্দুসার যুবরাজ অশোককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। অশোক শান্তিপূর্ণ ভাবেই সে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। অশোক ছাড়াও রাজা বিন্দুসারের আরও অনেক পুত্র ও কন্যা ছিল। বিন্দুসার পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন বলে জানা যায়। অতঃপর বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর মৃত্যু হলে পুত্র অশোক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়।

রাজ্য বিস্তার ও শৌর্য বীর্যের পরাক্রমতায় বিন্দুসার পুত্র অশোক 'সম্রাট অশোক' নামে সমধিক খ্যাত হন। সম্রাট অশোক প্রথমে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেননি। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর বুদ্ধের শিক্ষা ও নীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ জাগে। কলিঙ্গ যুদ্ধে এক লক্ষের বেশি মানুষ নিহত হয়। এই ঘোরতর যুদ্ধের পর অশোকের মনে পরিবর্তন আসে। তারপর ন্যাগ্রোধ শ্রামণের নিকট বুদ্ধবাণী শ্রবণ করে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম উপাসকে পরিণত হন। তাঁর নাম হয় 'ধর্মাশোক'। এছাড়া অন্য একটি অভিধা ছিল 'দেবানাম পিয় পিয়দসি' অর্থাৎ দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী। তিনি বুদ্ধের শিক্ষাসমূহ ভালোভাবে অনুসরণ করতেন।

বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসারে মৌর্যবংশের অবদান

মৌর্যবংশের কীর্তিমান নৃপতি অশোক বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হয়ে জনসাধারণের কল্যাণে গভীর মনোনিবেশ করেন। জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি ধর্মমহামাত্য নামে এক শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত করেন। লোকশিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের জন্য রাজ্যের সবখানে বুদ্ধের অনুশাসন লিখে দিলেন। সেগুলো খোদাই করা হয় পর্বতের গায়ে, পাহাড়ের শীর্ষে ও গুহা গাত্রে। এভাবে তিনি অনেক অনুশাসন তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সবখানে ছড়িয়ে দেন। এগুলো অশোক শিলালিপি নামে পরিচিত।

এখন পর্যন্ত সম্রাট অশোকের ৩৪টি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব অনুশাসনের মর্মবাণী ছিল গুরুজনে ভক্তি, জীবে দয়া, ভিক্ষু শ্রামণ ও দরিদ্রদের দান প্রদান, আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি সৎ ব্যবহার, সত্যভাষণ করা ইত্যাদি। তিনি সকল ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যে সকল ধর্মের লোক সুখে বাস করতো। সকলকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। তিনি বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থানগুলো চিহ্নিত করেন ও সেসব স্থানে বিহার, চৈত ও স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

২০২৩

সেবা ও কল্যাণের ব্রত নিয়ে তিনি রাজ্যে ভ্রমণের ব্যবস্থা করতেন। এটিকে ধর্মযাত্রা বলা হতো। ধর্মযাত্রার সময় তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বুদ্ধের পবিত্র অস্থিধাতু সংগ্রহ করেন। তারপর চুরাশি হাজার স্তূপ

নির্মাণ করে সেগুলো সমগ্র ভারতবর্ষে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশের মানুষকে গৌতম বুদ্ধের অমিয় বাণীর প্রতি আকৃষ্ট করা। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির আয়োজন। এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় সম্রাট অশোকের রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে। এই সঙ্গীতির মাধ্যমে বৌদ্ধসজ্ঞ কলুষমুক্ত হয় এবং প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলিত করে ধর্মদূতের মাধ্যমে তা দেশ-বিদেশে প্রচার করা হয়। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা বুদ্ধবাণী সিংহলে প্রচার করেন। সিংহলের রাজা তিস্‌স সম্রাট অশোকের সম্মানে নিজেও ‘দেবনাম পিয়’ উপাধি গ্রহণ করেন।

অশোকের অনুশাসনে লেখা আছে যে, তিনি আফগানিস্তানসহ মধ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর বাণী গ্রিক ভাষায় অনুদিত করে প্রচার করা হয়েছিল। অশোকের সাম্রাজ্যের সীমা আফগানিস্তানের কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেখানেও সম্রাট অশোকের শিলালিপি পাওয়া গেছে। এ সময় ভারত ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্ম জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিব্বতে ধর্মদূত প্রেরণ করা হয়।

মৌর্যরা প্রায় ১৩৭ বছর মগধে রাজত্ব করেন। তারপর মৌর্যবংশের শাসন সমাপ্ত হয়। এরপর শুঙ্গবংশ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। কিন্তু তখনও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব বজায় ছিল। হিউয়েন সাং বাংলাদেশেও সম্রাট অশোকের নির্মিত স্তূপ দেখেছেন বলে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে মৌর্যবংশের কোন্ রাজার অবদান তুমি সবচেয়ে বেশি মনে কর এবং কেন?

পাঠ : ৬

কুষাণ আমল

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ বংশের রাজত্বের সূচনা হয়। কুষাণ বংশের প্রথম রাজা ছিলেন কুজুল কদ্‌ফিসেস। মগধ বা বর্তমান বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চল ও আফগানিস্তান নিয়ে এই সাম্রাজ্য গঠিত হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন কণিষ্ক। সম্রাট অশোকের মতো তিনি প্রথম জীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। স্থবির পার্শ্বকের সংস্পর্শে এসে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগী হন। তারপর থেকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি খুব আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে সম্রাট কণিষ্কের অবদান

সম্রাট কণিষ্কের সময়ে ভিক্ষুসজ্ঞ বিভিন্ন নিকায়ে বিভক্ত ছিলেন। ভিক্ষুদের সংহতি রক্ষার জন্য সম্রাট কণিষ্ক চেষ্টা শুরু করেন। তিনি ধর্মগুরু পার্শ্বকের পরামর্শে একটি সঙ্গীতি আহ্বান করেন। বিভিন্ন মতবাদের পণ্ডিত ভিক্ষুদের আহবান করে জালন্ধরে সমবেত করেন। উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্যে থেকে সঙ্গীতির জন্য পাঁচশত পণ্ডিত ভিক্ষু নির্বাচন করা হয়।

সম্রাট কণিষ্ক তাঁদের জন্য একটি সুন্দর ভবন নির্মাণ করেন। এই ভবনেই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। পরে এ ভবনের নাম হয় কুণ্ডলবন বিহার। এই সঙ্গীতিতে পালি ভাষার বদলে বুদ্ধবাণী সংস্কৃত ভাষায় সংকলন করা হয়। তারপর সংকলিত ত্রিপিটকের ওপর টীকাগ্রন্থ রচিত হয়। এর নাম বিভাসাশাস্ত্র। এই সঙ্গীতিকে কণিষ্ক সঙ্গীতি বা সর্বাস্তিবাদী সঙ্গীতিও বলা হয়।

কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মের প্রসারে অনেক স্তূপ ও চৈত্য নির্মাণ করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি চিন ও মধ্য এশিয়ায় ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। কণিষ্কের সময় মহাকবি অশ্বঘোষ ও বিখ্যাত দার্শনিক বসুমিত্র অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। কণিষ্ক নিজেও অত্যন্ত গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের নানা স্থানে শিলালিপিতে উপদেশ লিখে রেখে গেছেন। আফগানিস্তানে এ রকম একটি প্রকাণ্ড শিলালিপি পাওয়া যায়। শিলালিপিতে বিহার নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কণিষ্কের পর গুপ্ত সম্রাজ্যের সময় ফা-হিয়েন ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন। তিনি বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কথা বলে গেছেন। বগুড়া জেলার মহাস্থানে বোধিসত্ত্বের একটি মূর্তি পাওয়া যায়। রাজশাহীর বিহারেও এই সময়ে একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে কণিষ্কের সময় বাংলাদেশেও বৌদ্ধধর্মের প্রচার লাভ করেছিল।

অনুশীলনমূলক কাজ
সম্রাট কণিষ্কের কোন অবদানটি তুমি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে কর যুক্তিসহ লেখ

পাঠ : ৭

পাল যুগ

অষ্টম শতকে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় অরাজকতা দেখা দেয়। দেশে তখন কোন রাজা ছিল না। পরিস্থিতি ছিল ক্ষমতাধরদের নিয়ন্ত্রণে। এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থাকে বলা হতো 'মাৎস্যন্যায়'। মাৎস্যন্যায় বলতে ন্যায়–নীতিহীন ব্যবস্থাকে বোঝায়। অর্থাৎ, বড় মাছ যেমন নির্বিচারে ছোট মাছদের খেয়ে ফেলে তেমনি অষ্টম শতকে বাংলায় বলবানরা দুর্বলদের শোষণ ও পীড়ন করতো। এরূপ পরিস্থিতিকে 'মাৎস্যন্যায়' বলে। এরূপ অবস্থায় বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গোপালকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনি পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজা হন।

রাজা গোপালের পিতার নাম ছিল বপ্পট দেব। তিনি ছিলেন গৌড়ের দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র। গোপাল প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম নির্বাচিত গণতান্ত্রিক রাজা। তাঁর মৃত্যুর পর রাজপদে অভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র ধর্মপাল। রাজা ধর্মপালের সময় বিক্রমশীল ও সোমপুর মহাবিহারসহ বহু বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল। রাজা ধর্মপালের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর পুত্র দেবপাল। এভাবে পাল বংশ প্রায় চারশত বছরব্যাপী বাংলায় রাজত্ব করেন। এ সময় প্রজন্ম পরম্পরায় পালবংশের আঠারো জন রাজা রাজত্ব করেন। পরবর্তী প্রজন্মের রাজাদের মধ্যে মহীপাল, রামপাল, ন্যায়পাল ও মদনপালের নাম বিশেষভাবে সুপরিচিত। পালবংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন গোবিন্দপাল।

পাল বংশের সব রাজাই ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। কিন্তু অন্যান্য সকল ধর্মের প্রতিও তাঁরা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। এ সময় বাংলার সঙ্গে এশিয়ার জাভা, সুমাত্রা, বালী ইত্যাদি দ্বীপ রাজ্যগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সেসব অঞ্চলে আগেই বৌদ্ধধর্মের প্রসার লাভ করেছিল। পাল যুগে সেই অঞ্চলের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে পাল রাজাদের অবদান

পাল যুগের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত বিহারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : ওদন্তপুরী বিহার, বিক্রমশীল বিহার, সোমপুরী বিহার, পণ্ডিত বিহার ও জগদ্দল বিহার। রাজা মহীপাল সারনাথ ও বুদ্ধগয়া অঞ্চলে অনেক বিহার সংস্কার করেন এবং নতুন বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সময় বাঙালী পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নানাবিধ বিষয়ে প্রায় দুইশ'টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি তিব্বত রাজার আমন্ত্রণে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতবাসীকে বুদ্ধের অমৃত বাণী ভাষণ করে ধর্মপথে পরিচালিত করেন। ধর্মপালের সময় নালন্দা মহাবিহার সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধি লাভ করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাবিহারসমূহের গৌরব বর্হির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিহারসমূহে তিব্বত ও চিন থেকে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণ শিক্ষা লাভ করতে আসতেন। বিহারগুলো অসংখ্য খ্যাতিমান বৌদ্ধ পণ্ডিতের বিচরণক্ষেত্র ছিল। তিব্বতি ও ভারতীয় পণ্ডিতরা বিহারগুলোতে বসবাস করে বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করে তিব্বত, কাশ্মীর, নেপাল ও চিন প্রভৃতি দেশে নিয়ে যেতেন।

পাল যুগে বাংলা ভাষার উন্মেষ হয়। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ বা বৌদ্ধ গান ও দোহা এ সময় রচিত হয়েছিল। এগুলো রচনাকাল অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী বলে অনুমান করা হয়। পাল যুগে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রভুত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এ সময় বাংলাদেশে শাক্ত ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও প্রসার ঘটে। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পাল যুগে বাংলার বিভিন্ন ধর্ম ও সাস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্মিলিতভাবে বিকাশ লাভ করেছিল।

অনুশীলনমূলক কাজ
পালযুগে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারগুলোর তালিকা প্রস্তুত কর

পাঠ : ৮
বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম

প্রাক-আধুনিক যুগ

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম কখন এবং কীভাবে প্রচার প্রসার লাভ করেছিল সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি আছে যে, বুদ্ধের সময়ই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। জনশ্রুতি হতে জানা যায় যে, বুদ্ধ কর্ণসুবর্ণ ও সমতটে সাতদিন, পুণ্ড্রবর্ধনে তিনমাস অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও পুণ্ড্রবর্ধন ছিল বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন নাম। মহাবংস ও দীপবংস গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, সম্রাট অশোকের সময় সোণ ও উত্তর থের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মিয়ানমারে

২০২৩

গিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় তাঁরা বাংলার উপর দিয়ে মিয়ানমারে গিয়েছিলেন এবং যাওয়ার পথে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। পুণ্ড্রবর্ধন সম্রাট অশোকের শাসনাধীন ছিল বলে ধারণা করা হয়। অশোকাবদান গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, এক নিগ্রন্থ বুদ্ধের ছবি এঁকে তা পদদলিত করে অবমাননা করে। সম্রাট অশোক এ খবর শুনে তাঁকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। সম্রাট অশোক তাঁর সমগ্র রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এসব কারণে পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলেও তখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রত্নস্থল সাঁচীতে একটি অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়। অনুশাসনটি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের বলে ধারণা করা হয়। এ অনুশাসন হতে জানা যায় যে, ধর্মদত্তা ও ইসিনন্দন (ঋষিনন্দন) নামক পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলের দু'জন অধিবাসী সাঁচীস্তূপের তোরণ ও দেয়াল নির্মাণের জন্য অর্থ দান করেছিলেন। নাগার্জুনকোণ্ড নামক বৌদ্ধ প্রত্নতীর্থ হতে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। শিলালিপিটি খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের বলে ধারণা করা হয়। এ শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে সেসময় বাংলা বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন খ্রিষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের দিকে প্রাচীন বাংলার তাম্রলিপ্তি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি সেখানে ২২টি বৌদ্ধবিহারে বহু ভিক্ষু বসবাস করতেন বলে ভ্রমণ বিবরণীতে উল্লেখ করেন। সেসময় আরো কয়েকজন চৈনিক ভ্রমণকারী বাংলায় এসেছিলেন। গুপ্তযুগের অনেক তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাম্রলিপিতে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা চৈনিক ভ্রমণকারীদের বর্ণনা সঙ্গে মিলে যায়। তাম্রলিপিতে এরূপ উল্লেখ আছে যে, পুণ্য অর্জনের জন্য মহারাজা রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহাযানী আচার্য শান্তিদেব প্রতিষ্ঠিত আশ্রমবিহারে দিনে তিনবার বুদ্ধকে ধূপ-বাতি ও নানাদ্রব্যে পূজা করার জন্য এবং ভিক্ষুদের ভরণ-পোষণের জন্য এগার পাটক জমি দান করছি।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলায় ভ্রমণে আসেন এবং বাংলায় বিভিন্ন বিহারে অবস্থান করে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁর ভ্রমণ বিবরণী হতে জানা যায় যে, সে সময় পুণ্ড্রবর্ধনে ২০টি সজ্ঘারাম এবং তিন হাজার হীনযানী ও মহাযানী বৌদ্ধভিক্ষু; কর্ণসুবর্ণে ১০টি সজ্ঘরাম এক হাজার হীনযানী ভিক্ষু; তাম্রলিপ্তিতে ১০টি সজ্ঘারাম ও দুই হাজার ভিক্ষু; সমতটে ৩০টি সজ্ঘরাম ও দু'হাজার ভিক্ষু বসবাস করতেন। এসব অঞ্চলে বহু বিখ্যাত বিহার ছিল। তিনি এসব অঞ্চলে সম্রাট অশোক প্রতিষ্ঠিত বহু স্তূপ ও স্তম্ভ দেখতে পেয়েছিলেন।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত খড়গবংশ, দেববংশ, চন্দ্রবংশ এবং পালবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজবংশ বাংলায় রাজত্ব করতেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বাংলায় ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করেছিল। এ সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বাংলা খুবই জনপ্রিয় ছিল। খননকাজের ফলে বিভিন্ন বহু প্রাচীন বৌদ্ধবিহার, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, পালযুগ পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম খুবই জনপ্রিয় ধর্ম ছিল। উপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশে হীনযানী, মহাযানী ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ তান্ত্রিক বৌদ্ধসাধকগণ রচনা করেছিলেন।

পাল যুগের পর থেকে আঠারো'শ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় বাংলার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস অস্পষ্ট। এ সময় বৌদ্ধরা রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নানা কারণে অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। জানা যায় সে সময় চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও পটুয়াখালীতে বৌদ্ধরা বসবাস করতো। এছাড়া রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ, দিনাজপুর প্রভৃতি বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল।

বৌদ্ধদের মধ্যে ছোট-বড় বহু নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে। যেমন, বড়ুয়া, চাকমা, মারমা, রাখাইন, তঞ্চঙ্গ্যা, খিয়াং, চাক ইত্যাদি। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসব বৌদ্ধ নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করতো। বড়ুয়া ব্যতীত অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস মূলত চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহে। এছাড়া চাক, খিয়াং, তঞ্চঙ্গ্যার বসবাসও এ অঞ্চলে। ইতিহাস পাঠে ধারণা করা হয় 'বড়ুয়া' অভিধাযুক্ত বৌদ্ধরা মগধ থেকে আসাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী হয়ে চট্টগ্রামে এসে বসবাস শুরু করে। ১২০১ সালে বখতিয়ার খিলজী মগধ (বর্তমান বিহার রাজ্য) আক্রমণ করেন। সে সময় মগধ ও বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন লক্ষণ সেন। বখতিয়ার খিলজীর হাতে লক্ষণ সেন পরাজিত হন। এ সময় বৌদ্ধদের একটি দল পুব দিকে চলে আসে। অনুমান করা হয় তারাই কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের পূর্বপুরুষ। তাছাড়া সে সময় কুমিল্লা অঞ্চল ছিল পট্টিকের রাজাদের শাসনে। পট্টিকের রাজা রণবঙ্কেমল্ল ছিলেন বৌদ্ধ। তিনি ১২০৪ থেকে ১২২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কুমিল্লার লালমাই ময়নামতি তখন সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। এই অঞ্চলের নাম ছিল সমতট। তখন ময়নামতিতে শালবন বিহার, পট্টিকের বিহার ইত্যাদির গৌরব ছিল অক্ষুণ্ন।

বর্তমানে কুমিল্লার বৌদ্ধরা সিংহ উপাধিধারী। সিংহ অর্থ শ্রেষ্ঠ। শাক্যদের নামের সঙ্গে 'সিংহ' শব্দটি ব্যবহার হতে দেখা যায়। বুদ্ধকে শাক্যসিংহ বলা হতো। কুমিল্লার বৌদ্ধরা মনে করেন তাঁরা শাক্যসিংহ বুদ্ধের বংশধর। এছাড়া বৌদ্ধদের মধ্যে চৌধুরী, তালুকদার ও মুৎসুদ্দী পদবিরও প্রচলন ছিল।

আঠারো শতকে আরাকানি বৌদ্ধরা চট্টগ্রাম শাসন করত। এ সময় চাকমা রাজা শেরমুস্ত খান ছিলেন চট্টগ্রামের শাসক। তিনি আরাকান রাজার অধীনস্থ রাজা ছিলেন। চাকমারা নিজেদের আদি নিবাস চম্পক নগর মনে করেন। সেখান থেকে তারা চট্টগ্রামে আসেন বলে মনে করা হয়। বিতর্ক থাকলেও চাকমারা বিশ্বাস করেন এই চম্পক নগর ছিল ভারতের মগধ অঞ্চলে । আবার অনেকের মতে কুমিল্লার কাছাকাছি কোথাও এ নামে একটি নগর ছিল। কেউ কেউ অনুমান করেন মিয়ানমারের পূর্বে কোন অঞ্চলে এটি ছিল। শেরমুস্ত খান ১৭৩৭ সাল থেকে ১৭৫৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা পলাশীতে সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত চাকমা রাজার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলে। তখন চাকমা রাজ্যের সীমা উত্তরে লুসাই পাহাড়, দক্ষিণে ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড, পূর্বে শঙ্খ নদী ও পশ্চিমে ফেনী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এ সময় চট্টগ্রামের চাক্‌মা, চাক, খিয়াং, তঞ্চঙ্গ্যা ও বড়ুয়া বৌদ্ধরা বসবাস করত। তাঁরা সবাই ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এছাড়া হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিষ্টানরাও চট্টগ্রামে বাস করত। তখন চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জেলা বা অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি ছিল।

মারমারা রামু ও মাতামুহুরী অঞ্চলে বসবাস শুরু করে ১৭৭৪ সালের দিকে। এরপর তারা বান্দরবান শহরে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৮৪ সালের দিকে আরাকান থেকে রাখাইন বৌদ্ধরা বরিশালের পটুয়াখালী

অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধদের প্রভাব ছিল বলে কিছু মারমা ও রাখাইনরা ঢাকায় চলে আসে। ঢাকার বড় মগবাজার ও মগবাজার তার সাক্ষ্য বহন করছে। ঢাকার ধামরাই অঞ্চলের নাম ধর্মরাজিক থেকে উদ্ভূত। সাভারের প্রাচীন নাম ছিল সাহোর। এখানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। অতীশ দীপঙ্কর এই সাহোরে পড়াশুনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

আঠারো শতকে বড়ুয়ারা রাঙ্গুনীয়া, রাউজান, ফটিকছড়ি, সীতাকুণ্ড, বোয়ালখালী, পটিয়া, সাতকানিয়া, বাঁশখালী প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করত। কক্সবাজার ও টেকনাফ অঞ্চলে বড়ুয়া, মারমা ও রাখাইনদের প্রাধান্য ছিল।

চট্টগ্রামে চাকমা রাজ্যের রাজধানী প্রথমে সাতকানিয়া বা রামুর কাছাকাছি কোথাও ছিল। সাতকানিয়া শব্দ এসেছে 'সাত কন্যা' বা চাকমা রাজকন্যার থেকে। রামু থানাতে এখনও চাকমাকূল নামে একটি স্থান আছে।

১৭৮৫ সালে চাকমা রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গুনীয়া থানার রাজানগর গ্রামে স্থাপিত হয়। ১৮৬৯ সালে রাজানগর থেকে চাকমা রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গামাটিতে চলে যায়। কারণ এ সময় চন্দ্রঘোনা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা সদর অফিস রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, পটুয়াখালী ও উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের বৌদ্ধদের অবনতির কাল শুরু হয় বলে মনে করা হয়। এখনও উত্তরবঙ্গে অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ আছে। কিন্তু তাঁদের সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য আর নেই।

পাঠ-৯
আধুনিক যুগ

বর্তমানে অন্যান্য ধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মও বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদায় অনুশীলিত হচ্ছে। এ দেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মতো স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক। সকলের সাথে সৌভ্রাতৃত্ব বোধ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে ধর্ম অনুসরণ করা বৌদ্ধদের অন্যতম ঐতিহ্য। বৌদ্ধরা সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে হলে চাকমা, মারমা ও বড়ুয়া বৌদ্ধদের সম্মিলিত ইতিহাস জানা দরকার। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি - এ তিনটি পার্বত্য জেলায় চাকমা, মারমা, রাখাইন, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, খিয়াং প্রভৃতি বৌদ্ধ নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে। কিছু রাখাইন পটুয়াখালী, বরগুনা অঞ্চলে বসবাস করে। বড়ুয়া, চৌধুরী ও সিংহ উপাধিধারী বৌদ্ধরা যথাক্রমে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করে। এদের ইতিহাসই বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ইতিহাস।

চাকমা রাজা জানবক্স খান ১৮০০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সারা জীবন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাটান। জানবক্স খানের মৃত্যুর পর ধরম বক্স খান রাজা হন। তাঁর মৃত্যুর পর রানি কালিন্দী রাজত্ব করেন। দীর্ঘদিন ইংরেজরা তাঁকে রানি স্বীকার করেন নি। ১৮৪৪ সালে ইংরেজরা তাঁকে সরকারিভাবে পার্বত্য সার্কেলের প্রধান হিসেবে 'রানি' বলে স্বীকার করেন। তিনি ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৮৬০ সালে পার্বত্য এলাকাকে নিয়ে ইংরেজরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করে।

ব্রিটিশ শাসন আমলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো বৌদ্ধরাও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ সময় বিদ্যাশিক্ষার জন্য তারা কলকাতায় যেতেন। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য অনেকে মিয়ানমার, (তৎকালীন বার্মা) শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড গমন করেন। ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরির উদ্দেশ্যে এ সময় বৌদ্ধরা আরাকান, রেঙ্গুন, কলকাতা, ত্রিপুরা ও আসাম পাড়ি দিতেন। উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা শিক্ষা অর্জন ও জীবিকার জন্য ব্রিটিশ শাসনের অধীন আর্থিক ও শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলে গমন করতেন। সরকারি ও বেসরকারি চাকরি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, শিক্ষক ইত্যাদি পেশাজীবী ও ব্যবসা প্রভৃতি পেশায় আত্মনিয়োগ করে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। ফলে তারা নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশের জন্য নব উদ্যমে ধর্মচর্চা শুরু করেন। এ উদ্দেশ্য সফল করার ক্ষেত্রে বৌদ্ধভিক্ষুগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ব্রিটিশ আমলে বৌদ্ধদের মধ্যে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান আমলে তা আরো সমৃদ্ধি লাভ করে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রাজ্ঞ বৌদ্ধভিক্ষুদের সঠিক দিক নির্দেশনা এবং তাঁদের নির্দেশিত কর্মকাণ্ডে গৃহী বৌদ্ধদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। একতাই শক্তি – এ উপলব্ধিতে বৌদ্ধরা সম্মিলিতভাবে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, পরাধীন থেকে কখনো উন্নতি করা সম্ভব নয়। ফলে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সাথে হাত মিলিয়ে তাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এজন্য বৌদ্ধরা মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা ও সহায়তা দানমূলক তৎপরতার কারণে পাকিস্তানী সৈন্যদের রোষানলে পড়ে। বিভিন্ন প্রকাশনা মাধ্যম হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বৌদ্ধ বিহারে অগ্নি সংযোগ, লুণ্ঠন, বুদ্ধমূর্তি ভাঙা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা ইত্যাদি বহু ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে।

এ সময় তদানীন্তন ঢাকার একমাত্র বৌদ্ধ বিহার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত হোয়ারাপাড়া গ্রামের সুদর্শন বিহার ও পটিয়া থানাধীন জোয়ারা সর্বজনীন বিহার হতে অমূল্য বুদ্ধাস্থি লুণ্ঠিত হয়। এছাড়া বহু বৌদ্ধ বিহারে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত স্বর্ণের বুদ্ধমূর্তি এ সময় লুণ্ঠিত হয় এবং বিহারসমূহের বহু আবাসিক ভিক্ষুকে নির্যাতন করা হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল– তদানীন্তন সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু শ্রীমৎ অভয়তিষ্য মহাথের, মির্জাপুর বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শান্তপদ মহাথের, রাউজানের ডোমখালী গ্রামের শাক্যবোধি মহাথের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। পটিয়া থানার পাঁচরিয়া গন্ধকুটি বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ জিনানন্দ ভিক্ষুকে নিজ বিহার হতে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। কুমিল্লার বড়ইগাঁও বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধের আসন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসন ধ্বংস করা হয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পার্শ্বস্থ 'সীতাকুণ্ড বৌদ্ধ বিহার', রামুর ঐতিহ্যবাহী 'রামকোট বৌদ্ধ বিহার', কক্সবাজারের ঐতিহাসিক 'অগ্গমেধা বৌদ্ধ বিহার' প্রভৃতি একাধিকবার পাকিস্তানী হানাদার ও তাদের দেশীয় দোসরদের দ্বারা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। ফলে বৌদ্ধসম্প্রদায় আর্থিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। কিন্তু স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নতুনভাবে আবার দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণায় সকল সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করে এ দেশকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করতে থাকেন। বৌদ্ধভিক্ষু ও গৃহী বৌদ্ধরা সম্মিলিত হয়ে বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করে এদেশের সমৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছেন। বাংলাদেশ সরকারও বৌদ্ধদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশে নানাভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকার বৌদ্ধদের কল্যাণে 'বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করেছে। এছাড়া ঢাকায় অবস্থিত 'বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড' থেকে পালি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এর অধীনে দেশে প্রায় ১১৫ টির মতো পালি টোল ও কলেজ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বি.এ অর্নাস, এম. এ, এম. ফিল ও পিএইচ. ডি পর্যায়ে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি সবচেয়ে প্রাচীন। ১৮৮৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এছাড়া আরও কিছু বৌদ্ধ সংগঠন আছে। সেগুলোর মধ্যে পার্বত্য বৌদ্ধ সঙ্ঘ, বাংলাদেশ সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষুমহাসভা, রাখাইন মারমা সঙ্ঘ কাউন্সিল, বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ মারমা বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশন, উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ পরিষদ উল্লেখযোগ্য।

খননকার্যের ফলে বাংলাদেশে কুমিল্লা, বগুড়া, দিনাজপুর, নওগাঁ, রাজশাহী, সাভার, নরসিংদি, চট্টগ্রাম, প্রভৃতি অঞ্চলে বহু প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো বাংলাদেশের বৌদ্ধদের অতীত ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে। এগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুতত্ত্ব অপরিসীম। তন্মধ্যে সোমপুর মহাবিহারকে ইউনেস্কো 'বিশ্ব-ঐতিহ্য' হিসবে ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখতে আসেন। ফলে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের পরিচিতি ও মান-মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ সরকার এসব প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য সযত্নে সংরক্ষণ করে চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বিহার আছে। তন্মধ্যে অনেক বিহার নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এগুলোর মধ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ার ঠেগরপুনি বুড়া গোঁসাই বিহার, পাহাড়তলী মহামুনি বিহার, উনাইনপুরা লংকারাম বিহার, বাগোয়ানের ফরাচিন বিহার, চট্টগ্রাম মহানগরীতে নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহার, নবপণ্ডিত বিহার, রাউজান সুদর্শন বিহার, কাপ্তাই চিৎমরম বিহার, রাঙ্গামাটির রাজবন বিহার, কক্সবাজার অগ্গমেধা বৌদ্ধ বিহার, বান্দরবান রাজবিহার, বান্দরবানের উজানী পাড়া বৌদ্ধ বিহার, বান্দরবানের স্বর্ণ মন্দির, রামুর রামকোট বিহার, মানিকছড়ি রাজবন বিহার, ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে মেলা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহারকে কেন্দ্র করে অনেক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাগুলোকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনন্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এসব মেলায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় নাটক, গান ও বুদ্ধ কীর্তনের আয়োজন হয়। এগুলোর মধ্যে চক্রশালা মেলা, রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার মেলা, মানিকপুর পরিনির্বাণ মেলা, মছদিয়া চৈত্য মেলা, ঠেগরপুনি বুড়াগোঁসাই মেলা, বিনাজুরি পরিনির্বাণ মেলা, ইছামতি ধাতুচৈত্য মেলা, লাঠিছড়ি বুদ্ধ মেলা, শীল ঘাটা মহাপরিনির্বাণ মেলা, আবুরখীল কেন্দ্রীয় যোগেন্দ্র বৌদ্ধ বিহার মেলা, পাঁচরিয়া গন্ধকুটি বিহারে শীলাবুদ্ধ ও বাইশ বুদ্ধের মেলা, ঢেমশা শাক্যমুনি মেলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রাজধানী ঢাকায় বৌদ্ধদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয় ১৯৫০ সালে। এসময় ঢাকায় চাকরির সুবাদে বসবাসরত বৌদ্ধরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতো। পরবর্তিতে ১৯৬০ সালে ঢাকায় প্রসিদ্ধ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বৌদ্ধদের ঢাকায় ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার আবহ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ঢাকায় অনেক বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলো বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশে

২০২৩

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, বাংলাদেশ বৌদ্ধ মহাবিহার, ধর্মজ্যোতি বৌদ্ধ বিহার, সাভার রাজবন বিহার। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহী বৌদ্ধ সমাজ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সংখ্যায় কম হলেও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাংলাদেশে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।

অনুশীলনমূলক কাজ
কোন্ কোন্ বৌদ্ধ বিহারে মেলা অনুষ্ঠিত হয় লেখ

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ভারতবর্ষে অনেকগুলো --------- বিভক্ত ছিল।

২. গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিষ্টপূর্ব------ অব্দে।

৩. শিক্ষা ও শিল্পকলার উন্নতিতে-------- খুব খ্যাতি ছিল।

৪. পাল যুগে -------- ভাষার উন্মেষ হয়।

৫. পাল বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন --------।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. প্রাক বুদ্ধ যুগে রাজারা জনগণের কাছ থেকে কর হিসেবে কী নিতেন?
২. গৌতম বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে কী কী বিদ্যা শিক্ষার প্রচলন ছিল?
৩. ধর্মযাত্রা কী?
৪. চর্যাপদ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাক বুদ্ধ যুগের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।
২. ষোড়শ মহাজনপদের পরিচয় দাও।
৩. বাংলাদেশের কয়েকটি বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের পরিচয় তুলে ধর।
৪. বাংলাদেশের বৌদ্ধরা কী কী পদবি ব্যবহার করেন লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। কাসীর রাজধানী কোনটি ?

ক. চম্পা নগরী খ. বৈশালী
খ. বারানসি ঘ. শ্রাবস্তী

২। গান্ধার জনপদ বিখ্যাত হওয়ার কারণ –

i. বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল বলে
ii. শিল্প সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র ছিল বলে
iii. সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল বলে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের ছকটি দেখে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

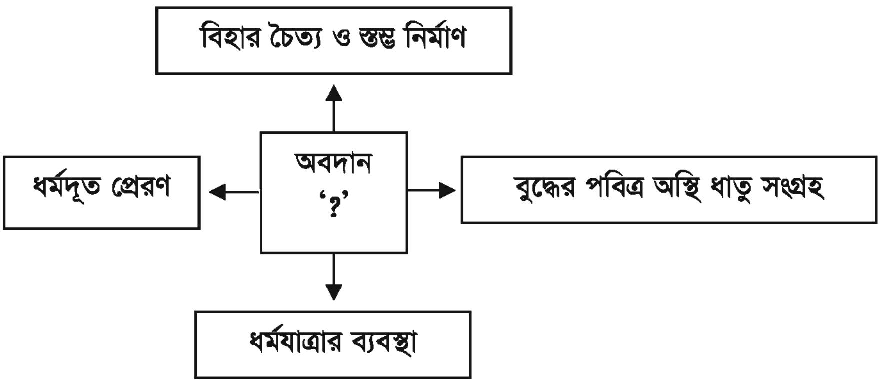

৩। '?' চিহ্নিত স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারে কোন্ বংশের অবদান বোঝানো হয়েছে ?

ক. পাল খ. মৌর্য
গ. আধুনিক ঘ. কুষাণ

৪। উক্ত বংশীয় এক শাসক বৌদ্ধ সঙ্গীতি আয়োজনের ব্যবস্থা করেন তা হলো–

ক. ১ম সঙ্গীতি খ. ২য় সঙ্গীতি
গ. ৩য় সঙ্গীতি ঘ. ৪র্থ সঙ্গীতি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

ক্রমিক নং	বংশের নাম	শাসনকাল
১.	পাল	৪০০ বছর
২.	মৌর্য	১৩৭ বছর

২০২৪

ক. কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি কে ছিলেন ?

খ. ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে যে কোন একটি ব্যাখ্যা কর।

গ. ছকে বর্ণিত কোন বংশীয় রাজা 'মাৎস্যন্যায় নীতি' বিলোপের ভূমিকা রেখেছিলেন ? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উক্ত বংশীয় রাজাদের অবদান বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে'–তাতে তুমি কী একমত ? যুক্তি প্রদর্শন কর।

২। রাঙ্গুনিয়ার পৌর মেয়র সুদর্শন চৌধুরী সত্যবাদিতা ও দানশীলতায় অতুলনীয় ছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মুক্ত হাতে দান দিতে পছন্দ করতেন। তাঁর এলাকায় গরিব দুঃখীরা কোন অবস্থায় আছেন, তাদের খোঁজ খবর নিতেন এবং সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতেন।

ক. মৌর্য বংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন ?

খ. অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করে অনুতপ্ত হলেন কেন ?

গ. মেয়র সুদর্শন চৌধুরীর সাথে বুদ্ধের সমসাময়িক কোন রাজার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মেয়র সুদর্শন চৌধুরীর কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের কল্যাণকর বাণীর প্রতি এলাকাবাসীদের আকৃষ্ট করা'-উক্তিটির যথার্থতা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

সুন্দর জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেককে প্রতিদিন নিয়মমাফিক কিছু কাজ করতে হয়। এ কাজগুলির মধ্যে কিছু আছে শারীরিক সুস্থ থাকার জন্য, কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপনের জন্য আর কিছু শিক্ষা লাভ ও অর্থ উপার্জনের সঙ্গে জড়িত। এগুলোকে সাধারণত প্রাত্যহিক কর্ম ও নিত্যকর্ম বলা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক নিত্যকর্ম আছে যা তারা পালন করে থাকেন। এছাড়া বুদ্ধ নির্দেশিত কিছু অনুশাসনও আছে যা ভিক্ষু ও গৃহীদের জন্য অবশ্য পালনীয়। এই অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের নিত্যকর্মসমূহ এবং অবশ্য পালনীয় অনুশাসনগুলো সম্পর্কে পাঠ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

* বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
* বৌদ্ধ ভিক্ষুদের করণীয়সমূহ উল্লেখ করতে পারব;
* বৌদ্ধ গৃহীদের পালনীয় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
* পটভূমিসহ সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মের বিষয়বস্তু ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

গৃহীজীবন ত্যাগ করে যাঁরা প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরাই বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষু ও শ্রমণ নামে পরিচিত। গৃহধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য পালন ও নির্বাণ সাধনার পথ অনুসরণই এঁদের লক্ষ্য। এছাড়া বুদ্ধ-প্রবর্তিত সদ্ধর্ম দিকে দিকে সকল মানুষের কাছে প্রচার করাও বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের কর্তব্য। তথাগত বুদ্ধ তাঁর ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে এরূপ আহ্বানই করেছিলেন। তিনি তাঁর অনুসারী ভিক্ষু-শ্রমণদের সুন্দর জীবনযাপনের জন্য অনেক বিধিবিধান নির্দেশ করেন, যা বিনয়পিটকে বর্ণিত আছে।

যে-কেউ বৌদ্ধ সঙ্ঘে ভিক্ষু বা শ্রমণ হয়ে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তবে সাত বছর বয়স না হলে শ্রমণ হতে পারেন না এবং বয়স বিশ বছরের কম হলে ভিক্ষু হতে পারেন না। শ্রমণ অর্থ শিক্ষানবিশ। প্রথমে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রব্রজ্যা ও ব্রহ্মচর্য জীবনের নিয়মসমূহের সঙ্গে পরিচিত ও তা পালনে অভ্যস্ত হতে হয়। পরবর্তী সময়ে ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করা যায়। বুদ্ধ ভিক্ষু-শ্রমণদের জন্য কিছু অবশ্য করণীয় কর্ম ও অবশ্যপালনীয় অনুশাসন নির্দেশ করেছেন, সেগুলোকে ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন নামে অভিহিত করা হয়। নিম্নে ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

দশশীল :

শ্রমণদের প্রতিদিন ত্রিশরণসহ দশশীল গ্রহণ করতে হয়। শ্রমণদের জন্য দশশীল পালন আবশ্যিক নিত্যকর্ম। দশশীল সমূহ হলো : ১. জীবহত্যা ২. চুরি ৩. ব্যভিচার ৪. মিথ্যাভাষণ ৫. সুরাপান ৬. বিকাল ভোজন ৭. নৃত্যগীতে অনুরক্তি ৮. গন্ধমাল্য প্রভৃতি ধারণ ৯. আরামদায়ক শয্যায় শয়ন ১০. সোনারুপা গ্রহণ ইত্যাদি অভ্যাস বর্জন।

প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা :

আহার, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঔষধ জীবনধারণের এই চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণ সম্পর্কে ভিক্ষু-শ্রমণদের অবশ্যই ভাবনা করতে হয়, যা প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা নামে পরিচিত। এগুলো নিম্নরূপ :

১. **চীবর প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা :** চীবর পরিধান বিষয়ে ভিক্ষু-শ্রমণদের এরূপ ভাবনা করতে হয় :

   পোকা-মাকড়, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর কামড়, শীত ও উষ্ণতা নিবারণ, ধুলা-বালি, লজ্জা নিবারণ প্রভৃতি হতে সুরক্ষার জন্য এই চীবর পরিধান করছি। পঞ্চ-কামগুণ উৎপাদনের জন্য নয়।

২. **পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা :** আহার গ্রহণ করার সময় ভিক্ষু-শ্রমণদের এরূপ ভাবনা করতে হয় : "আমি কেবল জীবনধারণের জন্য এই আহার গ্রহণ করছি। শারীরিক সৌন্দর্য ও বল বৃদ্ধির জন্য নয়।"

৩. **শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ :** শয়নাসন গ্রহণ করার সময় ভিক্ষু-শ্রমণদের এরূপ ভাবনা করতে হয় : এ শয়নাসন শুধু শীত ও উষ্ণতা নিবারণের জন্য, দংশক-ধুলাবালি-রৌদ্র-পোকামাকড়, সরীসৃপ প্রভৃতির আক্রমণ নিবারণ এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধনের জন্য। আলস্য বা নিদ্রায় অনর্থক কালক্ষেপণের জন্য নয়।

৪. **গিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ :** ঔষধ গ্রহণের সময় ভিক্ষু-শ্রমণদের এরূপ ভাবনা করতে হয়: কেবল রোগ উপশমের জন্য প্রয়োজন মতো এ ওষুধ সেবন করছি। অন্য কোনো অকুশল উদ্দেশ্যে নয়। উল্লেখিত মৌলিক উপাদান গ্রহণের সময় প্রত্যবেক্ষণ ভাবনাকে বর্তমান প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা বলা হয়।

সূর্যোদয়ের পূর্বে, দুপুরের আহারের পরে এবং সন্ধ্যায় বন্দনার সময়ও প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করতে হয়। এগুলোকে অতীত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা বলে। এ ভাবনা না করলে পরিভোগকারীর জন্য এসব চুরি ও ঋণের পর্যায়ভুক্ত হয়। প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা লোভ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংসের হেতু উৎপন্ন করে।

চারি অকরণীয় :

ভিক্ষু- শ্রমণদের চারটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়, যাকে চারি অকরণীয় বলে। যথা– ১. ব্যভিচার না করা ২. চুরি না করা ৩. জীবহত্যা না করা এবং ৪. দৈবশক্তিসম্পন্ন বলে দাবি না করা এবং দৈবশক্তি প্রদর্শন না করা। চতুর্থ অনুশাসনটি প্রবর্তিত হয়েছিল বৈশালীতে দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পর। সে সময় কিছু কিছু ভিক্ষু নিজেদের দৈবশক্তির অধিকারী বলে প্রচার করে গৃহীদের মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক খাদ্য সংগ্রহ করত। বুদ্ধ সেজন্য দৈবশক্তিসম্পন্ন বলে প্রচার ও তা প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকার জন্য বিধি-নিষেধ আরোপ করেন।

আহার :

ভিক্ষুরা একাহারী। তবে মধ্যাহ্নের পূর্বে বা দুপুর বারোটার আগে আহার গ্রহণ সম্পন্ন করতে হয়। সাধারণত ভিক্ষান্ন দ্বারা ভিক্ষু-শ্রমণদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভিক্ষু-শ্রমণগণ গৃহীদের আমন্ত্রণে গৃহে গিয়েও আহার গ্রহণ করতে পারেন।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য :

তিনটি চীবর, যথা : সংঘাটি, উত্তরাসঙ্ঘ ও অন্তর্বাস, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সুঁচ-সুতা, কটিবন্ধনী এবং জল ছাঁকনি–এই আটটি ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্য। দ্রব্যগুলো ভিক্ষু-শ্রমণদের জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট বলে বুদ্ধ নির্দেশ করেছেন।

সংযম ব্রত :

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সোনা রুপা গ্রহণ করা একেবারেই বারণ। যদি কোনো গৃহস্থ তা দান করেন তাহলেও ভিক্ষু তা নিজের জন্য রাখতে পারবেন না। হয় তা দাতাকে ফেরত দেবেন অথবা অন্য কোনো গৃহস্থকে দান করবেন। অন্য কোনো গৃহস্থকে দান করার ফলে তিনি তার বিনিময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিতে পারবেন। তবে সেগুলো ভিক্ষু নিজের জন্য নিতে পারবেন না। অন্য ভিক্ষু বা ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য নিতে পারবেন। বুদ্ধ শাসনের উন্নতির জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘ ভূমি, বিহার প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারবেন। বুদ্ধের সময় রাজা, মহারাজা ও গৃহীরা এরকম দান করতেন। তবে এগুলো সঙ্ঘসম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হবে।

পঞ্চ ভাবনা :

পঞ্চ ভাবনা ভিক্ষু শ্রমণদের নিত্যকরণীয় একটি ভাবনা। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অশুভ ও উপেক্ষা– এ পাঁচটি বিষয়কে অবলম্বন করে ভাবনা করতে হয় বিধায় একে পঞ্চ ভাবনা বলে। ভিক্ষু শ্রমণগণ সকাল-সন্ধ্যায় নির্জনে বসে এই পঞ্চ ভাবনা চর্চা করেন। পঞ্চ ভাবনা লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ও কামভাব থেকে মুক্ত রাখে। পঞ্চ ভাবনা হলো :

মৈত্রী ভাবনা : সকল প্রাণী শত্রুহীন হোক, বিপদহীন হোক, রোগহীন হোক, ভয়হীন হোক, সুখে বাস করুক–এরূপ কল্যাণকামনাই মৈত্রী ভাবনা।

করুণা ভাবনা : দুঃখীর দুঃখে ব্যথিত হয়ে 'দুঃখমুক্তি' কামনা করাকে করুণা ভাবনা বলে।

মুদিতা ভাবনা : অপরের সৌন্দর্য, যশ, লাভ, ঐশ্বর্য, অথবা সৌভাগ্য দেখে নিজ চিত্তে আনন্দ অনুভব করাই মুদিতা। 'সকল প্রাণী যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক' –এটি হলো মুদিতা ভাবনার মূলমন্ত্র।

অশুভ ভাবনা : শরীর ব্যাধি ও অশুচির আধার, অনিত্য এবং মৃত্যুর অধীন। এ বিষয়গুলো অবলম্বন করে ভাবনা করাই হচ্ছে অশুভ ভাবনা।

উপেক্ষা ভাবনা : লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অষ্টপ্রকার লোকধর্মে চিত্তকে অবিচলিত রেখে ভাবনা করাই হচ্ছে উপেক্ষা ভাবনা।

ধ্যান ও সমাধি :

ধ্যান ও সমাধি ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্যকরণীয় একটি বিষয়। ধ্যান অনুশীলন ব্যতীত চিত্তের একাগ্রতা আনয়ন সম্ভব নয়। মানুষ সহজে তৃষ্ণার জালে আবদ্ধ হয়। লোভ, দ্বেষ, মোহ, কামনা, বাসনা প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। এসবের তাড়নায় মানবচিত্ত অশান্ত থাকে। চিত্ত স্বভাবত চঞ্চল এবং ভালোমন্দ উভয় দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে থাকে। এরূপ চিত্তকে সংযত করতে না পারলে তৃষ্ণা হতে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়।

এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিত্ত-সংযমের চেষ্টা করেন। ধ্যানসাধনার লক্ষ্য চিত্তসংযম। ধ্যানের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সমাহিত বা স্থির করা হয়। ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্য ধ্যানানুশীলনের মাধ্যমে চিত্তের একাগ্রতা অর্জনের সাধনা করতে হয়। এভাবে আসক্তিসমূহ দূরীভূত হয়। এটি ধ্যানের প্রথম সোপান। মার্গফল লাভ করতে হলে এরকম চারটি সোপান অতিক্রম করতে হয়। বুদ্ধ-নির্দেশিত ধ্যানানুশীলনকে বিদর্শন ভাবনা বলা হয়। আসক্তিমুক্ত হয়ে মার্গফল লাভের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সাধনার নাম সমাধি। দ্বিতীয় স্তর থেকে সমাধির আরম্ভ। এ স্তরে সুখ-দুঃখ অতিক্রান্ত হয়ে শুধুমাত্র স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট থাকে। সমাধির দ্বারা ছয়রকম বিশেষ জ্ঞান অর্জন হয়ে থাকে। যথা– দিব্যাদিব্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, অন্যের মনোভাব জানা, পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে করা, রিপু দমনের ক্ষমতা লাভ, অলৌকিক বা ঋদ্ধি শক্তি অর্জন। অর্হৎ ভিক্ষুগণ এ সকল বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। এঁরা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করবেন না।

ভিক্ষুদের অবশ্যপালনীয় অনুশাসন :

ভিক্ষুদের ২২৭টি শীল বা বিধিবিধান পালন করতে হয়। 'পাতিমোক্‌খ' গ্রন্থে ভিক্ষুদের অবশ্য পালনীয় এসব বিধি-বিধানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভিক্ষুদের প্রতিমাসে অন্তত দুবার, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার চতুর্দশীতে পাতিমোক্‌খ আবৃত্তি করতে হয়। পাতিমোক্‌খে বর্ণিত অধিকাংশ শীল রাজগৃহে দেশিত হয়েছিল। ভিক্ষুদের জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছে বলে এই শীলসমূহ ভিক্ষুশীল নামে অভিহিত। গুরুত্ব অনুসারে ভিক্ষুশীলসমূহকে আট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : পারাজিকা, সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিস্‌সগিয়া, পাচিত্তিয়া, পাটিদেসনিয়া, সেখিয়া এবং অধিকরণ সমথ।

ভিক্ষুদের পাতিমোক্‌খে বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ অবশ্যই পালন করতে হয়। তথাগত বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণের পূর্বে তাঁর অন্তিম দেশনায় অপ্রমত্ত হয়ে কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যতদিন ভিক্ষুসঙ্ঘ শুদ্ধাচারী হয়ে সত্যপথে চলবে ততদিন সদ্ধর্ম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। শোকাভিভূত প্রিয়শিষ্য আনন্দকে শোক না করার জন্য উপদেশ দিয়ে বলেন, "নিজেই নিজের দীপ হয়ে বিচরণ করো, নিজেই নিজের শরণ নাও, অন্য শরণের প্রয়োজন নেই। আমার অবর্তমানে ভিক্ষুরা নিজের দীপ নিজে জ্বালবে, নিজের আশ্রয় নিজে হবে, অন্য কারো মুখাপেক্ষী হবে না, ধর্মের আশ্রয় নিয়ে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করবে।" বুদ্ধ তাঁর অবর্তমানে ধর্ম এবং ধর্মের বাহক সঙ্ঘকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন।

ভিক্ষুদের পিন্ডাচরণ

> **অনুশীলনমূলক কাজ**
> বিহারে গিয়ে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিত্যকর্ম সম্পর্কে
> তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি কর (দলগত কাজ)

পাঠ : ২
গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

গৃহীদের মঙ্গল, সুন্দর ও শান্তিময় জীবনযাপনের জন্য বুদ্ধ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে এসব ধর্মোপদেশ পাওয়া যায়। গৃহীদের উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত বুদ্ধের এসব ধর্মোপদেশ 'গৃহী বিনয়' হিসেবে গণ্য করা হয়। সিগালোবাদ সূত্র, কলহবিবাদ সূত্র, পরাভব সূত্র, মঙ্গলসূত্র, ব্যগ্ঘপজ্জ সূত্র, খগ্‌গবিসান সূত্র, লক্‌খন সূত্র, গৃহীপ্রতিপদা সূত্র, ধম্মিক সূত্র, গৃহপতিবর্গ, বিদূর পণ্ডিত জাতক প্রভৃতিতে এসব উপদেশ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

বুদ্ধের এসব ধর্মোপদেশ বা অনুশাসন গৃহী বৌদ্ধদের জন্য অবশ্যপালনীয়। এখানে ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১) সিগালোবাদ সূত্র :

একদিন রাজগৃহে বেণুবন বিহারে অবস্থানকালে বুদ্ধ সিগালক নামে এক ব্রাহ্মণ পুত্রের দেখা পান। সিগালক স্নানশেষে সিক্ত বস্ত্রে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্ধ্ব, অধঃ – ষড়দিকে নমস্কার করছিলেন। বুদ্ধ তাঁকে ঐরূপ নমস্কারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সিগালক বলেন, পৈতৃক প্রথা ও পিতার নির্দেশে তিনি ষড়দিকে নমস্কার করছেন। বুদ্ধ বুঝতে পারলেন সিগালক ষড়দিক বন্দনার মর্মার্থ বুঝতে পারেননি। অতঃপর, বুদ্ধ তাঁকে ষড়দিক বন্দনার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে গৃহীদের করণীয় সম্পর্কে যে-অনুশাসন প্রদান করেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

চার প্রকার ক্লিষ্টকর্ম বর্জন : প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার ও মিথ্যা ভাষণ–ধার্মিক গৃহীর এই চার প্রকার ক্লিষ্টকর্ম বর্জন করা উচিত।

চার প্রকার পাপকর্ম বর্জন : স্বেচ্ছাচারিতা, হিংসা, ভয় ও অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে পাপানুষ্ঠান করা – এ চার প্রকার পাপকর্ম ধার্মিক গৃহীর পরিত্যাগ করা উচিত। এসব পাপকর্ম যশ-খ্যাতি ক্ষয় করে।

ষড়দোষ বর্জন : নেশাদ্রব্য গ্রহণ, অসময়ে ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত, দ্যুত ক্রীড়া, কুসংসর্গ, আলস্যপরায়ণতা–এই ষড়দোষ ধার্মিক গৃহীর পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ :

ক) নেশা গ্রহণের ফলে ছয়টি বিষময় ফল ভোগ করতে হয়। যথা– ১. অকারণে ধনহানি ঘটে ২. কলহ বৃদ্ধি পায়, ৩. বিবিধ রোগের উৎপত্তি ঘটে ৪. দুর্নাম রটে ৫. নির্লজ্জ হয় এবং ৬. হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়। এসব কারণে জীবনহানিও ঘটতে পারে।

খ) অসময়ে ভ্রমণের ফলে ১. নিজে অরক্ষিত থাকে ২. স্ত্রী-পুত্র অরক্ষিত থাকে ৩. বিষয়সম্পত্তি অরক্ষিত থাকে ৪. সর্বদা আশঙ্কাযুক্ত হয়ে চলতে হয় ৫. পাপকর্মে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত হয় এবং ৬. বিভিন্ন রকমের দুঃখজনক বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

গ) আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকলে সর্বদা উৎকণ্ঠিত চিত্তে কালযাপন করতে হয়।

২০২৩

ঘ) দ্যুত ক্রীড়া অর্থাৎ তাস, পাশা, জুয়া জাতীয় খেলায় ১. জয়ী ব্যক্তির শত্রু বৃদ্ধি পায় ২. পরাজিতের অনুশোচনা হয় ৩. সম্মানহানি ঘটে ৪. সভা-সমিতিতে কথার মূল্য থাকে না ৫. মিত্র-পরিজনদের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় এবং ৬. স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণে অসমর্থ হয়।

ঙ) কুসংসর্গের ফলে ১. ধূর্ত ২. দুশ্চরিত্র ৩. নেশাগ্রস্ত ৪. জুয়াড়ি ৫. প্রবঞ্চক এবং ৬. ডাকাত জাতীয় ব্যক্তি বন্ধু হয়। ফলে চরিত্র কলুষিত ও জীবনহানি হয়।

চ) আলস্যপরায়নতার ফলে অনুৎপন্ন ধন উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন ধন ধ্বংস হয়।

মিত্রের লক্ষণ : যে ব্যক্তি বন্ধুকে পাপকার্য হতে নিবৃত্ত করেন, মঙ্গলকার্যে প্রবৃত্ত করেন অশ্রুত বিষয় শ্রবণ করায়, স্বর্গে যাওয়ার পথ নির্দেশ করে – এরূপ ব্যক্তিকে প্রকৃত বন্ধু বা মিত্র বলে জানবে। এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত।

অমিত্রের লক্ষণ : যে সর্বদা অপরের ধন হরণ করে, বাক সর্বস্ব, চাটুকার ও প্ররোচক–এরূপ ব্যক্তি মিত্ররপী অমিত্র। তাকে বর্জনীয়।

গৃহীর ষড়দিক : ধার্মিক গৃহীর ছয় প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত। একে গৃহীর ষড়দিক রক্ষা করা বলে।

ক) পূর্ব দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। পাঁচভাবে মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। যথা : ১. বৃদ্ধকালে মাতা-পিতার ভরণ পোষণ করা ২. নিজে কাজের আগে তাঁদের কাজ সম্পাদন করা ৩. বংশমর্যাদা রক্ষা করা ৪. তাঁদের বাধ্যগত থেকে তাঁদের বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ এবং ৫. মৃত জ্ঞাতিদের উদ্দেশে দান দেওয়া। মাতাপিতাও সন্তানের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. পাপ হতে নিবৃত্ত করা ২. কল্যাণকর্মে প্রবৃত্ত করা ৩. উপযুক্ত সময়ে বিদ্যা শিক্ষা দান করা ৪. পরিণত বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা ৫. যোগ্যতা চিন্তা করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা।

খ) পশ্চিম দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করা। স্ত্রীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ২. ভদ্র ব্যবহার করা ৩. পরস্ত্রীতে আসক্ত না হয়ে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ৪. বৈষয়িক ব্যাপারে কর্তৃত্ব দেওয়া এবং ৫. সাধ্যমতো বস্ত্রালংকার দেওয়া। স্ত্রীকেও স্বামীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. সুচারুরূপে গৃহকার্য করা ২. পরিজনবর্গ ও অতিথিদের প্রতি সাদর সম্ভাষণ করা ৩. স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা ৪. স্বামীর সঞ্চিত ধন অপচয় না করা এবং ৫. গৃহকর্মে নিপুণা এবং অলস না হওয়া।

গ) উত্তর দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. দান ও সাময়িক অর্থ সাহায্য করা ২. প্রিয়বাক্য ব্যবহার করা ৩. হিতাচরণ করা ৪. প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং ৫. সরল ব্যবহার করা। আত্মীয়স্বজন ও কুলপুত্রে প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. প্রমত্তকালে তাকে রক্ষা ২. তার ধনসম্পত্তি রক্ষা করা ৩. ভয়ে আশ্বস্ত করা ৪. বিপদকালে তাকে ত্যাগ না করা এবং ৫. তাকে সম্মান করা।

ঘ) দক্ষিণ দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে গুরুর প্রতি কর্তব্য পালন করা। গুরুর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. গুরুর সামনে উচ্চ আসনে না বসা ২. সেবা করা ৩. আদেশ পালন করা ৪. মনোযোগ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করা এবং ৫. বিদ্যাভ্যাস করা। গুরুকেও শিষ্যের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা: ১. সুন্দররূপে বিনীত করা ২. খুঁটিনাটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া ৩. পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করে দেওয়া ৪. বন্ধুদের নিকট ছাত্রের প্রশংসা করা এবং ৫. বিপদে রক্ষা করা।

ঙ) উর্ধ্ব দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. শ্রদ্ধাচিত্তে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ,বাসস্থান প্রভৃতি দিয়ে সেবা করা ২. জনসাধারণকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করে তোলা ৩. তাঁদের হিত কামনা করা ৪. শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো এবং ৫. উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করা। শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণও গৃহীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. তাকে পাপকর্ম হতে নিবৃত্ত রাখা ২. কল্যাণকর্মে প্রবৃত্ত করা ৩. তাদের হিত কামনা করা ৪. অশ্রুত বিষয় ব্যক্ত করা এবং ৫. জ্ঞাত বিষয় সংশোধন করে দেওয়া ও সুমার্গ প্রদর্শন করা।

ছ) অধঃ দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে কর্মচারীদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। কর্মচারীদের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. সামর্থ্য অনুযায়ী কার্যভার অর্পণ করা ২. উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া ৩. রোগের সময় সেবা করা ৪. উৎকৃষ্ট খাদ্য ভাগ করে দেওয়া এবং ৫. মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দেওয়া। কর্মচারীদেরও গৃহস্বামীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. গৃহস্বামীর পূর্বে শয্যা ত্যাগ করা ২. পরে শয়ন করা ৩. কেবল প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা ৪. যথার্থভাবে কর্ম সম্পাদন করা এবং ৫. গৃহস্বামীর সুখ্যাতি ও প্রশংসা করা।

২) ব্যগ্‌ঘপজ্জ সূত্র :

একসময় বুদ্ধ কোলীয় গ্রামে অবস্থান করছিলেন। ব্যগ্‌ঘপজ্জ নামক একজন কোলীয় বুদ্ধের নিকট সংসারে আবদ্ধ গৃহীদের ইহকাল ও পরকালের হিতের জন্য কিছু নির্দেশনা দেয়ার অনুরোধ করেন। বুদ্ধ গৃহী জীবনে মঙ্গলজনক চারটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেন। এ সকল নির্দেশনা ব্যগ্‌ঘপজ্জ সূত্রে বর্ণিত আছে। নির্দেশনাসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো :

উৎসাহ : পরিশ্রম ও সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহে উৎসাহী হতে হবে। যেকোনো কাজ সুসম্পন্ন করার প্রতি উৎসাহী হতে হবে।

সংরক্ষণ : সদুপায়ে কষ্টে অর্জিত অর্থসম্পদ সতর্কতার সাথে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে চোর, অপহরণকারী, ঈর্ষাপরায়ণ জ্ঞাতি বা আগুন দ্বারা নষ্ট না হয়।

সৎলোকের সংশ্রব : ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাশীল, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শীলবান, অপরের মঙ্গলকামী ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত। এঁদের সৎ গুনাবলি অনুসরণ করা উচিত। এঁরাই কল্যাণমিত্র। সৎ জীবন গঠনে এঁদের সংশ্রব অপরিহার্য।

শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন : আয় বুঝে ব্যয় করা গৃহীর একান্ত কর্তব্য। মিতব্যয়ী হতে হবে। আবার কৃপণতাও পরিহার করতে হবে। আয়-ব্যয় সমন্বয় করে যথারীতি জীবিকা নির্বাহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন বলে।

বুদ্ধ এ-প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, চারটি গুণে গুনান্বিত হলে ইহকাল ও পরকালে মহাউপকার সাধিত হয়। সে চারটি গুণ হলো– শ্রদ্ধাগুণ, শীলগুণ, দানগুণ ও প্রজ্ঞাগুণ।

৩. আয়-ব্যয় বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ :

বুদ্ধ আয় বা লাভের অংশকে চার ভাগ করে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন। যথা :

১. একভাগ নিজে পরিভোগ করবে। এ অংশ থেকে এক ভাগ দান করবে।
২. দুই ভাগ কৃষি বা বাণিজ্যে নিযুক্ত করবে।
৩. চতুর্থ ভাগ সঞ্চয় করে রাখবে, যাতে বিপদের দিনে ব্যবহার করা যায়।

এগুলো ছাড়াও গৃহীদের উদ্দেশ্য করে বুদ্ধ আরও অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। এসব উপদেশ পালন করলে গৃহী-জীবন যেমন সুখের হয়, তেমনি নির্বাণের পথেও অগ্রসর হওয়া যায়। তাই এসব উপদেশ সকল গৃহীর মেনে চলা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

গৃহীর ষড়দিক রক্ষার মর্মার্থ লেখ

গৃহপতি বর্গে গৃহীর কয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে? কী কী?

আয়-ব্যয় সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ কতটুকু যুক্তিযুক্ত–ব্যাখ্যা কর

পাঠ : ৩

গৃহী নীতিমালা

সৎ আচরণ মনুষত্বের পরিচয় বহন করে। সৎ আচরণ ও সংযম সমাজে বসবাসের অন্যতম শর্ত। শ্রীমৎ ধর্মপাল থের সিংহলি ভাষায় ‘গিহিদিন চরিয়া’ নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। তাতে গৃহীদের জন্য একান্ত আচরণীয় বিষয় বর্ণিত আছে। বর্ণিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে গৃহীদের অনুসরণীয় কিছু নীতিমালা তুলে ধরা হলো।

সকালের কাজ : সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ, হাত ধুয়ে বুদ্ধপূজা করা একান্ত কর্তব্য। যদি কাছাকাছি বিহার থাকে তবে সেখানে গিয়ে পূজা ও বন্দনা করা দরকার। অথবা ঘরে এই কাজ সম্পন্ন করা যাবে। বন্দনার পর ঘরের আসবাবপত্র পরিষ্কার করতে হবে। তারপর সকালের খাওয়ার পর মৈত্রী ভাবনা করে কাজে মন দিতে হবে।

আহার : খাওয়ার আগে ভালো করে মুখ, হাত, পা ধুয়ে নিতে হবে। খুশি মনে খাবার খেতে হবে। উচ্ছিষ্ট হাতে ভাত তরকারি নেওয়া উচিত নয়। অন্যমনস্ক হয়ে খাওয়া উচিত নয়। খাবার জিনিস ভালোভাবে চিবিয়ে খেতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন হলে পাশের সঙ্গী, মা-বাবা, বা ভাইবোন থেকে অনুমতি নিয়ে আসন ছাড়তে হয়। খাওয়ার সময় কথা বলা বা হেঁটে হেঁটে খাওয়া উচিত নয়। শব্দ করে খেতে নেই। খাওয়ার পর ভালো করে হাত-মুখ ধুতে হবে। প্রতিদিন সময়মতো খাওয়া-দাওয়া করা উচিত।

স্নান ও কাপড় পরার নিয়ম : ময়লা কাপড় পরা উচিত নয়। অল্প কাপড় থাকলেও তা সময়মতো ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা উচিত। ঘামে ভেজা কাপড় না ধুয়ে আবার পরা উচিত নয়। পোশাক পরিধান না করে স্নান করা অনুচিত। নাকের ময়লা, চুল ও পা ভালো করে পরিষ্কার করে স্নান করা উচিত। নখ লম্বা হওয়ার আগেই কেটে ফেলতে হবে।

পথ চলার নিয়ম : বড় ও প্রসিদ্ধ রাস্তায় চলার সময় স্থানীয় নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। হাতে ছাতা থাকলে তা পরের গায়ে যেন না লাগে সেদিকে নজর রাখা দরকার। অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলা অনুচিত। ডান ও বাম দিক ভালো করে দেখে রাস্তা পার হওয়া উচিত। চলার পথে কিছু খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা পালন করা উচিত। সাধ্যমতো অন্ধ, বৃদ্ধ ও শিশুদের রাস্তা পার হতে সাহায্য করা উচিত।

সভার আচরণবিধি : সভার উপযোগী পোশাক পরিধান করে সভায় অংশগ্রহণ করা উচিত। অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিজের মতামত যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করতে হবে। সভায় সকলে সমস্বরে কথা বলা অনুচিত। সর্বোচ্চ শিষ্টাচার ও সৌজন্য বজায় রেখে সভায় অবস্থান করতে হয়। সময়ানুবর্তিতা সভায় অংশগ্রহণ ও সভা পরিচালনার অন্যতম শর্ত।

রোগী দেখতে যাওয়া : আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও পরিচিত কারো অসুখ হলে দেখতে যাওয়া একটি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। রোগীকে সহানুভূতি ও সাহস যোগাতে হবে। যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও পথ্য নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। রোগীর সেবায় নিয়োজিত আত্মীয়স্বজনকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে হয়। রোগী সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিয়ে দেখতে যাওয়া উচিত। অধিক সময় রোগীর ঘরে থাকা উচিত নয়। রোগীর ঘর থেকে এসে কাপড় বদলে মুখ, হাত, পা ধুয়ে নিতে হয়। এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি।

মৃত দর্শন : আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপড়শির মৃত্যুতে দেখতে যাওয়া সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য। পরিষ্কার কাপড় পরে যাওয়া এবং ফিরে এসে সেসব কাপড় খুলে ধুয়ে ফেলা ভালো। শোকার্তদের সমবেদনা জানাতে হয়। জন্ম-মৃত্যু অতি স্বাভাবিক ঘটনা। জীবমাত্রই মৃত্যুর অধীন। এভাবেই সান্ত্বনা ও সমবেদনা প্রকাশ করা যায়। মৃতের উদ্দেশে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয় এবং কোনোরকম সহায়তার প্রয়োজন হলে সহায়তা করা একটি কুশল কর্ম।

পরিবারে ছেলেমেয়েদের কর্তব্য : পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা ছাড়াও অনেক কাজ করতে হয়। পড়ার বাইরেও পরিবারের অন্যান্য কাজে যথাসম্ভব সাহায্য করতে হবে। মা-বাবা যে-পেশায় কাজ করেন সে-কাজে সাধ্যমতো তাঁদের সাহায্য করতে হবে। অবসরে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। পিতা-মাতার ব্যবসার কাজেও সাহায্য করতে হয়।

নামকরণ : ব্যক্তির নামকরণ ধর্মীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কিত হলে ভালো হয়। এতে নিজ ধর্মের সাথে পরিচিতি ও নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। নিজের দেশের ঐতিহ্য, পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ীও নাম রাখা যেতে পারে।

নিত্যপালনীয় ধর্মাচার : প্রতিটি বৌদ্ধ গৃহীর গৃহে নিত্যপালনীয় ধর্মাচারের জন্য একটি বুদ্ধাসন থাকে। সেখানে বুদ্ধের মূর্তি বা চিত্র থাকে। গৃহী বৌদ্ধরা সাধারণত পারিবারিক বুদ্ধাসনের সামনে দিনে তিনবার নিয়মিত শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে থাকে। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ, হাত ও পা ধুয়ে পুষ্প, পানীয়, আহার ও সুগন্ধ ধূপসহ বুদ্ধকে পূজা করা হয়। দুপুর বারোটার পূর্বে অনুরূপভাবে আহার ও পানীয় দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করা হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ, সুগন্ধ ধূপ ও পানীয় দিয়ে পুনরায় একইভাবে বুদ্ধের উপাসনা করা হয়। এ সময় নির্ধারিত গাথা আবৃত্তি করে ভক্তিসহকারে পূজাসামগ্রী উৎসর্গ করতে হয়। এরূপ উপাসনা চিত্তকে পবিত্র ও শান্ত করে। অন্তর থেকে অন্ধকাররূপী কলুষতা বিদূরীত করে সদ্ধর্মের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে।

অনুশীলনমূলক কাজ
গৃহী নীতিমালা অনুযায়ী একটি দিনলিপি প্রস্তুত কর

পাঠ : ৪
সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম

বুদ্ধের সময় বৈশালী নামে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। বৈশালীর অধিবাসী বজ্জি ও লিচ্ছবিরা বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন। লিচ্ছবিরা বুদ্ধ ও সঙ্ঘের বসবাসের জন্য সুরম্য কুটাগারশালা বিহার নির্মাণ করে দেয়। বুদ্ধ ঐ বিহারে পাঁচবার বর্ষাবাস পালন করেন। বৈশালীতে অবস্থানকালে বুদ্ধ একাধিক সূত্র ও অনুশাসন দেশনা করেন। তার মধ্যে গৃহীদের জন্য 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' অন্যতম। 'সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম' অর্থ হচ্ছে সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য। তথাগত বুদ্ধ বৈশালীর 'সারন্দদ চৈত্যে' অবস্থানকালে বজ্জিগণের উদ্দেশে এই অনুশাসনসমূহ দেশনা করেন। বজ্জিরা এ সাতটি অপরিহার্য উপদেশ অনুসরণ করে প্রাচীন আর্যাবর্তে নিজেদের অজেয় এবং উন্নত জাতিতে পরিণত করেছিলেন। যেকোনো জাতি বা সমাজ এ সাতটি অপরহির্য ধর্ম বা অনুশাসন পালন করলে তাদের কখনো পরাজয় ঘটবে না। এ-সাতটি অপরিহার্য ধর্ম নিম্নরূপ :

১. সভাসমিতির মাধ্যমে সকলে একত্রিত হয়ে যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
২. গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্মিলিতভাবে সম্পাদন করা এবং কোনোরকম নতুন কিছু করার কারণ ঘটলে সবাই মিলিতভাবে করা।
৩. সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনোরকম দুর্নীতি চালু না করা; প্রচলিত সুনীতি উচ্ছেদ না করা এবং প্রাচীন নীতি ও অনুশাসন মেনে চলা।
৪. বয়োবৃদ্ধ বা জ্ঞানবৃদ্ধদের শ্রদ্ধা, সম্মান, গৌরব ও পূজা করা এবং তাদের আদেশ পালন করা।
৫. কুলবধূ এবং কুলকুমারীদের প্রতি কোনো রকম অন্যায় আচরণ না করা অর্থাৎ স্ত্রীজাতির মর্যাদা রক্ষা করা।
৬. পূর্বপুরুষদের নির্মিত বিহার, চৈত্য, এবং প্রদত্ত সম্পত্তি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও সদ্ধর্মের প্রতিপালন করা।
৭. অর্হৎ ও শীলবান ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় দান দিয়ে সেবা ও রক্ষা করা, তাঁদের সুখ ও সুবিধার ব্যবস্থা করা ও নিরাপদ অবস্থান সনিশ্চিত করা।

ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম : তথাগত বুদ্ধ বৌদ্ধসঙ্ঘের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য সাতটি অপরিহার্য ধর্ম দেশনা করেন, যা মহাপরিনির্বাণ সূত্রে সংকলিত হয়েছে। ভিক্ষুসঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কল্যাণার্থে বুদ্ধ এ-অনুশাসনসমূহ দেশনা করেন এবং বলেন যে এগুলো পালন করলে তাঁদের কখনোই পরাজয় হবে না। ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মসমূহ নিম্নরূপ :

১. ভিক্ষুগণ একত্রে সম্মিলিত হবেন।
২. ভিক্ষুগণ একতাবদ্ধ থেকে একসঙ্গে সঙ্ঘ-কর্তব্য সম্পাদন করবেন।
৩. ভিক্ষুগণ নির্দেশিত শিক্ষাপদসমূহ পালন করবেন।
৪. ভিক্ষুগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের সম্মান, পূজা ও সেবা করবেন।
৫. ভিক্ষুগণ পুনর্জন্মের কারণ তৃষ্ণার বশবর্তী হবেন না।
৬. ভিক্ষুগণ অরণ্যে বা একান্তে নির্বাণ সাধনায় মনোনিবেশ করবেন।
৭. ভিক্ষুগণ অনাগত ও আগত ভিক্ষু-শ্রমণের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবেন।

এভাবেই বুদ্ধ তাঁর অবর্তমানে গৃহী ও ভিক্ষু-শ্রমণদের কল্যাণার্থে এবং সদ্ধর্মের অনুশীলন অব্যাহত রাখার জন্য অবশ্য পালনীয় নীতিমালা ও অনুশাসনসমূহ দেশনা করেছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মের সুফল সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ রচনা লেখ

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) দুঃখীর দুঃখে ব্যথিত হয়ে 'দুঃখ মুক্তি' কামনা করাকে ---- ভাবনা বলে।
খ) নেশা গ্রহণের ফলে ---- বিষময় ফল ভোগ করতে হয়।
গ) পাপ কর্মে মিথ্যা ---- আরোপিত হয়।
ঘ) গুরুকেও শিষ্যের প্রতি--------- প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়।
ঙ) নিজেই নিজের------- হয়ে বিচরণ করো।

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) বর্তমান প্রত্যবেক্ষণ কী ব্যাখ্যা কর।
খ) ভিক্ষু ও শ্রমণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
গ) মিত্রের লক্ষন কী ?
ঘ) পরিবারের প্রতি শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ বর্ণনা কর।

৩. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

ক) ভিক্ষু ও শ্রমণদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা কর।

খ) গৃহীদের প্রতিপালনীয় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা কর।

গ) সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম কী? বিস্তারিত লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'নিস্সাগগিয়' -র অর্থ কী ?

ক. নিশ্চিত করা উচিত
খ. লক্ষ করা উচিত
খ. ত্যাগ করা উচিত
ঘ. সমাধা করা উচিত

২। ধ্যান ও সমাধি ভিক্ষু শ্রমণদের জন্য অবশ্যকরণীয় কেন ?

ক. চিত্তসংযমের জন্য
খ. প্রশংসা পাওয়ার জন্য
গ. যশ-খ্যাতি অর্জনের জন্য
ঘ. অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

অমিত বড়ুয়া শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হন। আহার গ্রহণের সময় বিহারাধ্যক্ষ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি আহার গ্রহণ করছেন কেন?" তিনি জবাবে বললেন, কেবল জীবনধারণের জন্য; তখন ভিক্ষু বললেন, "আপনি কী আমাদের চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণের সময় এরূপ চিন্তা করেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আমি এরূপ চিন্তা করি।"

৩। বৌদ্ধ ভিক্ষু নিজকর্ম অনুসারে অমিত বড়ুয়ার এরূপ চিন্তাধারাকে কী বলা হয় ?

ক. মৈত্রীভাবনা
খ. পঞ্চ ভাবনা
গ. প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা
ঘ. মুদিতা ভাবনা

৪। উক্ত চিন্তাধারা গ্রহণ করলে অমিত বিরত থাকবেন —

i. লোভ-লালসা থেকে
ii. হিংসা দ্বেষ থেকে
iii. কামভাব থেকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii
গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

তালিকা

দিক	নিত্যকর্ম
বিদ্যাভ্যাস করে।	তারা শুধু জীবনধারণের জন্য আহার গ্রহণ করেন। দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নয়।
বড়দের সম্মান করে।	সকল প্রাণী সুখী হোক, সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হোক বলে ভাবনা করে।
আদেশ পালনে সচেষ্ট থাকে।	কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন, পঞ্চ-কামগুণ উৎপাদনের জন্য নয় ।

(ক) কারা ষড়দোষ পরিত্যাগ করেন?

(খ) ভিক্ষু শ্রমণেরা সংযম ব্রত পালন করেন কেন?

(গ) তালিকায় বর্ণিত আচরণসমূহ গৃহস্থরা কেন পালন করেন? সিগালোবাদ সূত্রের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উল্লেখিত তালিকায় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনের ইঙ্গিত কাদের জন্য প্রযোজ্য পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২.

কাহিনী-১

দীপক বড়ুয়া সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত শেষ করে ত্রিরত্ন সেবায় নিয়োজিত হয়। তিনি সতর্কতার সাথে রাস্তা পারাপার হন। এলাকায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে সৎকারের জন্য এগিয়ে যান এবং পরিবারের প্রধান হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকেন।

কাহিনী-২

শ্রদ্ধেয় আর্যপ্রিয় ভিক্ষু বিনয়ের অনুশাসনের অংশ হিসেবে বয়সে বড় ভিক্ষুদের সম্মান করেন। সঙ্ঘে একত্র হয়ে থাকেন এবং নির্বান সাধনায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।

(ক) শ্রমণদের আবশ্যিক নিত্যকর্ম কী?

(খ) ভিক্ষুরা পঞ্চভাবনা করেন কেন?

(গ) কাহিনী-১ এ দীপক বড়ুয়ার আচরণ গৃহী নীতিমালার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ২নং কাহিনী ভিক্ষুদের জন্য 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মের বিষয়' যুক্তি প্রদর্শন কর।

২০২৫

সমাপ্ত

স্বাধীনতার
৫০
বছর
উন্নয়ন আমারও

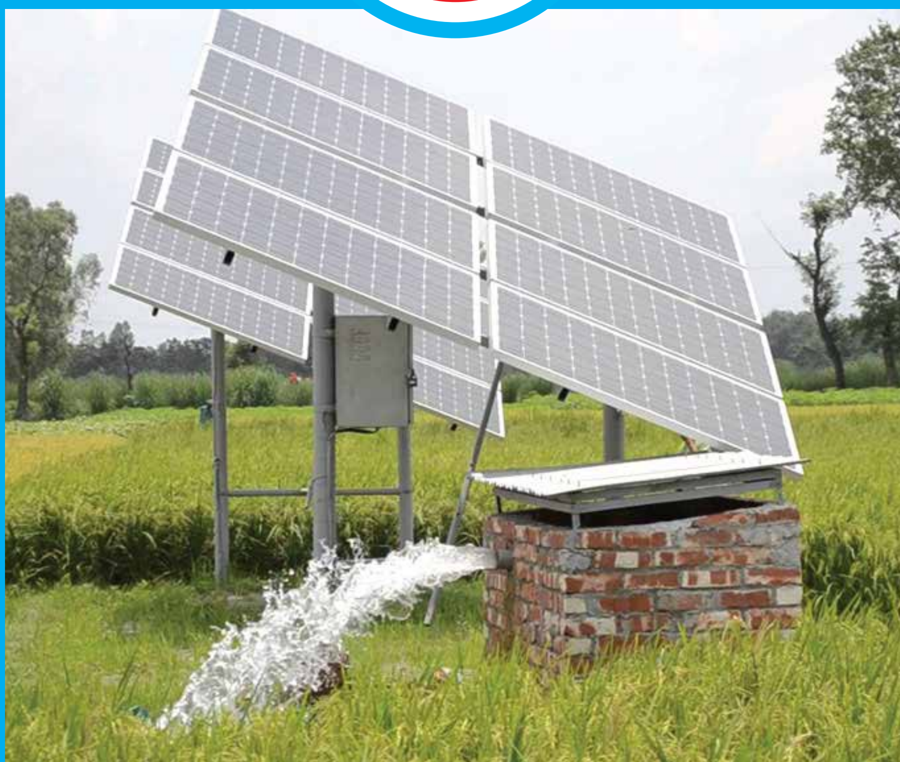

সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প

প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি যেমন, সৌরবিদ্যুৎ, উইন্ডমিল ও বায়োগ্যাস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। সূর্য থেকে বিকিরণ হওয়া তাপশক্তিকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তাই হলো সৌরবিদ্যুৎ। বাংলাদেশে অফ-গ্রিড এলাকায় (চর, হাওড় ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকা) সৌরবিদ্যুৎ মানুষের জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন এনেছে। জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। দেশের বিদ্যুৎ খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে অবকাঠামো, কৃষি ও শিল্প খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ পরিবেশ-বান্ধব হওয়ায় বেসরকারি পর্যায়ে ভবনের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন জনপ্রিয় করার জন্য 'নেট মিটারিং গাইডলাইন' প্রণয়ন করা এবং বিদ্যুৎবিহীন এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে।

২০২৩

শিক্ষাবর্ষ

৯ম-১০ম বৌদ্ধধর্ম

আত্ম-শরণই অনন্য শরণ

– গৌতম বুদ্ধ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য